শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহঃ)

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসী দেহলভী (রহঃ)

অনুবাদ

অধ্যাপক আখ্‌তার ফারুক (রহঃ)

এম.এম; এম.এ

ও

মাওলানা আবদুর রশীদ

মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন

প্রকাশক

রশীদ বুক হাউস

৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
আবদুর রব খান
রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৯১৩-৪৯৩৩১১

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০১২ইং

গ্রন্থস্বত্ত
অনুবাদকের

বর্ণবিন্যাস ঃ
মোঃ ইলিয়াছ
ইমারত কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৪০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

দারুস সুন্নাত লাইব্রেরী
ছারছীনা শরীফ

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
সাহেব বাজার, রাজশাহী

দেওয়ান স্টোর
বড় মসজিদ রোড, টাঙ্গাইল

বইমেলা
কুষ্টিয়া

আলবারাকাত ইসলামি সেন্টার
পৌরবাজার, রংপুর

এছাড়াও বাংলাদেশের
প্রতিটি ধর্মীয়
লাইব্রেরীতে
পাওয়া যায়

প্রকাশকের আরজ

অগণিত শোকর আদায় করছি মহান আল্লাহ পাকের, যিনি এ বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। আরও সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে যা কিছু আছে। অগণিত দরূদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, তাঁর আসহাবগণের প্রতি ও তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি।

মহান আল্লাহপাক তাঁর ইবাদতের জন্য মানব ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এদের মধ্যে মানব জাতিই শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টির প্রকাশ মানুষের মাধ্যমেই হয়েছে। তাই মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় এবং মানুষ শুধু আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। মানুষ জাতির মধ্যে বিশেষ কিছু ব্যক্তিত্ব আছে যাঁরা দুনিয়ায় অমর হয়ে আছেন। যাঁদের নাম মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এঁরা মহান আল্লাহ পাকের আশির্বাদপুষ্ট এবং আল্লাহ পাক কুরআন সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য।

ইসলামী দুনিয়ার এটি অবিস্মরণীয় নাম হচ্ছে 'শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী আর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ হলো তাঁর এক অবিনশ্বর কীর্তি। এ মহা গ্রন্থ শুধু মুসলিম জাহানেই নয়, সারা বিশ্বে এক মহা বিস্ময় হয়ে আছে। এ মহাগ্রন্থের মহান গ্রন্থকার কে ছিলেন তা বলা সহজ, কিন্তু কি ছিলেন তা অনুধাবন করা এ অধম তো দূরের কথা, কোন উত্তম মানুষের পক্ষেও নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার।

'ফালিল্লাহিল হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিটি বাণী ও বিধানই যে অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁর জ্বলন্ত স্বাক্ষর বয়ে চলছে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ। তাঁর লৌকিক কি পারলৌকিক, জৈবিক কি আত্মিক কোন বাণী ও বিধানই যে অযৌক্তিক ও অবান্তর নয় এ মহা গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় তার বলিষ্ঠ প্রমাণ উজ্জীবিত হয়ে আছে। তাই যে কোন সংশয়ীমনকে এ মহাগ্রন্থ যথার্থ ঈমানদার, আমলদার, এমন কি সম্ভবতঃ আল্লাহওয়ালায় পরিণত করতে সক্ষম।

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (দ্বিতীয় খণ্ড) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের পূতঃ করপল্লবে তুলিয়া দিতে পারিয়া পরম করুণাময়ের হাজারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই মহা গ্রন্থখানা অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক অধ্যাপক আখতার ফারুক সাহেব অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং বয়সের ভারে তিনি মহান আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে ইহজগত ছেড়ে চলে গিয়েছেন। (ইন্নালিল্লাহি...... রাজেউন)। এ অসাধ্য কাজটি করার জন্য আমি মাওলানা মাওলানা আবদুর রশীদকে বললে, তিনি বাকি কাজটুকু সমাধান করেন। শত অসুবিধার মধ্যেও গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়ে পাঠকদের হাতে দিতে পেরেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকর গুজার করছি। আল্লাহ পাক আমাদের এই নগণ্য খেদমত কবুল ও মঞ্জুর করুন, আমীন।

যে কোনো কাজ করতে গেলে মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আর ভালো ও মহতী কাজে তো শয়তান সবসময় সচেষ্ট থাকে ক্ষতি করার জন্য। এ মহতী কাজটি করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। পাঠককূলের কাছে দৃষ্টিগোচর হলে স্বানন্দে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব। আল্লাহ পাক এ গ্রন্থকে মকবুলিয়াত ও বরকত দান করুন এটাই আমার একমাত্র কামনা।

প্রকাশক

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

পবিত্রতার অধ্যায়

কিতাবুল তাহারাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায়-৫৯

ফরজ, আরকান, আদাব তথা শিষ্টাচার এবং এ জাতীয় বিধানগুলো নির্ধারণের কারণ

স্মরণ রাখা চাই যে, উম্মতকে শাসন করার সময় এরূপ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথা জরুরি যে, তার আনুগত্যের বিধানগুলোর প্রত্যেকটির জন্য দুটি সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে। সর্ব উর্ধ্ব সীমা ও সর্বনিম্ন সীমা। সর্ব উর্ধ্ব সীমা হলো যে ইবাদতের মাধ্যমে উম্মত তার অভিষ্ট লক্ষ্যের সর্বশেষ সীমায় উপনীত হতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে সর্বনিম্ন সীমা থাকবে এমন পর্যায়ের যে পর্যায়ে পৌঁছার পর তারপর আর কোনো কিছু থাকবে না, যাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তার ব্যাখ্যা হলো, এরূপ করার এমন কোনো পন্থা নেই যে, মানুষের নিকট একটা বিষয়ের দাবি করা হবে অথচ সে বিষয়ের অংশ, ছুরত এবং তার সে পরিমাণ বর্ণিত হবে না যা তার নিকট থেকে কাম্য। এমনটি হওয়া শরীয়তের (শরীয়তের উদ্দেশ্যের) খেলাপ। আর সেজন্য এমন পন্থাও হতে পারে না যে, সকলকেই তার আদাব ও পরিপূর্ণভাবে তা করার জন্য বাধ্য করা যাবে। তা এজন্য সম্ভব নয় যে, এরূপ করা হলে তা হবে অসম্ভব কাজ সমাধানের জন্য বাধ্য করা, ব্যস্ত লোকদের অথবা তা হবে সীমাতিরিক্ত কষ্টকর কাজ। উম্মতের সকল কাজের পরিধি হলো মধ্যম পন্থা অবলম্বন। সর্বশেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া নয়। আবার এমন করাও ঠিক নয় যে, সর্ব উর্ধ্ব সীমা ত্যাগ করে সর্বনিম্ন সীমাকে যথেষ্ট মনে করা হবে-গ্রহণ করা হবে- যথেষ্ট মানা হবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে সর্ব উর্ধ্বের সীমা সাবেকীনদের এবং মোখলেছীনদের। আর এ জাতীয় কর্মকে অর্থহীন ও অস্পষ্ট রাখা আল্লাহর শানে শোভনীয় নয়। তখন সর্বনিম্ন সীমা বর্ণনা করে তা ফরয না করে পালন করার ফয়সালা করে দেয়া এবং এ সীমার উর্ধ্বে যা রয়েছে তার প্রতি তারগীব তথা উৎসাহ সৃষ্টি ও প্রেরণা দান ব্যতীত অপর কোনো পথ থাকে না।

যে বিধান পালন করার অকাট্য প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা আনুগত্যের একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। রমজান মাসের রোজা পালন করা এবং এসব আনুগত্যের বিভিন্ন অংশ

তথা পার্টগুলো বলে দেয়া যেগুলো ব্যতীত এসব আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন নামাযের জন্য তাকবীরে তাহরীমা এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করা। এগুলোকে আরকান বলা হয়। আবার ঐসব অংশগুলোও বলে দিতে হবে যেগুলো এগুলোর বাইরের অথচ যেগুলো ব্যতীত এ আনুগত্য গ্রহণীয় হবে না, ঐগুলোকে শর্ত বলা হয়। যেমন নামাযের জন্য অযু করা।

(স্মরণ রাখা চাই যে,) কখনো কখনো সে ইবাদতের ফিতরাতের তথা প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী কোনো জিনিসকে তার রোকন ঘোষণা করা হয়। আবার কখনো কখনো আকস্মিক বা আরেজী কারণেও কোনো জিনিসকে তার রোকন করা হয় (ভিত্তি করা হয়)।

তন্মধ্যে প্রথমটি হলো ঃ যা না হলে ইবাদত হয় না এবং তার ফায়দা তথা উপকারিতা লাভ হয় না। যেমন নামাযে রুকু ও সিজদা করা এবং রোজার মধ্যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং স্ত্রী সহবাস-যৌনসংগম ত্যাগ করা। অথবা ঐ বস্তু এমন হবে যা ঐ ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন তাকবীরে তাহরীমা। এ তাকবীরে তাহরীমা নিঃসন্দেহে নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত আর নিয়ত নির্ধারিত। আবার যেমন ফাতেহা, আর নিঃসন্দেহে তা দোয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আবার যেমন সালাম আর তা নামায হতে বের হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন কাজ যা নামাযের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় হলো ঃ তা ওয়াজিব হবে, অপরাপর কারণগুলোর কোনো একটি আরেজী বা আকস্মিক কারণে আর তাকে নামাযের রোকন ঘোষণা করা হবে। এ কারণে যে, তা নামাযের মধ্যে পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। আর তা নামাযের উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে আদায় করে, যে কারণে সে নিজেই নামাযের রোকন হওয়ার যোগ্য হয়। যেমন সূরা ফাতেহার পর পবিত্র কুরআনের অন্য যেকোনো সূরা পাঠ করা– তাদের জন্য যারা সূরা পাঠ করাকে নামাযের রোকন মনে করে। (অর্থাৎ হানাফী মতাবলম্বীদের নিকট; যারা সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পাঠ করা ওয়াজেব মনে করে। অন্য তিনজন ইমামের নিকট সূরা মিলানো সুন্নাত)। নিশ্চয়ই পবিত্র কুরআন شعائر الله আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম তাকে তাজিম করতেই হবে, তাজিম করা ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনকে পেছনে ফেলা যাবে না। পবিত্র কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পন্থা নেই যে সবচেয়ে অধিক তাকিদকৃত ইবাদতের মধ্যে এবং সে ইবাদতের মধ্যে যা অধিক পরিমাণে হয়ে

থাকে এবং যা পালন করা অধিক পরিমাণে প্রচলিত তাতে পাঠ করা হবে। অথবা দুটি জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক বস্তুর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা অথবা কোনো বস্তুর ভূমিকার মধ্যে বা কোনো স্বতন্ত্র বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যে বস্তুর উপর নির্ভরশীল তাকেই রোকন (ভিত্তি বা স্তম্ভ) করা হয় এবং তা করার হুকুম দেয়া হয়। যেমন রুকু ও সিজদার মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়ানো। এর দ্বারা পার্থক্য নির্ণয় হয় সে শির নত করা যা সিজদা করার ভূমিকা এবং সে রুকুর মধ্যে যা স্বতন্ত্রভাবে তাজিম তথা সম্মান প্রদর্শন, এবং যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাবনা ও তা গ্রহণ) ও সাক্ষী, অলীর উপস্থিতি এবং নারীর বিবাহে রাজি থাকা। নিশ্চয়ই এর দ্বারা জেনা ব্যভিচার ও বিবাহের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নির্ণয় হয়। হতে পারে কোনো কোনো রোকনের তাওজীহ বর্ণনা উভয় দিক থেকেই করা যায় (অর্থাৎ জাতী ও আরেজী– মূল ও আকস্মিক উভয় কারণের অধীনে তাদের নেয়া যায়।) রোকন সম্পর্কে আমরা যা আলোচনা করেছি শর্তের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণ করা কর্তব্য। সুতরাং কখনো কোনো কারণে এক বস্তু জরুরি তথা অত্যাবশ্যকীয় হয়। (অর্থাৎ কোনো আরেজী বা আকস্মিক কারণে) তখন তাকে দ্বীনের কোনো شعائر শায়ায়ের বা রীতিনীতির ক্ষেত্রে শর্ত ধরে নেয়া হয় (যেমন নামাযের জন্য)। ঐ কারণের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য। তার শান ততক্ষণ (সে আকস্মিক কারণের শান) বৃদ্ধি পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইবাদত তথা নামায ঐ বস্তুর মিলিত হওয়ার কারণে পূর্ণতা লাভ করে যেমন استقبال قبله তথা কেবলামুখী হওয়া। যখন কাবা শরীফ আল্লাহর شعائر الله নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত তখন তাকে সম্মান করা, তাজিম করা ওয়াজিব। আর সবচেয়ে অধিক তাজিমের তথা সম্মান প্রদর্শন ছিল লোকেরা তাদের ভালো অবস্থায় তার দিকে মুখ করবে। যেখানে আল্লাহর কোনো নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে (যেমন কাবা শরীফ রয়েছে) সেদিকে মুখ করা মুসল্লীর জন্য নামাযের মধ্যে আনুগত্য প্রদর্শনের নিমিত্তে এবং তা ক্রীতদাসের তথা গোলামের তার মালিক ও মনিবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ কারণে নামাযে কেবলামুখী হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে।

কখনো কোনো বস্তু তার কোনো আকৃতি ব্যতীত কোনো ফায়দা দেয় না; উপকারে আসে না, তখন ঐ বস্তুকে ঐ ইবাদতের শুদ্ধতার জন্য শর্ত করা হয়। যেমন নিয়ত। নিঃসন্দেহে আমল তখনি কার্যকর ও মর্মস্পর্শী হয় যখন সে কোনো ছবি বা চিত্রের ন্যায় অন্তরে অনুভূত হয়। নামাযের দ্বারা আল্লাহর প্রতি

আনুগত্যের চিত্র অন্তরে ভেসে উঠে আর সে আনুগত্য নিয়ত ব্যতীত হয় না এবং যেমন হয় না কেবলামুখী হওয়া অন্য দৃষ্টিতে। যখন অন্তরকে কেবলার প্রতি একাগ্রচিত্ত করা একটা লুকায়িত বিষয়– তখন সে কাবার দিকে মুখমণ্ডল করা আল্লাহর নিদর্শন شعائر الله তাকে– অন্তরকে একাগ্রচিত্ত করার স্থানে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং যেমন অযু করা ছতর ঢাকা এবং অপবিত্রতা ত্যাগ করা। যখন তাজিম করা তথা সম্মান প্রদর্শন করা, একটা লুকায়িত বস্তু ছিল, তখন লোকেরা যে বিষয়টিকে রাজা-বাদশাহ এবং ঐ জাতীয় লোকদের সামনে প্রদর্শন করাকে নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও করণীয় মনে করে, লোকেরা তাকে তাজিম তথা সম্মান প্রকাশ মনে করে এবং তা লোকদের অন্তরে স্থান লাভ করে, আর আরব অনারব সকলে সে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে তখন তাকে তাজিমের স্থানে স্থলাভিষিক্ত করা হলো।

যখন কোনো আনুগত্য ফরজ করা হয় তখন সে ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি দেয়া অত্যাবশ্যকীয়।

তন্মধ্যে রয়েছে ঃ লোকদের উপর ঐ জিনিস ফরজ করা হবে যা তাদের পক্ষে সহজ হবে। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হচ্ছে–

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

"যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেছওয়াক করার হুকুম করতাম"। (মিশকাত হাদীস নং ৩৯০) এ হাদীসের তাফসীরে তথা ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে–

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ
عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ ـ

"যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে তাদের উপর প্রত্যেক নামাযের সময় মেছওয়াক করা ফরজ করে দিতাম যেমনিভাবে আমি তাদের উপর অযু ফরজ করে দিয়েছি।" (মসনদে আহমদ ২১৪)

তন্মধ্যে রয়েছে ঃ উম্মত যখন কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত পরিমাণ সম্পর্কে এ বিশ্বাস তথা এতেকাদ পোষণ করেছে তা বাদ দেয়া বা তার

প্রতি অনিহা প্রদর্শন করা আল্লাহর নিকট দুর্বলতা তথা গুনাহ্ এবং সে পরিমাণের প্রতি তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়েছে অথবা ঐ পরিমাণ নবীদের পক্ষ হতে নির্ধারিত করা হয়েছে বলে বর্ণিত রয়েছে বা ঐ পরিমাণের উপর সালফের নিকট ঐকমত্য রয়েছে অথবা অনুরূপ কিছু। তাহলে আল্লাহর হিকমত হলো তা তাদের জন্য ফরজ করে দিতেন। যেমন তারা তাদের জন্য ওয়াজেব মনে করত। যেমন বনী ইসরাইলের জন্য উটের গোশত ও উটের দুধ হারাম ঘোষণা করা। এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রমজান মাসের রাতের নামায- তারাবীহ্ সম্পর্কে "حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهِمْ এ নামায তোমাদের প্রতি ফরজ করে দেয়া হবে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত শরীফ হাদীস নং ১২৯৫)। তন্মধ্যে রয়েছে কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না করে তা পালন করার জন্য অকাট্যভাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করা। এ কারণে হায়া অর্থাৎ লজ্জা-শরম ও অন্যান্য উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিকে ইসলামের রোকন (স্তম্ভ) বলে ঘোষণা করা হয়নি। যদিও এগুলো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত।

আনুগত্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার বর্ণনার ক্ষেত্র ঃ প্রথমে সর্বোচ্চ স্তর, অতঃপর সর্বনিম্ন স্তর। মানুষের সুসময় ও দুঃসময়ের বিভিন্নতার কারণে আনুগত্যের সর্বনিম্ন সীমার অবস্থার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। কেয়াম তথা দাঁড়ানোকে নামাযের রোকন ঘোষণা করা হয়েছে যে দাঁড়াতে সক্ষম তার জন্য। আর অক্ষমের জন্য বসে পড়াকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব সর্বোচ্চ স্তরের সীমা পরিমাণ ও অবস্থার গুণের প্রেক্ষিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পরিমাণ ঃ নফলগুলো ফরজগুলোর মধ্য হতেই। যেমন সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, তাহাজ্জুদের নামায় এবং প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা। যেমন নফল সদকা করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজগুলো।

অবস্থা বা গুণ ঃ ইবাদতের আকার আকৃতি, যিকিরসমূহ এবং ঐসব বস্তু হতে দূরে থাকা যেগুলো ইবাদতের শানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আনুগত্যের ক্ষেত্রে সেগুলো করার হুকুম এজন্য দেয়া হয় যাতে করে ঐগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে এবং যেন ঐ আমলগুলোকে সঠিকভাবে পরিপূর্ণরূপে অভিষ্ট লক্ষে উপনীত করতে পারে; যেমন অযুর সময় শরীরের কোকড়ানো স্থানগুলোর প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করার কথা এজন্য বলা হয়েছে যাতে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয়। আবার যেমন অযু ডানদিক থেকে আরম্ভ করা (প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ

কাজেই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।) যাতে ইবাদতের গুরুত্বের প্রতি দেহ সচেতন থাকে। নফস যেন ইবাদতের দিকে একাগ্রচিত্ত ও মনোযোগী থাকে যখন সে স্বয়ং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা মেনে চলে।

স্মরণ রাখবেন, মানুষ যখন কোনো চরিত্র অর্জন করতে চায় এবং চায় যে এর দ্বারা তার জীবন রঙিন হয়ে যাক এবং সে চরিত্রের সকল দিক অর্জন করবে। তার কার্যপ্রণালী বা পদ্ধতি হলো ঃ সে নিজেকে একান্ত অনুগত করবে, সে চরিত্রের উপযুক্ত সকল ক্রিয়া ও সকল বিদ্যার– যদিও তার সে গ্রহণকৃত কাজগুলো সাধারণের নিকট কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাও থাকে। যেমন বীরত্ব ও বাহাদুরী প্রদর্শনকারী তথা নৈপুণ্য প্রদর্শনকারীর কাদায় প্রবেশ করা, রোদের মধ্যে চলা এবং অন্ধকার রাতে ভ্রমণ করা ইত্যাদি ও এ জাতীয় কাজ করা হতে বিরত না থাকায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। তেমনিভাবে আনুগত্যের অভ্যাসকারী সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শনেচ্ছার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে। সে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বসতে লজ্জাবনত অবস্থায় মাথা নীচু করে বসে। সে যখন আল্লাহর যিকির করে তখন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে জড়ো করে বসে, এজাতীয় সকল কাজে সে এরূপ অভ্যাস করে। ন্যায়পরায়ণতায় নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী প্রত্যেক বস্তুর সঠিক অধিকার আদায় করে। সে ডান হাতকে খাওয়া ও পবিত্র কাজগুলো করার জন্য এবং বাম হাতকে নাজাসাত তথা অপবিত্রতা দূর করার কাজে ব্যবহার করে। এ রহস্যই লুকায়িত রয়েছে সে ঘটনায় যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেছওয়াক সম্পর্কে বলা হয়েছে– "বয়োজ্যেষ্ঠকে দিন, বয়োজ্যেষ্ঠকে দিন।"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِىْ فِى الْمَنَامِ اَسْتَاكُ وَسِوَاكُ فَجَاءَ نِى رَجُلَانِ اَحَدُهَا اَكْبَرُ مِنَ الْخَضَرِ فَنَاوَلْتُ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهَا-اخرجه الشيخان -

ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আমি একটি মেছওয়াক

দ্বারা মেছওয়াক করছি। তখন আমার নিকট দুব্যক্তির আগমন ঘটল। তাদের মধ্যে একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। আমি মেছওয়াকটি ছোটজনকে দিলাম। তখন আমাকে বলা হলো বড়জনকে অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠকে দিন, বয়োজ্যেষ্ঠকে দিন। (اخرجه الشيخان)

এবং ঐ ঘটনার যেখানে হুয়াইছা ও মুহাইছার ঘটনা বিবৃত হয়েছে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।"

ঘটনা এরূপ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সহল খায়বারে নিহত হলে তার হত্যাকারী কে তা জানা যায়নি। তখন নিহতের ভাই আবদুর রহমান ও ইবনে মাসউদের দু'পুত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল। তখন আবদুর রহমান কথা বলতে আরম্ভ করল অথচ তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, كبر الكبر "বয়োজ্যেষ্ঠকে দাও।" অর্থাৎ কথা বলার জন্য বড়কে প্রাধান্য দাও। আর এরূপ করাই হলো আদব তথা শিষ্টাচারের ভিত্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ان الشيطان ياكل بشماله নিশ্চয়ই শয়তান তার বাম হাতে ভক্ষণ করে এবং এ জাতীয় আরো অন্যান্য বাণীতে তিনি অনেক কাজের সম্পর্ক শয়তানের সাথে দেখিয়েছেন। এ বাণীগুলোর রহস্য জেনে রাখুন। স্মরণে রাখুন। আমাকে আমার প্রতিপালক পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ যতটুকু বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন তাতে আমি যা বুঝেছি তা হলো ঃ শয়তানকে আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, সে লোকদেরকে স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় এমন সব অবস্থায় পরিবর্তন করে দিতে পারে যা তার মেজাজ ও মনপুত হয়। তার স্বভাবের সাথে খাপ খেয়ে যায়।

সঠিক চিন্তার অধিকারী ও নেককার ব্যক্তিরা জানে যে, শয়তান লোকদেরকে– (১) ক্ষতিকর কাজের সাথে সম্পর্ক রাখা; (২) এমন সব আচরণ যা কাঙ্ক্ষিত নয়, অনাকাঙ্ক্ষিত তা করার প্রতি আগ্রহী করা; (৩) অপবিত্রতার নিকটবর্তী হওয়া; (৪) আল্লাহর যিকিরের প্রতি অমনোযোগীতা; (৬) এবং সকল পছন্দনীয় কাজের ক্ষতি সাধন করার প্রতি আগ্রহী করে দেয়।

ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক কাজ বলতে আমি বুঝাচ্ছি ঐ সব কাজ যা করলে মানুষের অন্তর কেঁপে উঠে, মানুষের চর্ম শির শির করে উঠে এবং মানুষের জবানে লানত বর্ষিত হতে থাকে। এসব কাজ ও কথা সকল মানুষের জন্যেই সমানভাবে দৃষ্টিকটু, সকলের নিকটই সমান, এগুলো কোনো জাতির গঠনমূলক

উদ্দেশ্যে করা হয় না। যেমন কেউ তার লিঙ্গ ধরে নাচানাচি কুদাকুদি করে বা তার পেছনের রাস্তায় বা পায়খানার রাস্তার অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করে বা তার দাড়িকে পেটের সাথে বেঁধে নেয় বা সে নাক কাটা হয়, কান কাটা হয় বা স্বীয় মুখমণ্ডলে কালি মেখে নেয় বা সে নিজের পরিধের পোশাক উল্টাভাবে পরিধান করে, অথবা সে কোনো চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণপূর্বক তার মুখ ঐ জন্তুর পেছনের দিকে করে নেয় বা এক পায়ে মোজা পরিধান করে অপর পা খালি রাখে। এ জাতীয় কোনো দৃষ্টিকটু ও ন্যাক্কারজনক কাজ দেখলেই মানুষ লানত বর্ষণ করে ও গালাগাল দিতে থাকে। আমি কোনো কোনো স্থানে এরূপ ন্যাক্কারজনক কাজ ও নিন্দনীয় কাজ হতে প্রত্যক্ষ করেছি।

এমন সব আচরণ যা অনাকাঙ্ক্ষিত বলতে আমি বুঝাচ্ছি যেমন (নামাযের মধ্যে) স্বীয় কাপড় নিয়ে খেলা করা ও কংকর নিয়ে খেলা করা বা নিজের অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ যেমন হাত, পা ইত্যাদিকে নিন্দনীয় পদ্ধতিতে নাড়াচাড়া করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসব বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এসব কাজ মানুষকে শয়তানী কাজে ও শয়তানের স্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। শয়তান স্বপ্নেই হোক কি জাগ্রত অবস্থায় হোক যার সাথে সম্পৃক্ত হয় তাকেই এগুলোর কোনো না কোনোটির সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর নিকট এটাও পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত করে দিয়েছেন যে, যতটা সম্ভব নিজের সামর্থ ও শক্তি অনুযায়ী মুমিন ব্যক্তিগণ এসব শয়তানী কাজ ও শয়তানী স্বভাব হতে দূরে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব কাজ, সে সব স্বভাব বর্ণনা করেছেন; সেগুলো অপছন্দ করেছেন, নিন্দা করেছেন এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার হুকুম দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হচ্ছে ان هذه الحشوش محتضرة নিশ্চয়ই এসব بيت الخلاء পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থানসমূহ- শয়তানদের উপস্থিতির স্থান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ آدَمَ وَإِنَّهُ يَضْحَكُ إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ هَاهْ هَاهْ -

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের পায়খানার রাস্তা নিয়ে খেলা করে এবং মানুষ যখন হা, হা করে উঠে তখন শয়তান হাসতে থাকে। এর উপর কেয়াস করুন ফিরিশতাদের স্বভাব অর্জনের প্রতি তারগীব তথা উৎসাহিত করাকে। এসম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ হচ্ছে– أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ "ফিরিশতারা যেভাবে সারিবদ্ধ হয় তোমরা কি সেভাবে সারিবদ্ধ হও না। এটি হলো শিষ্টাচারের বা আদবের অপর অধ্যায়।

স্মরণ রাখুন যে, কোনো বস্তুকে ফরজে কেফায়া হিসেবে নির্ণয় করার কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হলো এর জন্য সকল লোকের একত্রিত হওয়া তাদের জীবিকা নির্বাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তার প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহকে নিস্ফল করার দিকে নিয়ে যাবে। আর কিছু সংখ্যক লোককে এ কাজের জন্য নিয়োগ করা এবং অপরদেরকে অন্য কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হওয়া। যেমন জিহাদ। সমাজের সকল লোক একাজে একত্রিতভাবে নিয়োজিত হয়ে গেলে তাদের ক্ষেতি, বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা ত্যাগ করলে, তাহলে তাদের জীবিকা অকেজো হয়ে যাবে। তখন কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য নির্বাচন করা এবং কোনো লোককে জিহাদের জন্য নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। অন্য বাকি লোকদের ক্ষেতি, বাড়ি করার কাজে নিয়োগ দেয়া, কাকেও বিচার করার জন্য এবং বাকিদের বিদ্যার্জনের জন্য নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। কারণ কোনো কাজ একজনের জন্য সহজ হলে অপরের জন্য তা সহজ নাও হতে পারে। লোকদের নাম ও বিভাজন দ্বারা কে কোন কাজের উপযুক্ত তা জানা যায় না যে, তার উপর সে কাজ সোপর্দ করা যায়।

এর দ্বিতীয় কারণ হলো ফরজে কেফায়ার দ্বারা যে মাছলেহাত উদ্দেশ্য তা একটি নিয়মের অস্তিত্বের অধীন। যাকে বাদ দিলে ব্যক্তি সত্তার অবস্থার অবনতি হয় না, আর না পশুত্ব তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন বিচারকের কাজ ও ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় গুরু দায়িত্ব পালন করা। এসব বিষয় একটি নীতি ও শাসন কার্যপরিচালনার খাতিরে প্রচলন করা হয়েছে। এক ব্যক্তির ঐ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে তা লাভ হয়। যেমন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং জানাযার নামায; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেন রুগ্ন ব্যক্তি ও মৃতব্যক্তি পরিত্যক্ত হয়ে না যায়। আর কিছু লোক তা সমাধানের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

অধ্যায়-৬০

ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারণের মধ্যে নিহিত হিকমত

ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারিত না করে উম্মতের নিয়ন্ত্রণ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর এ সময় নির্ধারণ মোকাল্লেফীনদের- যাদের থেকে ইবাদত কামনা করা হয়েছে- অবস্থা জানার উপর নির্ভরশীল এবং এমন বিষয়বস্তুসমূহ গ্রহণ করার উপর যা লোকদের জন্য কষ্টসাধ্য না হবে তার উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় যেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য লাভ হয়ে যায়। এর সাথে সাথে এ সময় নির্ধারণের মধ্যে অন্যান্য হেকমত ও মাছলেহাত তথা কল্যাণও নিহিত রয়েছে। যা জ্ঞানবান ব্যক্তিরা অবগত রয়েছে। আর সে হিকমতসমূহ মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

তন্মধ্যে একটি হলো ঃ আল্লাহ তায়ালা যদিও তিনি সময়ের সীমা পরিসীমার উর্ধ্বে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস একে অপরের এ বিষয়ে সাহায্য করে যে, কখনো কখনো আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হয়ে যান। আবার কখনো তার সামনে তাদের আমল তথা কৃতকর্ম পেশ করা হয়। আবার কোনো কোনো সময় ঘটনা প্রবাহের মিমাংসা করা হয়। এছাড়া নতুন নতুন অবস্থারও মিমাংসা এবং নির্ধারণ করা হয়। যদিও ঐ সব নতুন অবস্থার আসল হাকীকত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ -

"শেষ রাতের তৃতীয় প্রহর বাকি থাকতে আমাদের প্রতিপালক পরওয়ারদেগার দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।" তিনি আরো এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ -

"নিঃসন্দেহে বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর সমীপে সোমবার দিন ও বৃহস্পতিবার দিন উপস্থাপন করা হয়।"

এছাড়াও শাবান মাসের পনেরো দিনের দিবাগত রাতের সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَيَطْلَعُ فِيْهَا وفى رواية يَنْزِلُ فِيْهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ـ

"নিশ্চয়ই ঐ রাতে আল্লাহ্ তায়ালা উঁকি দিয়ে দেখেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে ঐ রাতে আল্লাহ্ তায়ালা জমিনের আকাশে, দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।" এতদসংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে যা সকলের জানা।

মোটকথা দ্বীনের প্রয়োজনগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহর নিকট এমন কতগুলো সময় রয়েছে যে সময়গুলোতে জমিনে– পৃথিবীতে রুহানিয়ত প্রসার লাভ করে, সেখানে উপমাকর শক্তির প্রসার ঘটে। ইবাদত কবুল হওয়ার ও দোয়া কবুল হওয়ার তার চেয়ে উত্তম আর কোনো সময় হতেই পারে না। অতি অল্প প্রচেষ্টায় তথা ন্যূনতম প্রচেষ্টায় তখন বিশাল দরজা খুলে যায়। পশুর স্তর হতে ফিরিশতার স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য।

আল মালাউল আলা তথা ফিরিশতাজগত উর্ধ্বাকাশবাসীরা সে রূহানিয়াতের প্রসারের ও সে শক্তির সম্প্রসারের বিষয়টি আকাশের কোনো হিসেবের দ্বারা জানতে পারে না, বরং তারা তাদের আনন্দ উল্লাসের মাধমে বুঝতে পারে যে, তাদের অন্তরে কোনো বস্তু লুকিয়ে রয়েছে– তখন তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে আল্লাহর নিকট হতে কোনো সিদ্ধান্ত ফয়সালা অবতীর্ণ হওয়ার রয়েছে যা রুহানিয়াত সম্প্রসারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ও তার ন্যায় আরো কিছু সম্প্রসারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এটাই সে বস্তু হাদীসে যে সম্পর্কে বলা হয়েছে– بِمِثْلِ سَلْسَلَةٍ عَلَى صَفْوَانٍ যেন পাথরের উপর লোহার জিঞ্জির শিকল পতিত হওয়ার ন্যায়।

আম্বিয়া (আঃ)-দের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে من اعلا الا على এ জ্ঞান লুকিয়ে থাকে। আকাশের পরিবর্তনের-বিবর্তনের মাধ্যমে নয় বরং অন্তর দ্বারা তারা তা জেনে যান। তখন তারা ঐ সময়গুলোতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করেন। সুতরাং তারা লোকদেরকে নির্দেশ দেন ঐ সময়গুলোর হেফাযতের জন্য। তথা ঐ সময়গুলোতে আল্লাহর ইবাদতে রত থাকার জন্য।

ঐ রূহানিয়তের প্রকাশের সময়গুলোর মধ্যে ঃ

একটি হলো ঃ যা বছর ঘুরে আসার সাথে ঘুরে আসে। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী–

إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ، أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আমি পবিত্র কুরআনকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমিই ভয় প্রদর্শনকারী-সতর্ককারী। ঐ বরকতময় রাতে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। আমার পক্ষ হতে হুকুম হয়ে। নিশ্চয়ই আমিই রাসূলদের প্রেরণ করি।" আর ঐ বরকতময় রাতেই পবিত্র কুরআনের রূহানিয়ত পৃথিবীর আকাশে স্থাপিত হয়েছে। আর সকলের ঐকমত্য রয়েছে এ ব্যাপারে যে, তা হয়েছে পবিত্র রমজান মাসে।

তন্মধ্যে অপরটি হলো ঃ যা প্রতি সপ্তাহের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসে। তা একটি সামান্য স্বল্প সময়। যে সময়ের মধ্যে দোয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। মানুষ যখন পরপারে আখেরাতে চলে যাবে তখন সে সময়টিই আল্লাহর তাঁর বান্দাদের উপর তাজাল্লী বর্ষণের এবং আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী হওয়ার সময় হবে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, সে সময়টি হবে জুমায়ার দিন। আর সেজন্য দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যে, বিশাল বিশাল ঘটনাবলি এ জুমা বারেই– জুমার দিনেই সংঘটিত হয়েছে। যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর জন্ম। চতুষ্পদ জন্তু কখনো কখনো নিম্ন জগত হতে এ সময়ের জ্ঞান লাভ করে থাকে, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ও ঘাবড়িয়ে যায়। যেমন বিকট শব্দে কোনো ব্যক্তির ঘাবড়ানোর অবস্থা দেখা দেয়। আর তিনি তা জুমার দিনে প্রত্যক্ষ করেছেন।

তন্মধ্যে অন্যটি হলো ঃ ঐ সময়, যে সময়টি দিনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসে। আর এ রূহানিয়ত অপর রূহানিয়ত হতে কমজোর তথা দুর্বল। যারা উর্ধ্ব জগত হতে জ্ঞান প্রাপ্ত তারা সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, সেটি দিনের চারটি সময়। (১) সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর দণ্ডায়মান হওয়ার সামান্য পর (৩) সূর্যাস্তের পর (৪) অর্ধরাত হতে সেহেরীর সময় পর্যন্ত। ঐ সময়গুলোর সামান্য পূর্বে ও পরে রূহানিয়ত সম্প্রসারিত হয় ও বরকত প্রকাশ পায়।

পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যারা জানেনা যে, এ সময়গুলো ইবাদত কবুলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। অগ্নি উপাসকরা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করেছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের উপাসনা পূজা করতে লাগল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ তাহরীফের পথ বন্ধ করলেন এবং ইবাদতের সময় পরিবর্তন করে দিলেন। এমন সময় দ্বারা যে সময় তাদের সে সময়ের চেয়ে অধিক দূরবর্তী নয়। এমনকি মূল উদ্দেশ্যকেও ব্যাহত করে না। তিনি অর্ধরাতে মানুষের উপর কোনো নামায ফরজ করেননি। কারণ এতে অনুদারতা-অপ্রশস্ততা রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন–

اِنَّ فِی اللَّیْلِ سَاعَةً لاَ یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، یَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰی فِیْهَا خَیْرًا مِنْ اَمْرِالدُّنْیَاءِ اَلْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَیْلَةٍ ـ

“অবশ্যই রাতের মধ্যে একটা সময় রয়েছে। সে সময়ে কোনো মুসলমান বান্দা আল্লাহর নিকট তার দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কল্যাণ কামনা করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ সময় প্রতি রাতেই আসে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, اَفْضَلُ الصَّلاَةِ نِصْفُ اللَّیْلِ وَقَلِیْلٌ فَاعِلَة “উত্তম নামায় হলো অর্ধরাতের নামায। অর্ধরাতে নামায আদায়কারী খুবই কম।” তার নিকট জিজ্ঞেস করা হলো– ای الدعاء اسمع؟ “কোন দোয়া অধিক পরিমাণে কবুল হয়?” قال جوف الیل “রাতের দোয়া।” দ্বিপ্রহরের পরের সময় সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِیْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاَحَبُّ اَنْ یَصْعَدَ لِیْ فِیْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ ـ

“নিশ্চয়ই এটি এমন একটি সময়, যখন আকাশের দরজাসমূহ খোলা থাকে, আমি কামনা করি যেন ঐ সময় আমার কোনো নেক আমল আকাশে উত্থিত হোক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

مَلَائِكَةُ النَّهَارِ تَصْعُدُ اِلَيْهِ قَبْلَ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ تَصْعُدُ اِلَيْهِ قَبْلَ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ ـ

"দিনের ফিরিশতা রাতের ফিরিশতাদের পূর্বে আল্লাহর নিকট চলে যায়। (অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর রাতের ফিরিশতারা ডিউটিতে থেকে যায় এবং দিনের ফিরিশতারা ফিরে যায়।) আর রাতের ফিরিশতারা দিনের ফিরিশতাদের পূর্বে আল্লাহর নিকট ফিরে যায়। আল্লাহ তায়ালা এ অর্থের দিকেই তাঁর পবিত্র বাণীতে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন—

فَسُبْحَانَ الَّذِىْ حِيْنَ تَمْسُوْنَ، وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـ

"তোমাদের সকাল ও সন্ধ্যায় সর্ব সময়ে আল্লাহর পবিত্রতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা এবং রাতে ও দ্বিপ্রহরের সকল সময় তাঁর সকল প্রশংসা।" এতদসংক্রান্ত অনেক আয়াত রয়েছে তা সকলেই অবগত রয়েছে। আমি এর মাঝে বিশাল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি।

দ্বিতীয় মূলনীতি হলো ঃ আল্লাহ তায়ালার দিকে তাওয়াজ্জুহ হওয়ার উত্তম সময় হলো মানুষের প্রাকৃতিক দুশ্চিন্তা, হতবুদ্ধিতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা হতে মুক্ত হওয়া। যেমন ভিষণ ক্ষুধা। অতি ভক্ষণ। অধিক ঘুমের চাপ। অবসাদ ও দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া। ছোট বা বড় ধরনের ইস্তিঞ্জা (পায়খানা প্রস্রাব) আটকিয়ে রাখা। এবং কাল্পনিক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হওয়া। যেমন কান বধির হওয়া ধ্বংসাত্মক শব্দ দ্বারা অথবা অনর্থক ও মূল্যহীন শব্দ দ্বারা। চোখের অন্ধ হওয়া বিভিন্ন ধরনের চিত্র দ্বারা, চিন্তা শক্তির আচ্ছন্ন করার ন্যায় বিভিন্ন রং দ্বারা বা এ জাতীয় অন্যান্য হতবুদ্ধিতা হতে মুক্ত হওয়া।

অভ্যাসের বিভিন্নতার কারণে এ অভ্যাসগুলো বিভিন্ন হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী গঠনগতভাবে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। যেগুলো আরব অনারব প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সকলের নিকটই সমান; যে সকল বিষয় সবাইর ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। শরীয়তের বিধানে তাকেই সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এবং ঐ সব বিষয় যা তার বিপরীত, বিরল ও দুর্লব হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তা

হলো غدوة অর্থাৎ উষা ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় ও دلجة, রাতের প্রথমাংশের সময়।

মানুষের নফছের মধ্যে ঝং পড়ার পর রং ধরার পর মানুষের তা দূর করার জন্য শান বা ঘর্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে। এ প্রয়োজন তখন দেখা দেয় যখন সে বিছানায় ঘুমানোর জন্য গমন করে ও ঘুমানোর দিকে ধাবিত হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার পর কথাবার্তা বলা এবং কবিতা রচনা করতে নিষেধ করেছেন।

মানুষকে সর্বদা তার নিজের নফছের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার বিধাম করে না দেয়া হলে তাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে রাখা সম্ভব হবে না। যাতে তার মধ্যে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা, নামায আদায় করার পূর্বে সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং নামায আদায়ের পর তার নূর তার মধ্যে বিস্তৃত হওয়া বিষয়টি তার মধ্যে পাওয়া যায়, এতে হয়ত নামাযের পুরো সময় এতে পাওয়া যাবে তা না হলে অধিকাংশ সময় তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য নিয়ত করে শয়নকারী পশুত্বের ঘুমে ডুবে থাকে না। যদি কারো অন্তর দুনিয়াবী কোনো কাজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে বা কোনো নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে বা কোনো কাজের জন্য একাগ্রচিত্ত তথা মোতাওয়াজ্জুহ থাকে যাতে করে তা তার হাতছাড়া হয়ে না যায় সে পশুত্বের জন্য পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে না। আর এ রহস্যই লুকিয়ে রয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর মধ্যে : مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ। الحديث। "যে ব্যক্তি রাতে আল্লাহর যিকির বলতে বলতে জেগে উঠে।" আল হাদীস এবং আল্লাহ তায়ালার বাণীর رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ। "এমন অনেক লোক রয়েছে যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় কিছুই আল্লাহর যিকির হতে গাফেল বা বেখবর করে না।"

প্রতি দুই ওয়াক্তের মাঝে দিনের চার ভাগের এক ভাগের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়– তা তিন ঘণ্টা পরিমাণ সময় হবে। আরব এবং অনারব সকলের নিকটই দিবা ও রাত্রির ভাগ এরূপই। এটাই সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ভাগ। ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, প্রথম ব্যক্তি যিনি দিবারাত্রকে ঘণ্টায় ভাগ করেছেন তিনি হলেন নূহ (আঃ)। তাঁর বংশধরদের মধ্যে এ নিয়ম উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে।

তৃতীয় মূলনীতি হলো : ইবাদত আদায়ের সময় হবে সে সময় যা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মধ্যে কোনো নেয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দেবে। যেমন

আশুরার দিন। ঐ দিন আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের বিরুদ্ধে মূসা (আঃ)-কে সাহায্য ও বিজয় দিয়েছেন। তিনি সেদিন রোজা পালন করেছেন এবং বনী ইসরাইলকে ঐ দিন রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন রমজান মাস। এ মাসে পবিত্র কুরআনে কারীম নাজিল হয়েছে যাতে মিল্লাতে ইসলামীর আবির্ভাবের সূচনা ছিল। অথবা সে সময় এমন হবে যখন আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে– পয়গম্বরদেরকে তাঁদের প্রতিপালকের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং তাদের সে ইবাদত তাঁর নিকট কবুল হওয়ার কথা স্মরণ করাবেন। যেমন কুরবানীর ঈদের দিন। ঐ দিন হযরত ইসমাইল (আ)-এর জবাইয়ের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে বিশাল জবাইর কথা– কুরবানীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অথবা তা হবে দ্বীনের কোনো বিশেষ شعائر الدين নিদর্শনকে স্মরণ করানোর দিন। যেমন ঈদুল ফিতরের বা রোজার ঈদের দিন। ঐ দিন নামায আদায় ও সদকা করা রমজানের রোজার শানকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার রোজা পালনের তাওফিক দেয়ার শোকর আদায় হয়। যেমন কুরবানীর দিন। তাতে হাজী সাহেবদের সাথে ঐকমত্য পোষণ ও হাজীদের ন্যায় হওয়া এবং হাজীদের জন্য যেসব স্থান প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেসব স্থানের মধ্যে আল্লাহর রহমত কামনা করা। অথবা উম্মতের মুখে মুখে যাদের কল্যাণের আলোচনা বিদ্যমান তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা আল্লাহর আনুগত্য করেছেন ঐ সময়ে তাদের সুন্নাতের অনুসরণ হবে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়। জিবরাইল (আঃ)-এর কথা অনুযায়ী–

هٰذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ـ

"এটা আপনার সময় ও আপনার পূর্ববর্তী নবীদের সময়।" অথবা যেমন রমজান মাস সম্পর্কে মহান আল্লাহর এরশাদ– এ আয়াতের এক তাফসীর অনুযায়ী–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ

"তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছিল।"

আবার যেমন আশুরার দিনের রোজা সম্পর্কে আমাদের মতানুযায়ী। আর এ তৃতীয় মূলনীতি অধিকাংশ সময় নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য, এ ছাড়া দুটি মূলনীতি হলো প্রধানত মূলনীতির মূলনীতি। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

অধ্যায়-৬১

সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণের হিকমত তথা রহস্য

স্মরণে রাখতে হবে যে, শরিয়ত কোনো হিকমত ও মাছলেহাত ব্যতীত কোনো প্রমাণাদি ছাড়া কোনো সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ করেনি, যদিও পরিপূর্ণ ভরসা ঐ حدس এর উপর নির্ভরশীল, যা মোকাল্লেফীনদের অবস্থা জানার উপর ভিত্তি করে এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার সময় যা তাদের জন্য উপযোগী তার প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে।

এ মাছলেহাত ও হিকমত কতগুলো মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। এসব মূলনীতির প্রথমটি হলো ঃ বিজোড় সংখ্যা, একটি মোবারক তথা সম্মানিত সংখ্যা, বরকতময় সংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংখ্যা যথেষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ত্যাগ করে অপর সংখ্যা গ্রহণ করা হয় না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ -

"আল্লাহ তায়ালা বিজোড়, তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন, অতএব হে পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহকেরা, আহলে কুরআনেরা! তোমরা বিতরের নামায আদায় কর। (মেশকাত হাদীস নং ১২৬৬)।

এর রহস্য ঃ সংখ্যা যত অধিকই হোক তার ভিত্তি হলো وحدة বা এক। এ وحدة এর নিকটবর্তী বিজোড় সংখ্যা হলো وتر বা বিজোড় সংখ্যা। কারণ সংখ্যার সকল পর্যায়েই এক وحدة غير حقيق থাকে। যে কারণে তার সে মর্যাদা নির্ণীত হয়। যেমন ধরুন (১০) দশ সংখ্যাটি। এটি অনেকগুলো وحدة তথা এক মিলে হয়েছে। পাঁচ ও পাঁচ মিলে হয়নি। এমনিভাবে অপর সংখ্যাগুলো। এ এককটি হচ্ছে মূল এককের হাকীকত তথা মূল এককের ভিত্তি। আর এ এককটি মূল এককের উত্তরাধিকারী। আর বিজোড় সংখ্যার মধ্যে এ وحدة তথা একক বিদ্যমান রয়েছে। আর সে একক হচ্ছে এ সংখ্যাটিকে সঠিকভাবে সমান দুটি এককে ভাগ তথা বিভাজন করতে না পারা বা না হওয়া। আর জোড়ের তুলনায় এককটি বিজোড়ের কাছাকাছি। প্রত্যেক বস্তুর স্বীয় মূলের দিকে প্রত্যাবর্তনই আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তনের নামান্তর। কারণ আল্লাহ তায়ালা সকল ভিত্তির উৎপত্তি, সূচনা ও উৎস। আল্লাহর সত্তাই একমাত্র পরিপূর্ণ একক। من خلق يخلق الله

অতঃপর জেনে রাখুন যে, বিজোড় ও একক সংখ্যাগুলো বিভিন্ন স্তরের হয়। এক বিজোড় সংখ্যা হলো তা জোড় সংখ্যার সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর তা সে বিজোড় সংখ্যার পার্শ্ব তথা বাহু হয়। যেমন ১৯ সংখ্যাটি ও ৫ সংখ্যাটি। এ দুটি সংখ্যা হতে এক বাদ দিলে তারা সমান সমান দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৯ সংখ্যাটি যদিও দুই দ্বারা ভাগ হয় না কিন্তু সে তিন দ্বারা ভাগ হয়। এমনিভাবে জোড় সংখ্যাগুলোরও স্তর রয়েছে। জোড় সংখ্যা যা বিজোড় সংখ্যার সাদৃশ্য হয় যেমন ১২ সংখ্যাটি; এটি তিনবার চার এর সমমানের আবার যেমন ৬ সংখ্যাটি তা তিনবার দুয়ের সমমানের সংখ্যা।

বিজোড় ও একক সংখ্যার ইমাম এবং তন্মধ্যে জোড় সংখ্যার সাদৃশ্য হতে অনেক দুয়ের সংখ্যা এক এর সংখ্যা। তার অছিয়তকারী ও তার খলিফা প্রতিনিধি– স্থলাভিষিক্ত ও তার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হলো ১৩ এবং ৭। এ ছাড়া যত সংখ্যক বিজোড় সংখ্যা রয়েছে তারা সবাই "একের" সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক পরিমাণের ক্ষেত্রে তিন ও সাতকেই গ্রহণ করেছেন।

যেখানে আল্লাহ তায়ালার হিকমতের দাবি যে, তার চেয়ে অধিক পরিমাণ বুঝায়, এ জাতীয় সংখ্যা হুকুম দেয়া হবে, তখন এদের মধ্যকার কোনো সংখ্যার উচ্চতর, উর্ধ্বতন ও উৎকৃষ্ট সংখ্যা গ্রহণ করেন। যেমন একের উন্নতি হয় ১০/১১০০ ও ১০০০ এর দিকে এবং স্বয়ং ১১ এর দিকে। এবং যেমন তিনের উন্নতি হয় ৩০/১৩৩৩০০ এর দিকে। এবং সাতের উন্নতি হয় ৭০ এবং ৭০০ এর দিকে। সংখ্যার উন্নতির কারণে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা মূলত ঐ মূল সংখ্যাই। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর একশত কালেমা পাঠ করা সুন্নত করেছেন। ঐ সংখ্যাকে তিনি ভাগ করেছেন ৩৩/৩৩/৩৩ এর দিকে। অবশিষ্ট রাখলেন ১ সংখ্যাটিকে। যাতে পুরো সংখ্যাটি বিজোড় হয়ে যায়, যা প্রত্যাবর্তন হয় ইমামের দিকে বা তার উপদেষ্টার দিকে।

প্রত্যেক জাওহার এবং আরদের মাকুলার জন্য একজন ইমাম ও একজন উপদেশদাতা রয়েছেন যেমন বিন্দু হলো ইমাম এবং বৃত্ত ও বল তাদের উপদেষ্টা এবং ছবির দিক থেকে তাদের নিকটতম।

আমার পিতা কুদদিছ ছিররুহু আমাকে বলেছেন যে, তিনি একটি বিরাট ঘটনা প্রত্যাক্ষ করেছেন। যেখানে অভিনয় করেন জীবন, জ্ঞান, ইচ্ছা ও আল্লাহর অপরাপর গুণাবলি, অথবা তিনি বলেছেন যে, সেখানে অভিনয় করেছেন, আল

হাই, আল আলীম, মুরীদ ও আল্লাহ্‌র অপরাপর সুন্দর নামগুলো। আমার স্মরণে নেই যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোনোটির কথা তিনি বলেছেন। উত্তর বৃত্তের ন্যায়। এরপর তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, অতিমিশ্র তথা সূক্ষ্ম বস্তুর আকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে অভিনয় তা বিন্দুর সবচেয়ে নিকটতম হয়ে থাকে। আর সেটি বৃত্তের ছাদের উপর এবং বলের দেহের মধ্যে হয়ে থাকে (তাঁর বাণী শেষ)।

জেনে রাখুন! আল্লাহ তায়ালার সুন্নাত তথা অনুসৃত রীতি পদ্ধতি হলো এককের নাজিল হয় অধিকের প্রতি মেছালী এরতেবাতের মাধ্যম তথা মিলনের মাধ্যমে। আর সে সম্বন্ধের মাধ্যমে ঘটনাবলি প্রকাশ পায়। আর সেটিকেই যথাসম্ভব মেনে চলে অনন্তকালের রীতি পদ্ধতি তথা আল্লাহ্ তায়ালার চিরাচরিত নিয়ম।

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ উৎসাহ উদ্দীপনা তারগীব ও তারহীবের উদ্দেশ্যে যেসব সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার রহস্য উদঘাটন। জেনে রাখুন! কখনো কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাপ ও পুণ্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং নেকীর তথা পুণ্যময় কাজের ফজিলত এবং পাপের তথা গুনাহের কাজের আয়েব মন্দ ও দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সেগুলো বর্ণনা করেছেন যা আল্লাহ তাঁকে বলেছেন। তখন যে জিনিসের অবস্থা তিনি জেনেছেন তার সংখ্যা তিনি বলেছেন। কিন্তু এতে সে বস্তুর গুণাবলি ও সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা তার উদ্দেশ্য নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ : حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا اَلْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِىْ مَسَاوِئْ اَعْمَالِهَا اَلنَّخَاعَةُ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لَاتُدْفَنُ ـ

"আমার নিকট আমার উম্মতের আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের ভালো ও মন্দ আমল। তাদের ভালো আমলের মধ্যে পেয়েছি রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর তাদের মন্দ আমলের মধ্যে সে কফ, শ্লেষ্মা যা মসজিদে ফেলা হয়েছে, যাকে মাটিতে পুতে ফেলা হয়নি।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ

مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَذَنْبًا أَعْظَمُ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْآيَةٍ أوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا ـ

"আমার নিকট আমার উম্মতের পুরস্কার প্রতিদান ও সওয়াবসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশেষে কোনো ব্যক্তি মসজিদ হতে খড়কুটা ধূলিকণা ইত্যাদি বের করলে কি সওয়াব পাবে তাও। আমার নিকট আমার উম্মতের পাপসমূহও উপস্থাপন করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা বা আয়াত মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়ার গুনাহ হতে বড় গুনাহ আর আমি দেখিনি।"

এ পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীকেও বুঝে নেয়া একান্ত প্রয়োজন- ثَلَاثَةٌ لَهُمُ الْأَجْرَانِ ـ الحديث তিন ব্যক্তির জন্য দুটি পুরস্কার -আল হাদীস এবং তাঁর বাণী ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى الحديث। তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তায়ালা কোনো কথা বলবেন না।

আল হাদীস এবং তাঁর অপর বাণী-

أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مُحَنَّةُ الْعَنْزِ لَايَعْمَلُ عَبْدٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رِجَاءَ ثَوَابِهَا أَوْتَصْدِيْقِ مَوْعُوْدِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ ـ

চল্লিশটি কথা, তন্মধ্যে সবচেয়ে সর্বোচ্চ কথা হলো, বকরী উপঢৌকন দেয়া। কোনো ব্যক্তি সেগুলোর একটির উপরও যদি সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ওয়াদাকৃত সত্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ আমল করে তাহলে এর কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

কখনো কখনো তাঁর নিকট কোনো আমলের ফজিলত অথবা কোনো বস্তুর অংশসমূহ এজমালীভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি তখন ঐ আমলের ফজিলত ও ঐ বস্তুর অংশগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেন। তখন তিনি সে জন্য এমন একটি সংখ্যা নির্ধারণ করেন যাতে ঐ বস্তুর অধিক পরিমাণে হওয়া, বা যে বস্তুর সম্মান অধিক বা তার ন্যায় সেগুলো তাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি এসম্পর্কে সংবাদ দেন, লোকদের বলেন।

এ পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً -

একলা নামায হতে জামাতের সাথে নামায আদায়ের সওয়াব সাতাইশ গুণ বেশি। এসংখ্যা নিঃসন্দেহে ৩ × ৩ × ৩-এর সমপরিমাণের। তিনি দেখেছেন যে, জামাতের সাথে নামায আদায়ের সওয়াব ও উপকারিতা তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

(১) যেসব কল্যাণ নামাযীর নিজের মধ্যে সংঘটিত হয় ঃ তার চরিত্র সুন্দর হওয়া, সম্পদের অধিকারী হওয়া, পশুত্ব স্বভাব দূর হওয়া।

(২) যেসব উপকারিতা ও কল্যাণ অন্যদের প্রতি হয় ঃ মানুষের মধ্যে সুন্নাতের সঠিক প্রচার হওয়া, তাতে আমলের জন্য তাদের প্রতিযোগিতা করা। এর দ্বারা তাদেরকে সুষমামণ্ডিত করা, এবং সুন্নাতের উপর তাদের ঐকমত্য হওয়া।

(৩) যেসব কল্যাণ উম্মতের প্রতি হয় ঃ মিল্লাতে মুহাম্মদীর চির সবুজ ও চিরঞ্জীব হয়ে টিকে থাকা, তাদের মধ্যে কোনো ধরনের তাহরীফের প্রবেশ না হওয়া। তাদের মাঝে দ্বীনের কদর যেন কমে না যায়।

প্রথম প্রকারের মধ্যে তিনটি উপকারিতা রয়েছে ঃ (১) আল্লাহ তায়ালার সাথে নৈকট্য লাভ, (২) তাদের জন্য নেক লিখে দেয়া, (৩) তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া।

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে তিনটি উপকার ঃ (১) তাদের জাতি ও শহরের পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা (২) দুনিয়ার জীবনে তাদের প্রতি বরকত বর্ষিত হওয়া (৩) আখেরাতে নামাজিদের পরস্পরের জন্য সুপারিশ করা।

তৃতীয় প্রকারের মধ্যে তিনটি উপকারিতা ঃ (১) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সকলের চলা (২) আল্লাহর দ্বীনকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করা (৩) লোকদের একজনের নূর অপরজনের উপর প্রতিফলিত হওয়া।

উক্ত নয়টির মধ্যেকার সবগুলোতে তিনটি উপকারিতা ঃ (১) তাদের প্রতি আল্লাহর খুশি হওয়া, রাজি হওয়া (২) তাদের প্রতি ফিরিশতাদের দোয়া বর্ষিত হওয়া (৩) তাদের থেকে শয়তান দূরীভূত হওয়া।

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ بخمس وعشرين **'পঁচিশ দরজা'** আর তার ব্যাখ্যা হলো ঃ জামাতের উপকারিতা (৫×৫) পাঁচকে পাঁচ দ্বারা গুণ করার সমান।

(১) তাদের ব্যক্তি চরিত্রের সংশোধন। (২) তাদের জামাতের সঠিকভাবে চলা (৩) তাদের মিল্লাতের (জাতির) টিকে থাকা। (৪) ফিরিশতাদের খুশি হওয়া। (৫) তাদের থেকে শয়তানের পেছনে হটে যাওয়া।

আবার এ পাঁচ উপকারিতার প্রত্যেকটির মধ্যে পাঁচটি করে উপকারিতা নিহিত রয়েছে। (১) তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট হওয়া (২) দুনিয়ার জীবনে তাদের প্রতি বরকত নাযিল হওয়া (৩) তাদের জন্য নেক লিখে দেয়া (৪) তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া। (৫) এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফিরিশতাদের তাদের জন্য সুপারিশ করা। এক্ষেত্রে বর্ণনার বিভিন্নতা ও বুঝের বিভিন্নতার কারণে। আল্লাহই ভালো জানেন।

কখনো কখনো সংখ্যার উল্লেখ করা হয় সে বস্তুর মহত্ত্ব এবং বিশালতা প্রকাশ করার জন্য। তখন উপমা হিসেবে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। তার উপমা হলো, যেমন বলা হয়, অমুকের ভালোবাসা আমার অন্তরে পাহাড়ের ন্যায় বা অমুকের মর্যাদা আকাশসম। এর উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীর মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। يفسح في قبره سبعون ذراعا তার কবর সত্তর হাত পরিমাণ প্রশস্ত করা হবে।" তাঁর অপর বাণী قد البصر দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত। এবং তাঁর অমর বাণী ان حوضي ما بين الكعبة وبين المدرس আমার হাউজের (হাউজে কাওছারের) প্রশস্ততা পবিত্র কাবা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী স্থানের পরিমাণ এবং তাঁর বাণী حوضي لابعد من ايلة الى عدن আমার হাউজের দূরত্ব আইলা ও আদনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এ জাতীয় বিষয়াবলিতে কখনো এক পরিমাণ এবং দ্বিতীয়বার অপর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, এরূপ করার মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্ব নেই।

তৃতীয় মূলনীতি ঃ প্রকাশ্য ও নির্ধারিত সীমা ব্যতীত কোনো জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা অনুচিত তথা উচিত নয় বা কাম্য নয়। যে সব বিষয় ব্যবহার করা হয় কোনো বিধানের ক্ষেত্রে তার সহজাত হুকুমের ভিত্তি রূপে এবং হিকমতের সাথে। আওকিয়ার সাথে ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে দিরহামের পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত নয়। আর খেজুরের পরিমাণ ওসকের সাথে ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে করা উচিত নয়। এমন কোনো অংশ (হিসসা) গ্রহণ করা যাবে না যা অংক শাস্ত্রের বিশেষ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন সতেরোতম অংশ বা উনিশতম অংশ। এ কারণে আল্লাহ

তায়ালা ফরায়েজের ক্ষেত্রে (সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে) এমন টুকরা অংশ গ্রহণ করেছেন যাকে অর্ধেক করা যায়, দ্বিগুণ করা যায়, যাকে ভাগ করে তার শেষ সীমায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

এগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হলো ঃ সুদুছ ছয় ভাগের এক ভাগ– ثلث সুলুছ তিন ভাগের এক ভাগ ও ثلثان সুলছানে তিন ভাগের দু' অংশ।

দ্বিতীয় ভাগ হলো ثمن সুমুন আট ভাগের এক অংশ, ربع রুবুউ চার ভাগের এক ভাগ ও نصف নিছফ দুই ভাগের এক অংশ।

এর রহস্য ঃ এর মধ্যে লুকায়িত রহস্য হলো অধিক পাওনাদারের পাওনা এবং অল্প পাওনাদারের পাওনা পরিষ্কার হয়ে যাবে সহজভাবে। অপর রহস্য হলো, দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকলের প্রাপ্য সংক্রান্ত মাসয়ালা বের করা সহজ হবে। প্রথমত, যদি কখনো এমন পরিমাণের প্রয়োজন হয় যে কোনো পরিমাপ নির্ণয় বা নির্ধারণ করতে হবে যাদের মধ্যকার সম্পর্ক হবে দ্বিগুণের। তাহলে সে ক্ষেত্রে তিন ভাগের এক অংশ হতে অর্ধেক বাড়ানো সম্ভব হবে না বা এককের মধ্যে তিন ভাগের এক অংশের, চারের এক ভাগ অথবা অর্ধেক কারণ সমগ্র অংশগুলোই আরো অস্পষ্ট।

যখন কোনো বস্তুর পরিমাণ ঠিক করার ইচ্ছা করা হবে, যা কোনো পর্যায়ে অনেক সংখ্যক। তখন সে বস্তুকে তিন দ্বারা পরিমাপ করা চাই, আর যদি তা হতে অধিক সংখ্যা দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করতে চায় তাহলে তাকে দশ দ্বারা পরিমাপ করা উচিত। যখন কোনো বস্তু স্বল্প পরিমাণের হবে বা অধিক পরিমাণের হবে তখন উচিত হবে সর্বনিম্ন সীমা গ্রহণ করা অথবা সর্বাধিক সীমা গ্রহণ করে তাকে দুভাগে ভাগ করে নেয়া।

যাকাতের অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য হলো ঃ خمس এক-পঞ্চমাংশ , عشر এক দশমাংশ, نصف العشر ওশরের অর্ধেক, وربع العشر ওশরের চার ভাগের এক ভাগ। কারণ যাকাতের বাড়তি হওয়া সম্পদের আধিক্য ও তার ব্যয়ের ক্ষেত্র কম হওয়ার উপর নির্ভর করে। দেশের সমগ্র জনগণের অধিকাংশের আয়ের পরিমাণ চার পর্যায়ের হয়ে থাকে। প্রত্যেক দু'পর্যায়ের মাঝে প্রকাশ্যভাবে পার্থক্য হওয়া উচিত। যাতে ঐ চার স্তরের এক স্তর দ্বিতীয় স্তরের দ্বিগুণ হয়। অচিরেই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হবে।

যখন সম্পদের মালিকের মেছাল হিসেবে সম্পদের পরিমাণ ঠিক করার প্রয়োজন দেখা দেবে; তখন দেখতে হবে ঐ সব মাল যাকে প্রচলিত নিয়মে

সম্পদ ধরা হয় এবং যতটুকু মাল হলে তাকে মালদার হিসেবে ধরা হয়। আর তা গ্রহণ করা হবে সমগ্র দুনিয়ার লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে, প্রাচ্য-প্রতিচ্য আরব-অনারব নির্বিশেষে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে। কোনো বাধা প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তা হবে প্রাকৃতিকগতভাবে সবাইর নিকট গ্রহণযোগ্য বস্তু। যদি তা জমহুর তথা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তা সকলের দৃষ্টিতে ঠিক হবে না। প্রথম আরবদের অবস্থা গ্রহণযোগ্য। তারা হলেন ঐসব লোক যাদের মাঝে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। এবং যাদের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী শরীয়তের বিধান নির্ধারিত হয়েছে। এ কারণে শরীয়ত ধন ভাণ্ডারের সীমা ও পরিমাণ ঠিক করেছে পাঁচ আওকিয়া দ্বারা। তা এজন্য করা হয়েছে যে ছোট্ট পরিবারের জন্য পাঁচ আওকিয়া যথেষ্ট পুরো বছরের জন্য অধিকাংশ জনবসতিতে। ইল্লা মাশাআল্লা, দুর্ভিক্ষের সময়ে অথবা বড় ধরনের শহরে বা তার আশপাশের অবস্থা অন্য রকম হতে পারে এবং ছোট পশুপালের জন্য পরিমাণ ধরা হয়েছে চল্লিশটিকে। আর বড় পশুপালের জন্য একশত বিশটিকে। অধিক ফসলের পরিমাণ ধরা হয়েছে পাঁচ ওসকে। এটা এজন্য ধরা হয়েছে যে, ছোট্ট পরিবারে স্বামী-স্ত্রী এবং তৃতীয় ব্যক্তি হয়তবা চাকর ও একটি সন্তান থাকে। দিবা রাত্রে তারা অধিক খেলে এক মুদ অথবা এক রেতেল পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করে থাকে। এজন্য তাদের শুধু তরকারির প্রয়োজন বাকি থাকে। তাদের পুরো বছরের জন্য এ পরিমাণ যথেষ্ট হয়। পানির পরিমাণ ধরা হয়েছে দুমটকা। এটা এজন্য যে, আরবদের রীতি অনুযায়ী কোনো ভাবেই এর চেয়ে নিচে যাওয়া যায় না। শরীয়তের অন্যান্য বিধানগুলোকে এর উপর কেয়াছ করে নিন। বাকিটুকু আল্লাহ্ই ভালো অবগত রয়েছেন।

অধ্যায়-৬২

কাজা ও রোখছতের হিকমত

স্মরণ রাখবেন যে, নিয়ম হলো যখন কোনো বিষয়ের হুকুম দেয়া হয় বা কোনো কিছু করা হতে কাকেও বিরত রাখা হয়, আর যাকে হুকুম দেয়া হলো বা বিরত রাখা হলো সে সম্পূর্ণভাবে জানেনা যে, এ আদেশ বা নিষেধের মাঝে কি হিকমত নিহিত রয়েছে, তখন অবশ্যই বিষয়টি এমন হতে হবে যাতে সে বিষয়ের চরিত্র দ্বারা সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, তাকে এটা মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু তখনো সে সে বিষয়ের তাছির সম্পর্কে ও তাছিরের কারণ সম্পর্কে জানতে

পারে না। যেমন মন্ত্রের বিষয়টি। ঐ ব্যক্তি জানেনা তার কার্যকারিতার কারণ। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধের মধ্যে কি হিকমত নিহিত রয়েছে তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র তার উম্মতের বিজ্ঞ ও জ্ঞানী পণ্ডিতদের জন্য ঐ হিকমতের কিছুটা ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে দ্বীনের পতাকাবাহীদের, খোলাফায়ে রাশেদীনদের এবং দ্বীনের ইমামদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে ফিকির তথা চিন্তা-ভাবনা হতে উম্মতের চিন্তা অধিক ছিল।

হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন–

اَحْسِبُ جِزْيَةَ الْبَحْرَيْنِ وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ وَاُجَهِّزُ الْجَيْشَ وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ ـ

"আমি নামাযরত অবস্থায় বাহরাইনের জিজিয়া করের হিসাব করে নেই। এবং আমি নামাযরত অবস্থায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করি।" এজন্য অতীতের এবং বর্তমানের সকল মুফতিদের অনুসৃত নীতি হলো তারা ফতোয়া দেয়ার সময় মাসয়ালার দলিলের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন না। এবং অবশ্যই নির্দেশিত বিষয়টিকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নেবে, যেভাবে করা প্রয়োজন। এবং নির্দেশিত বিষয়টিকে ত্যাগ করলে সেজন্য তাকে কঠিন ও কঠোরভাবে তিরস্কার করা হবে এবং তাদের অন্তরকে সেদিকে আগ্রহী করে তুলবে এবং তাকে ভালোবাসবে যেমন ভালোবাসা প্রয়োজন। যাতে ভেতরে বাহিরে সকল ক্ষেত্রে হক তথা সত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি যখন এমন তখন যদি কোনো জরুরি বিষয় সে নির্দেশিত কর্ম করার পথে প্রতিবন্ধক হয়, তখন তার স্থলাভিষিক্ত হয় এমন বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। তা এজন্য যে, তখন বিধান পালনকারী দুটি বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করেন ঃ

(১) যত কষ্টই হোক সে কাজটি বা নির্দেশিত বিষয়টি তাকে পালন করা। এরূপ করা শরীয়তের খেলাফ যেমন আল্লাহ বলেছেন–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ কাজটি চান, তিনি তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করতে চান না।"

(২) অথবা নির্দেশিত কাজটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে। তাহলে তার প্রবৃত্তি তথা নফস তা ত্যাগ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এবং সে নির্দেশিত কাজ ত্যাগ করে নির্ভীকভাবে বেপরোয়াভাবে চলতে থাকবে।

নফসকে প্রশিক্ষণ দেয়া বেয়াড়া প্রাণীকে সোজা করার ন্যায়। তার ক্ষেত্রে মহব্বত ও আগ্রহকে গনিমত হিসেবে ধরে নেয়া হয়। যে ব্যক্তি রিয়াজাতে নফসানীতে তথা নিজের নফসকে সোজা পথে চালানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছে বা শিশুদের শিক্ষায় অথবা কোনো চতুষ্পদ জন্তুকে পোষ মানানোতে অথবা এ জাতীয় কাজে ব্যস্ত হয়েছে সে বলতে পারবে বা জানে যে, কিভাবে বিরতিহীন ভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহব্বত তথা ভালোবাসা লাভ হয়। আর সে কাজ ত্যাগ বা তাতে ঢিল দেয়ার মাধ্যমে কিভাবে ভালোবাসা দূর হয়ে যায়। নফস তখন সে কাজকে সে আমলকে বোঝা মনে করে এবং তা নফসের জন্য কঠিন মনে হয়। তারপর সে যখন সে আমলের দিকে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করে তখন দ্বিতীয় বার ভালোবাসা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হয়।

আমলের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তা কাজা করার বিধান দেয়া অত্যাবশ্যকীয় হয় এবং আমলের জন্য রোখছতের বিধান দেয়া এবং যাতে সহজে তা পালন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা এবং কাজটি তথা আমলটি যেন তার জন্য সহজ হয় সে ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে উত্তম হলো যাদের উপর আমলটি ফরজ করা হয়েছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং সে আমলের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সে আমল ও তার সকল অংশ আমলকারীর নিকট উপস্থাপন করা। এতদসত্ত্বেও এ আল্লাহর দেয়া অধিকার এবং এ রোখছতের জন্য কিছু মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যা অবগত রয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো রোকন। রোকন ও শর্তের মধ্যে দুটি জিনিস রয়েছে–

প্রথমটি ঃ আছলী তথা মূল ঃ যা সে বস্তুর হাকীকতের মধ্যে রয়েছে তথা হাকীকতের মধ্যে বিদ্যমান। অথবা এমন অত্যাবশ্যকীয় বিষয় মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ করলে যা ব্যতীত সে উদ্দেশ্য চিন্তা করা যায় না। যেমন দোয়া (অর্থাৎ ফাতেহার মূল উদ্দেশ্য) এবং রুকার আমল যা তাজিম তথা সম্মান করা বুঝায়। যেমন পবিত্রতা এবং খুশুর দুটি গুণের সংবাদ যা অযু এবং সিজদার উদ্দেশ্য) আর এগুলো এমন বিষয় যা খুশি অখুশি কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যাবে না, ছাড়া যাবে না। কারণ এগুলো ত্যাগ করা অবস্থায় কোনো অবস্থাতেই কোনো আমল পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়টি তাকমিলী তথা পূর্ণতা দানকারী ঃ যা শরীয়তের বিধান রূপে স্বীকৃত হয়েছে অন্য কারণে, ওয়াজেব হওয়ায়। তা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ার কারণে। এ আনুগত্য ব্যতীত সে জন্য অপর কোনো সময় উপযুক্ত নয়। অথবা এটা শরীয়তের বিধান রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে যে তা এমন একটা অতি উত্তম মাধ্যম যার মাধ্যমে এর আসল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে পালিত হবে। এ প্রকারের মর্যাদা তথা মাহাত্ম্য হলো যে, مجبوری কষ্টকর সময়ে এর মধ্যে সহজ করা হবে।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে অন্ধকারে এবং এ জাতীয় কোনো সময়ে কেবলামুখী হওয়ার ক্ষেত্রে তা ত্যাগ করা যেতে পারে। তখন কেবলামুখী হওয়া হতে রোখছত পাওয়া যেতে পারে। যে ব্যক্তির কাপড় নেই তার জন্য সতর ঢাকা ত্যাগ করা, আবার যে ব্যক্তি পানি পায় না তার জন্য তাইয়াম্মুম করা এবং যে ব্যক্তি ফাতেহা পাঠ করতে অক্ষম তার জন্য অপর কোনো যিকির পাঠ করা, কেয়াম করার ক্ষমতা না থাকলে বসে বা শুয়ে যাওয়া এবং রুকু ও সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তি ইশারায় নামায আদায় করা ইত্যাদির সুযোগ তথা রোখছত লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ পরিবর্তিত বিষয়ের মধ্যে এমন কিছু বিষয় যোগ করে দিতে হবে যাতে তা দ্বারা মূল বিষয় স্মরণে থাকে। এবং বুঝা যায় যে এটা তার নায়েব তথা তার স্থলাভিষিক্ত ও তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরূপ করার রহস্য ঃ রোখছত তথা সুবিধা ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য হাসিল করা। আর তাহলো যেন প্রথম আমলের তথা মূল আমলের সাথে ভালোবাসা ও তার প্রতি আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে। আর সে জন্য আমলকারীর সত্তা অপেক্ষমাণ থাকে। এ কারণেই مسح على الخفين মোজার উপর মাছেহ করার জন্য পূর্বশর্ত করা হয়েছে পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করা এবং সে জন্য একটি সময়ও নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, যে সময়ে পৌঁছে তা শেষ হয়ে যাবে। কেবলা ঠিক করার শর্তারোপ করা হয়েছে।

তৃতীয় মূলনীতি ঃ প্রত্যেক বিপদজনক অবস্থায়ই রোখছত দেয়া হয় না, তা এ কারণে যে, বিপদের ধরন অনেক-অসংখ্য। আর সকল বিপদে তথা সকল সমস্যায় রোখছত দিতে গেলে মূল বিষয়টিকেই নিষ্ফল ও অর্থহীন করে দেবে। আর এভাবে রোখছত তথা অনুমতি দিতে গেলে কষ্ট করা ও কঠিন কিছু মোকাবেলা করার ক্ষমতাই বিনষ্ট হয়ে যাবে। অথচ তাই শরীয়তের আনুগত্যের

প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এবং নফসকে পবিত্র করে দেয়। আল্লাহ তায়ালার হিকমত হলো যে এ বাণী অধিক পরিমাণে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হয় এবং সে সবক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে পরীক্ষা অনেক। বিশেষ করে সে জাতির জন্য যাদের ভাষায় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাদের নিয়মানুযায়ী শরীয়তের বিধান নির্ধারিত হয়েছে।

আনুগত্য যেন স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সে দিকে সাধ্যমত দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কারণে সফর অবস্থায়, ভ্রমণ অবস্থায় নামাযে কছরের বিধান রাখা হয়েছে। কষ্টকর কাজের মধ্যে এবং কৃষক ও কর্মচারীদের জন্য তা করা হয়নি। জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সফরকারীর জন্য যা বৈধ করা হয়েছে অজাঁকজমকপূর্ণভাবে সফরকারীদের জন্যও তাই বৈধ করা হয়েছে।

কাজা : কাজার মধ্যে এক ধরনের কাজা হলো যুক্তিসম্মত, যথার্থ ও যথাযথ কাজা। আবার কাজার মধ্যে রয়েছে যা যথার্থ বা হুবহু ঐ আমলের কাজা নয়। আল্লাহর আনুগত্যের আসল তথা মূল হলো আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা এবং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নফসকে মোয়াখাজা করা। তাহলে যে ইচ্ছা ও এরাদা ব্যতীত আমল করে, যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি, অথবা নামাযকে ভুলে যাওয়া ব্যক্তি, অথবা সে এমন অবস্থায় যে সে তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে অক্ষম এবং আল্লাহর প্রতি কাঙ্ক্ষিত সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না। তখন তাকে মাজুর ধরা হবে। তার প্রতি তখন চরম কঠোরতা প্রদর্শন করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীকে এর আলোকে বিবেচনা করতে হবে–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (الحديث)

"তিন ব্যক্তির উপর হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।" (আল হাদীস)। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

অধ্যায়-৬৩

উপকারি বস্তুর প্রসার ও প্রচার করা এবং প্রচলিত রীতি-নীতিকে সুন্দর ও সংশোধন করা প্রসঙ্গে

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে সরাসরি ও ইঙ্গিতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপকারি বিষয়গুলোর জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐগুলোর কারণেই অপরাপর সৃষ্টি জগত হতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তথা অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের প্রাধান্য ঐ দুটোকে ত্যাগ করা ও ঐ দুটোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন তাদের পক্ষে অসম্ভব। এসব বিষয়াবলির অধিকাংশকে বুঝার জন্য বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন। যারা এসব উপকারি বস্তুগুলোর প্রয়োজনীয়তা এবং এগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন। যা সর্বস্তরের মানুষের উপকারে আসবে। হয়ত তারা তা চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে লাভ করবেন অথবা কোনো অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সে তা অর্জন করবে। সে হয়ত মালায়ে আলার উচ্চতর পরিষদের পক্ষ হতে তার নিকট জ্ঞান অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত হবে। আর এটি হলো উক্ত দুটির মধ্যে পরিপূর্ণ ও উভয়ের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। আর প্রচলিত রীতিনীতি ও পদ্ধতি হলো উপকারি বস্তুগুলোর মধ্যে যেমন দেহের মধ্যে কলবের ন্যায় তথা হৃদপিণ্ডের ন্যায়। প্রচলিত রীতিনীতি ও পদ্ধতিগুলো সমাজে অন্যায়ের ও অশুভের প্রসার ঘটায়, এ জাতীয় লোকদের সমাজের প্রধান সরদার নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে, যাদের মাঝে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকে না। সুতরাং এর ফলে মানুষ, পশুত্বমূলক প্রবৃত্তির দাসত্বমূলক এবং শয়তানী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা সমাজে সে অন্যায় ও অশুভ কাজের প্রচলন করে। অধিকাংশ মানুষ তাদের অনুসারী হয়ে যায়। এমনিভাবে অন্যদিক থেকেও ধ্বংসমূলক কাজ প্রসার লাভ করে। (যার আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে অতীত হয়েছে) তখন প্রয়োজন দেখা দেয় এমন একজন শক্তিশালী ব্যক্তির যিনি কারো কোনো সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন এবং অদৃশ্য জগত হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হন যিনি সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণে ব্রতী হবেন যাতে তিনি তাদের প্রচলিত রীতিনীতি ও পদ্ধতিকে সত্যের দিকে– হকের দিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। তিনি সেজন্য এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করবেন যে পদ্ধতি শুধুমাত্র রুহুল কুদুস অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্তরা লাভ করে থাকেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো যেসব বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে যদি আপনি তা উত্তমরূপে বুঝে থাকেন ও হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন তাহলে জেনে নিন যে, নবীদের প্রেরণ তথা আবির্ভাব-যদিও বাস্তবিকপক্ষে প্রথমত বান্দাদের আল্লাহর ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষার জন্য হয়ে থাকে তথাপি তার সাথে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত রীতি-নীতি পদ্ধতিগুলোকে মূল উৎপাটনের বিষয়টি তার মধ্যে ধর্তব্য থাকে এবং সেখানে উপকারি ও কল্যাণময় জিনিসগুলোর প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ হচ্ছে– بعثت لمحق المعازف

"আমি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।" এবং তাঁর এরশাদ ঃ بعثت لاتمم مكارم الاخلاق "আমি উত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

জেনে নিন যে, আনন্দের সাথে জীবন যাপন করার পথ অবলম্বন করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার রীতি নিয়মকে অবজ্ঞা ও নিস্ফল করা আল্লাহ তায়ালার মর্জি নয়। আর কোনো নবীও তাঁর কোনো উম্মতকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেননি এসংক্রান্ত বিষয়ে। যারা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে সংসার ত্যাগ করে অর্থাৎ সন্ন্যাসী হয়েছে বিষয়টি এমন নয়। যারা ভালোমন্দ কাজে লোকদের সাথে মেলামেশা করা পরিত্যাগ করেছে যারা বন্য জন্তুদের ন্যায় বসবাস করে। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ইচ্ছা করেছিল তার সে ইচ্ছাকে গ্রহণ করেননি। অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, রদ করেছেন এবং তিনি বলেছেন–

مَابُعِثْتُ بِالرُّهْبَانِيَّةِ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْمِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ۔

"আমি সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য গ্রহণ করার জন্য প্রেরিত হইনি। আমি সহজতর মিল্লাতে হানিফীর সাথে প্রেরিত হয়েছি।" অথচ আম্বিয়া (আঃ)দেরকে উত্তম কাজগুলোকে আরো সুষমামণ্ডিত ও সুন্দর করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যেন উত্তম জীবনোপকরণ গ্রহণ করতে গিয়ে পানোন্মত্ত, ও মাতাল লোকদের পর্যায়ে উপনীত না হয়। যেমন অবস্থা প্রাচ্যের রাজা বাদশাহদের। আর না তা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানরত লোকদের মতো অবস্থানে পৌছায়, যারা বন্য জানোয়ার সাথে মিলিত হয়।

এক্ষেত্রে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় এক দৃষ্টিভঙ্গি হলো খোশহাল-ভালো অবস্থা-ভালো। তাতে মন ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাতে চরিত্র সুন্দর ও কোমল হয়, তার দ্বারা মানুষের সে মর্যাদা তার জাতির অপরাপরদের থেকে পৃথক শানে প্রকাশিত হয়। বন্যতা ও দুর্বলতা এবং এ জাতীয় কথাবার্তা বদ তদবীরের দ্বারা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো ঃ খোশহাল ভালো ও উত্তম অবস্থা খারাপ ও নিন্দনীয়। তার কারণে লোকদের সাথে বিরাট ধরনের ঝগড়া সৃষ্টি হয়, লোকদের সাথে মিলে ধান্দা করতে হয়, এজন্য দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আল্লাহর দিক হতে বিমুখতা এবং আখেরাতের কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টাকে ত্যাগ করা হয়।

এ কারণে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম। জীবন যাপনের ভালো উপকরণ অবশিষ্ট থাকার সাথে সাথে আল্লাহর যিকির ও শিষ্টাচারকে মিলিয়ে নিতে হবে এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগকে গনিমত মনে করতে হবে।

উত্তম জীবনোপকরণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আম্বিয়াগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যা গ্রহণ করেছেন, তাহলো জাতির নিকট যা বর্তমান রয়েছে তার প্রতি লক্ষ করতে হবে। অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া, দালানকোঠা তৈরির ক্ষেত্রে গৃহীত পন্থা এবং আনন্দ উল্লাসের অবস্থাসমূহ, বিবাহ-শাদীর পদ্ধতি, স্বামী স্ত্রীর চরিত্র, ক্রয়-বিক্রয়ের পন্থা ও পদ্ধতি, পাপাচার হতে বেঁচে থাকার পন্থা এবং বিচার ব্যবস্থা ও এ জাতীয় অপরাপর বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এর মধ্যে যা কিছু সাধারণ জনগণের জন্য কল্যাণকর এবং জমহুরের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে তাকে ঠিক রাখা হবে। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা অর্থহীন ও তা হতে বিমুখ হওয়া ঠিক নয় বরং তখন এমতাবস্থায় কর্তব্য হয় যে, লোকদেরকে ঐ বিষয়গুলোর প্রতি উৎসাহিত করা হবে এবং এক্ষেত্রে লোকদের মতের প্রাধান্য দেয়া হবে এবং এসবের মধ্যে যেসব কল্যাণ ও উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে তা বুঝাতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রচলিত রীতিনীতিগুলো সাধারণের জন্য উপকারি ও কল্যাণকর না হয় তাহলে তখন তাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করা বা তাকে নির্মূল ও উৎখাত করা অসম্ভব হয়। একারণে একটি অপরটির জন্য ক্ষতির কারণ হয় বা দুনিয়াদারীর দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ হয় বা, নেক কাজের থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ হয় বা এমন পর্যায়ের হয় যে কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের

কল্যাণ বিফল ও নিস্ফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনো এমন সব বিষয় সেখানে কার্যকর করা উচিত হবে না যা সেখানকার জনতার পূর্বাভ্যাসের বিপরীতমুখী হবে। বরং তখন সেখানে এমন সব বিষয় প্রচলন করতে হবে যেগুলো প্রচলিত বস্তুসমূহের ন্যায় হবে বা ঐসব বস্তুর সমপর্যায়ের হবে, যেগুলো সেখানকার ভালো ও উত্তম ব্যক্তিদের নিকট প্রচলিত রয়েছে। যার প্রতি লোকদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো ঐ প্রচলিত কাজগুলোর স্থানে এমন বিষয়ের প্রচলন করতে হবে যা সেখানকার লোকদের জন্য উপযোগী হবে। এবং তাদের জ্ঞান তা এভাবে গ্রহণ করবে যে, এগুলো তাদের জন্য কল্যাণকর ও তাদের জন্য উপযোগী। আর যেহেতু প্রত্যেক জনগোষ্ঠির নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, সেহেতু নবীদের শরীয়তের বিধানের মধ্যেও বিভিন্নতা হয়েছে। ইলমে শরীয়তের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সকলেই এ বিষয় সম্যক অবগত যে, শরীয়ত বিবাহ, তালাক, পরস্পর লেনদেন-কায়কারবার সুন্দর্য ও পোশাকাদি, বিচার ও শরীয়তের হদ কার্যকরী করা এবং গণিমতের সম্পদ ভাগাভাগির ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় উপস্থাপন করেনি যা লোকের পূর্ব হতে অবগত ছিল না এবং এসব বিষয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের মতোবিরোধ ছিল যখন তাদেরকে এসব বিষয়ে হুকুম করা হয়।

হাঁ, তবে নবীগণ এটা করেছেন যে, যা বক্র ছিল তাকে সোজা করেছেন আর যা রুগ্ন ও দুর্বল ছিল তা ঠিক যথার্থ ও উপযুক্ত করে দিয়েছেন। যেমন তাদের মধ্যে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল শরীয়ত তা নিষেধ করে দিয়েছে। লোকেরা ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করত পরে তা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতো, ফল বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে ও ফলের রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করত। এতে তাদের মধ্যে বিপদ দেখা দিত। এজন্য এজাতীয় বিক্রয় হতে তাদের বারণ করা হয়েছে। আবদুল মোত্তালেবের সময় হত্যার দিয়ত ছিল দশটি উট। আব্দুল মোত্তালেব যখন দেখলেন যে, লোকেরা এ ধরনের হালকা বা সামান্য দিয়তের কারণে হত্যা করা হতে বিরত থাকছে না, তখন তিনি তা বাড়িয়ে একশত উট করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হত্যার দিয়ত তাই ঠিক রাখলেন– বহাল রাখলেন।

কাসামা (ঐ কসম যা যেখানে হত্যা সংঘটিত হয়েছে সে স্থানের পঞ্চাশ ব্যক্তিকে দেয়া হতো।) এর বিধান সর্ব প্রথম চালু করা হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালেবের নির্দেশানুযায়ী। ইসলাম সে বিধান

অনুসন্ধানের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছে। ইসলামের পূর্বে লুটের মালের চার ভাগের এক ভাগ কাওমের সর্দারের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য অর্থাৎ কাওমের জন্য নির্ধারিত করেছেন। কুব্বাজ ও তার পুত্র নুশিরাঁওয়া উভয়ে লোকদের উপর উশর ও খেরাজ নির্ধারণ করেছিল। ইসলামী শরীয়ত তা বহাল রেখেছে। বনী ইসরাইল জিনাকারীদেরকে ছঙ্গেচার (পাথর মেরে হত্যা) করত, চোরের হাত কেটে দিত, হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীকে হত্যা করা হতো। পবিত্র কুরআনেও সে একই বিধান দেয়া হয়েছে। এরূপ অনেক উদাহরণ রয়েছে যা জ্ঞানীদের নিকট ও গবেষকদের নিকট অস্পষ্ট নয়।

আপনি যদি বুদ্ধিমান হন এবং শরীয়তের বিধানগুলোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে থাকেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে, নবীগণ ইবাদতের মধ্যে এমন কোনো ইবাদত নিয়ে আবির্ভূত হননি যে ইবাদত তাদের মধ্যে ছিল না অথবা যার কোনো নজির তাদের নিকট ছিল না। নবীগণ জাহেলিয়াতের বিকৃতিগুলো দূর করেছেন। যেসব ইবাদতের সময় নির্ধারিত ছিল না এবং যার কোনো নীতি নিয়ম ছিল না এবং যেসব ইবাদত তারা ভুলে গিয়েছিল তারা সেসব ইবাদতের সময় নির্ধারণ, তাকে নিয়মিতকরণ ও যা তাকে স্মরণ করিয়ে তার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা তারা করেছেন।

আরো স্মরণে রাখুন যে, অনারব ও রোমবাসীরা যখন যুগ যুগ ধরে একে অপরের বাদশাহীর উত্তরাধিকারী হতে থাকল এবং দুনিয়ার শান শওকতে ডুবে গিয়ে আখেরাতকে ভুলে বসল এবং শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়ে পড়ল, তখন তারা জীবিকা নির্বাহের সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে গেল, জীবন যাপনের সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে আভিজাত্য ও গর্ব করতে শুরু করল। দূর দূরান্ত হতে, ভিনদেশ হতে তাদের নিকট পণ্ডিতদের আবির্ভাব হতো এবং তারা তাদের জীবনযাপনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো প্রকাশ করতে থাকত। আর তারা ওদেরকে খুব আপনজন মনে করত। প্রত্যেক নতুন আগমনকারী কোনো কোনো নতুন বিষয় যোগ করত। বাদশাহগণ তাদের জীবিকার সাথে তা যোগ করে পরস্পরের মধ্যে গর্ব ও গৌরব এবং আভিজাত্য প্রকাশ করতে থাকত। বর্ণিত আছে যে, তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে যিনি লক্ষ দেরহামের কম দামি কোমরবন্দ ও তাজ পরিধান করত, যার নিকট আলীশান তথা গগনচুম্বি দালানকোঠা না থাকত, ফোয়ারা ও বিশাল হাউজ হাম্মাম, বাগান বাড়ি, মূল্যবান

খাট, সুন্দর দাস এবং খাওয়া উন্নত মানের না হতো এবং পোশাক ও বাহন জাঁকজমকপূর্ণ চটকদার না হতো তাকে দোষের ও লজ্জাজনক মনে করা হতো। এসবের ফিরিস্তি অতি দীর্ঘ। আমাদের বর্তমান বাদশাহদের অবস্থা দেখলে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ে না।

ক্রমে এসব বিষয় তাদের জীবন জীবিকার মধ্যে এমন ভাবে মূলনীতি হিসেবে প্রবেশ করল এবং এমন অংশ হয়ে গেল যাকে তা হতে বাদ দিতে হলে তাদের অন্তরকে ভেঙে টুকরা টুকরা করা ব্যতীত আর কোনো পথই নেই। তাদের এ বিলাস বহুল জীবন যাপনের কারণে এমন সব চিকিৎসার অযোগ্য রোগ রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করল এবং এক মহা আপদ চেপে বসল। যা হতে না কোনো শহরবাসী রক্ষা পেল আর না গ্রামবাসী আর না রক্ষা পেল কোনো ধনী আর না কোনো দরিদ্র। এ বিপদ সকলকেই গ্রাস করে নিল। সবাইর ঘাড়ে চেপে বসল। লোকেরা এসব দুশ্চিন্তায় এমনভাবে ডুবে গেল যা হতে বাঁচার কোনো পথ ও পন্থা উন্মুক্ত থাকল না।

জীবন জীবিকা নির্বাহের এ সকল বস্তু অনেক সম্পদ খরচ করা ব্যতীত লাভ করা যেত না এগুলো মোফত পাওয়া যেত না। তা লাভ করা হতো কৃষকদের, ব্যবসায়ীদের ও অন্যান্য লোকদের উপর বিভিন্ন ধরনের করারোপের মাধ্যমে ও তাদের সাথে কঠোর আচরণের তথা নির্মম আচরণের মাধ্যমে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, লোকেরা যখন এসব কর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত তখন তাদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে যেত এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হতো। আর যদি তারা তা মেনে নিত তাহলে তাদেরকে গাধা এবং বলদের স্থান-মর্যাদা দেয়া হতো। যেগুলোকে পানি উত্তোলন, ঘানি টানা এবং ফসল কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়। যাদের এজন্য পালন করা হয় যে, প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য নেয়া হবে, তাদেরকে এক মুহূর্তও বিশ্রাম দেয়া হয় না। লোকদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে, তারা আখেরাত তথা পরকালীন জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ লাভের জন্য মাথা উঠাতেই পারত না। তাদের মাঝে সে শক্তিই অবিশষ্ট ছিল না। কখনো এমন অবস্থা হতো যে, কোনো বিশাল এলাকায় দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা করার একজন ব্যক্তিও পাওয়া যেত না।

এসব বিলাস বহুল জীবন সামগ্রী তখনই পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা সম্ভব যখন কিছু সংখ্যক লোক তাকে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে বেছে নেয়। তারা বাদশাহদের জন্য এবং সর্দারদের জন্য মজাদার খাদ্য তৈরি করে। তাদের জন্য

পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করে। বিশাল বিশাল ভবন তৈরি করে এবং আয়েশী জীবনের জন্য এছাড়া অন্যসব কিছু সহজলভ্য করে। লোকদের দিবা রাত্র এ কাজেই ব্যস্ত সমস্ত থাকতে হয় এবং তারা জীবিকার ঐসব মূল বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে যেগুলোর উপর রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভরশীল। সাধারণ মানুষ যারা ঐসব বাদশাহ ও সর্দারদের চারদিকে ও আশপাশে ঘুরত তারা নিশ্চিন্তে সর্দারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত। কারণ তা না করলে তারা বাদশাহর দরবারে কোনো স্থান পেত না আর না সেখানে তাদের কোনো মূল্যায়ন করা হতো।

এমনিভাবে সাধারণ জনগণ খলিফাদের উপর বোঝা হয়ে পড়ল। কখনো তারা এ বলে বাদশাহর নিকট ভিক্ষা চাইত যে, আমরা রাষ্ট্রের পক্ষের সৈনিক এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। তারা শুধুমাত্র নিজেদের চেয়ার দখল করে রয়েছে। রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন তারা পূর্ণ করে না। কোনো প্রয়োজন পূর্ণ করার তাদের কোনো ইচ্ছাও নেই, শুধুমাত্র আঙুল হেলানোর মাধ্যমে চলাই তাদের কাজ ছিল। কাজ হতো। তারা শুধু দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকত, দায়িত্বের চেয়ার আঁকড়িয়ে থাকত রাষ্ট্রের কোনো খেদমত ও দায়িত্ব তারা পালন করত না। শুধুমাত্র পূর্বসূরিদের আদর্শ অনুসরণ করাই হতো তাদের কাজ। আবার কখনো এ বলে বাদশাহর নিকট ভিক্ষা চাইত যে, তারা রাজদরবারের কবি, রাজ কবি তাদেরকে মুক্ত হস্তে সহযোগিতা করা রাজাদের চিরাচরিত নিয়ম চলে আসছে। আবার কেউ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ভিক্ষা দান দক্ষিণা কামনা করত যে, তিনি জাহেদ– সংসার ত্যাগী ও দরবেশ ও ফকির। খলিফার পক্ষ হতে তাদের সংবাদ না নেয়া খারাপ মনে করা হতো। এভাবে একদল অপর দলকে কোণঠাসা করত অর্থাৎ একদল ভিক্ষা নিয়ে বের না হতে অপর দল উপস্থিত হতো।

লোকদের রুজি রোজগার বাদশাহ এবং আমির ওমারাহদের সাহচর্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা, কথোপকথন করা তাদের জন্য মিষ্টি মিষ্টি কথামালা তৈরি করা এবং তাদের তোষামুদি, চাটুকারী, চাপলুসী করাই মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়। আর এটা একটা পরিপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়ে থাকল। লোকেরা তা রীতিমত শিখত এবং সারাক্ষণ এ চিন্তায় ডুবে থাকত, বাদশাহ ও আমীর ওমারাদের সাথে আড্ডা দিয়ে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করত। যখন এ অবস্থা লোকদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল তখন খারাপ অভ্যাস লোকদের মধ্যে প্রসার লাভ করল, আর তারা ভালো অভ্যাস হতে

বিমুখ হয়ে গেল।

আপনি যদি এ রোগের হাকীকত সম্পর্কে অবগত হতে চান তাহলে ঐ সব লোকদের প্রতি লক্ষ্য করুন যাদের মধ্যে বাদশাহী নেই। আর না তারা খাওয়া, পান করা এবং লেবাস ও পোশাকের আনন্দে ডুবে রয়েছে। তাদের সকলে স্বাধীন। তার নিজের ব্যবস্থা নিজের হাতে করে। সে ভারি ধরনের বোঝায় ডুবে নেই যা তার কোমর ভেঙে দেবে। সে দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য কাজ করার সময় বের করতে সক্ষম। আপনি দ্বিতীয়বার ঐ লোকদের চিত্র সামনে উন্মোচিত করুন যাদের নিকট শাসন ক্ষমতা তথা বাদশাহী ছিল। বাদশাহ ব্যতীত অন্যান্য নেতার সৃষ্টি হয়েছে যারা সময়ের অপচয় করছে আর তা তাদের উপর মন্দ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। দেখতে পাবেন এ দ্বিতীয় অবস্থাটি প্রথম অবস্থা তথা প্রথম চিত্র হতে কতই না ভিন্ন ধরনের।

যখন বাদশাহ ও আমীর ওমারাদের বিলাস বহুল জীবন যাপনের এ বিপদ ভারী হয়ে গেল এবং এ রোগ কঠিন রূপ ধারণ করল তখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নিকটতম মোকাররাব ফিরিশতারা তাদের প্রতি নারাজ তথা অসন্তুষ্ট হলেন। আল্লাহর মর্জি এমন হলো যে, এ রোগের চিকিৎসা এমনভাবে করবেন যাতে এ রোগের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা নবী উম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করলেন যিনি উম্মি হওয়ার ফলে অনারবদের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হননি। ইরান এবং রোমের সাথে যার কোনো খোলামেলা সম্পর্ক ছিল না, যিনি তাদের কোনো রীতি-নিয়ম ও পদ্ধতি কখনো আপন করে নেননি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মিজান– দাঁড়িপাল্লা তুলাদণ্ড করেছেন, যার দ্বারা চেনা যায়, পার্থক্য করা যায় নেক ছিরত– উত্তম চরিত্র যা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং বদ ছিরত যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় এবং তার পবিত্র জবানে অনারবদের খারাপ অভ্যাসগুলোর ক্ষতিকর দিকের আলোচনা করলেন এবং পার্থিব তথা দুনিয়ার জীবনে ডুবে যাওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো, আর তার অন্তরে জাগিয়ে দিলেন যে তিনি ঐসব বিশাল বিশাল বস্তুগুলো হারাম ঘোষণা করবেন যেগুলোতে অনারবরা অভ্যস্ত ছিল আর যা নিয়ে তারা পরস্পর গর্ব ও গৌরব প্রকাশ করত। যেমন রেশমি, কাছি ও আরগুয়ানী কাপড় পরিধান করা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন ব্যবহার করা, টুকরা না করা স্বর্ণের গয়না পরিধান করা, ছবি খচিত কাপড় পরিধান করা এবং ঘরবাড়ি সাজানো গুছানো এবং কিছু হারাম ঘোষণা করেন যাতে জীবনোপকরণের উঁচুস্তরের বস্তুগুলো এবং আনন্দের চরম

উৎকর্ষতার বিমোহিত এবং দুনিয়ার চাকচিক্যে ও জাঁকজমকে মদমত্ত হওয়ার সীমায় পৌছে না যায়। আল্লাহর ফয়সালা হলো তার শাসন দ্বারা অনারবদের শাসন খতম করবেন তার সর্দারী দ্বারা ওদের সর্দারী খতম করবেন এবং এ ফয়সালাও করলেন যে, যখন কিসরা খতম হয়ে যাবে তারপর আর যেন কোনো কিসরা না থাকে। আর যখন কায়সার খতম হয়ে যাবে তারপর যেন কোনো কায়সার না থাকে।

জেনে রাখুন যে, জাহেলী যুগে এমন সব ঝগড়া ও তর্ক হতো যার দ্বারা লোকদের জীবন সংকীর্ণ অবস্থায় আপতিত হতো-নিপতিত হতো। শুধুমাত্র এ ভুল পন্থার মূল উৎপাটন ও তা বাতিল করা ব্যতীত তা বন্ধ করা খুবই কঠিন হতো। যেমন নিহতের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া। আরবে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করত তাহলে নিহত ব্যক্তির অলী (অভিভাবক) হত্যাকারীর ভাই অথবা ছেলেকে হত্যা করত। পরে দ্বিতীয় বংশের লোকেরা প্রথম বংশের লোকদের প্রধানদের মধ্য হতে কোনো একজনকে হত্যা করে ফেলত। এমনিভাবে হত্যার পরম্পরা চলতেই থাকত। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথ চিরতরে বন্ধ করে দিলেন এবং তিনি এরশাদ করলেন ঃ

كُلُّ دَمٍ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمَىَّ هٰذَا وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُ دَمُ رَبِيْعَةَ -

"জাহেলিয়াতের সকল রক্তপণ আমার পায়ের নিচে (অর্থাৎ আমি সেগুলোকে পদদলিত করলাম।) আমি প্রথমে যে রক্তের ঋণ রহিত করছি তা রবিয়ার রক্তের ঋণ।"

মিরাছ তথা উত্তরাধিকারের বিষয় ঃ জাহেলী যুগে জাহেলী সর্দারগণ মিরাছ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রায় প্রদান করত। এক্ষেত্রে লুটতরাজ ও ঘুষের থেকে বিরত থাকত না। এভাবে এক যুগ চলে যেত পরে আরেক যুগ আসত। পরে এ দলিলের ভিত্তিতে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এতদসংক্রান্ত ঝগড়া বিবাদ খতম করে দিলেন- নিঃশেষ করে দিলেন। তিনি এরশাদ করলেন-

كُلُّ شَيْءٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ يُقَسَّمُ عَلٰى حُكْمِ الْقُرْاٰنِ وَكُلُّ مَا

يُقَسَّمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْحَازَهُ اِنْسَانٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَوَّجِهُ مِنَ

الْوُجُوْهِ فَهُوَ عَلٰى مَاكَانَ لَايَنْقُضُ -

ইসলাম যে বস্তুকে যেভাবে পেয়েছে তা পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী ভাগ করা হবে। যে বস্তু জাহেলী যুগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, অথবা কোনো না কোনো পন্থায় কেউ কোনো বস্তুর মালিক হয়েছে সেটি সেভাবেই থাকবে। সে পন্থা ভেঙ্গে ফেলা হবে না।

সুদ ঃ জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করত, তাতে কিছু বাড়তি শর্ত জুড়ে দিত। পরে ঋণ আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করত। সে ব্যক্তি তা শোধ করতে অপারগ হলে সুদ আসল যোগ করে তাকে মূলধন ধরে সুদ বাড়িয়ে দেয়া হতো। এমনিভাবে সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকত। এমনিভাবে সুদের অংক বিশাল আকার ধারণ করত। তিনি এ চক্রবৃদ্ধি সুদ বন্ধ করে দিলেন- এবং হুকুম দিলেন যাতে এভাবে মূলধন বৃদ্ধি করা না হয় এবং মূলধন ফেরত দেয়ার বিধান করে দিলেন। বললেন- لَا يَظْلِمُوْنَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ কারো প্রতি যেন কোনো ধরনের যুলুম না হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব না হলে এ জাতীয় আরো অনেক সমস্যারই সমাধান হতো না।

জেনে রাখুন যে, কখনো কখনো ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা খতম তথা নির্মূল করার জন্য কোনো পদ্ধতির প্রচলন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন পানি পান করা বা এ জাতীয় অন্যান্য কাজে ডানদিক হতে শুরু করা। কখনো দেখা যায় মানুষ একগুয়েমী করে ভদ্রভাবে আচরণ করতে চায় না। যাতে তার সাথের লোকটির দিক থেকে আরম্ভ করা যায়। এরূপ না করা হলে তাদের মধ্যকার তর্ক ও ঝগড়া শেষ করা যাবে না এবং যেমন ঘরের মালিকের ইমামতি করা। বাহনে আরোহণের সময় বাহনের মালিককে প্রাধান্য দেয়া তার বন্ধুর উপর। এ জাতীয় অপরাপর বিষয়েও এদিকে দৃষ্টি রাখা। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।

অধ্যায়-৬৪

যেসব বিধান একটি অপরটিকে টেনে আনে তার বিধান

মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -

"আপনার পূর্বে আমি শুধুমাত্র পুরুষদের নবী করে প্রেরণ করেছি। যাদের নিকট আমি অহী প্রেরণ করতাম। তোমরা যদি তা না জান তাহলে আহলে জিকিরদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ। পরিষ্কার প্রমাণ ও কিতাবসহ আমি আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আপনি লোকদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারেন। যাতে তারা তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারে।

জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন এ জন্য যেন তিনি লোকদের নিকট ঐসব বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যেগুলো আল্লাহ্ তায়ালা তার নিকট অহী করেছেন। ইবাদতের মধ্য হতে, যাতে লোকেরা তার প্রতি আমল করতে পারে। গুনাহ্ তথা পাপের কাজ যাতে লোকেরা তা হতে বিরত থাকতে পারে। জীবন যাপনের ঐসব উত্তম বস্তুসমূহ যা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। যাতে এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে মানুষ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনার মধ্যে রয়েছে যে, তিনি আয়াতের মাঝে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বর্ণনা করবেন। তাছাড়া এর মধ্যে ঐ কথাও রয়েছে যে, অহী যে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছে তাও তিনি বর্ণনা

করবেন এবং তার ন্যায় অন্যান্য বিষয়ও বর্ণনা করবেন। এ বিষয়ে অনেকগুলো মূলনীতি রয়েছে যা দ্বারা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক বিশাল সংখ্যক হাদীসের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হব। এখানে আমরা সেসব মূলনীতিসমূহের মধ্যে বড় বড় মূলনীতিগুলোর প্রতি আলোকপাত করব।

সে সব মূলনীতির মধ্যে রয়েছে– (১) আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ সৃষ্টি জগতে যখন একটি নিয়ম প্রচলিত রেখেছেন আর তা হলো কারণের মাধ্যমে কার্য সম্পাদিত হওয়া। অর্থাৎ কারণ কার্য পর্যন্ত পৌছে দেয়, যাতে আল্লাহর সর্বোচ্চ হিকমত ও সর্বোচ্চ রহমতে যা মাছলেহাত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা পরিপূর্ণ ভাবে সংঘটিত ও কার্যকরী হয়। আর এ কারণে কার্য সংঘটিত হওয়ার নীতির দাবি হলো তার সৃষ্টির মধ্যে যেন কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন করা না হয়। তার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা খারাপ ও নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকর কাজ। আর এরূপ প্রচেষ্টা যারা করে তাদের প্রতি মালায়ে আলা তথা উচ্চতর পরিষদের মহান আল্লাহর ঘৃণা অভিশাপ, ভর্ৎসনা বর্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা যখন একটি রীতি ও পদ্ধতিতে মানুষ সৃষ্টির ধারা প্রচলিত রেখেছেন অর্থাৎ মানুষ হযরত আদম (আঃ)-এর অনুসৃত পন্থার বিপরীতে (Direct) জমিন হতে কীটের মতো সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তায়ালার হেকমতের দাবিও এ ছিল যে, পৃথিবীর বুকে মানুষ জাতির ধারা অবশিষ্ট থাকুক, দুনিয়ায় তাদের বংশধারা বৃদ্ধি পাক ও তা প্রসার লাভ করুক। তখন আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয়ার, বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করে তাদের ধন্য করেছেন। এবং তাদেরকে সন্তান চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে কামভাব সৃষ্টি করেছেন। যাতে আল্লাহ এর মাধ্যমে তার সে কাজ পূর্ণ করতে পারেন যা তার হিকমতে বালেগা তথা সর্বোচ্চ হিকমতের একান্ত দাবি ছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন এ রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং এর হাকীত তাঁর নিকট আল্লাহ তায়ালা প্রকাশিত করে দিলেন, তখন তিনি ঐ পথ রুদ্ধ করা নিষেধ করলেন এবং ঐ যোগ্যতাকে নিস্ফল করা হতে বারণ করলেন যে পদ্ধতি অধিক সন্তান উৎপাদনের কারণ হয়। অথবা তাকে বাজে পথে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং খাশি হওয়া ও লাওয়াতাত (পুরুষে পুরুষে যৌন সংগম) করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আজল (যৌন মিলনের পর নারীর যোনিপথে বীর্য না দিয়ে বাহিরে ফেলাকে অপছন্দ করলেন।)

জেনে রাখুন যে ব্যক্তির সৃষ্টি যখন সুস্থ স্বাবলীল ও সুন্দর হয় তখন তার দেহ সোজা হয়। তার দেহের চামড়া পশম মুক্ত হয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য গুণ তার মধ্যে প্রকাশ পায়। এবং এজাতীয় হওয়া তার সৃষ্টির দাবি। মানব জাতি সৃষ্টির দাবি এবং ব্যক্তির মাঝে তা প্রকাশ পায়। মাকামে আলা তথা আল্লাহর নিকট এভাবে সকল জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকার দাবি উত্থিত হয়। এবং প্রত্যেক জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে টিকে থাকার ও তা প্রকাশ এবং বিস্তার লাভ করা তার দাবি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করার আদেশ প্রদান করার পর এ বলে তা প্রত্যাহার করেন যে, এটি একটি প্রজাতি একে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় নয়। اِنَّهَا اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ। ("এটি জাতি আল্লাহর সৃষ্ট জাতিগুলোর মধ্যে") এমনিভাবে কোনো সৃষ্ট প্রজাতিকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত করে দেয়া পছন্দনীয় কাজ নয়। এমনিভাবে এর দাবি হলো এ নিয়মকে ভাঙার চেষ্টা না করা এবং একে খণ্ডন ও এতে রদবদল সাধনের প্রচেষ্টা না করা। এমন কিছু না করা যা সাধারণের স্বার্থের বিপরীত ও সেজন্য ক্ষতিকর। এর উপর ভিত্তি করে দেহের মধ্যে এমন কোনো কাজ করা যা জাতির জন্য ক্ষতিকর তা কাম্য নয়। যেমন খাসি হওয়া, নারীদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁতের ফাঁক বৃদ্ধি করা এবং চেহারার পশম উঠিয়ে ফেলা বা এ জাতীয় অন্য কিছু করা ইত্যাদি। বাকি রইল সুরমা লাগানো, চিরুনী ব্যবহার করা। এগুলো তো সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এগুলো কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ নয়। এগুলো শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে ও নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণে পুরুষদের তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ নয়। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে সুন্দর ও সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য কোনো শরীয়ত নির্ধারিত করেন এবং ফিরিশতাদের মধ্যেও এরকম শরীয়তের দাবি উত্থাপিত ও কাম্য হয় তখন তা জমিনে ও জাতির জন্য কাঙ্ক্ষিত নিয়মে পরিণত হয়। এ কারণে মালায়ে আলা– উচ্চতর পরিষদ তথা আল্লাহর নিকট শরীয়তের এসব বিধানকে অকার্যকর করার প্রচেষ্টা চালানো অপছন্দনীয়, কঠোরভাবে নিন্দনীয়, আর তা আল্লাহর মর্জিরও বিপরীত এবং তার রোষানলে পতিত হওয়ার কারণ। এমনিভাবে আরব অনারব দূর ও নিকট নির্বিশেষে সকলের নিকট জীবন জীবিকার যেসব উচ্চতর উপকরণ ঐকমত্যভাবে গ্রহণীয় ও

পছন্দনীয় এগুলোও প্রকৃতিগতভাবেই সবাইর নিকট গ্রহণীয়। এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সঠিক নয়।

যখন এ বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হলো যে, বাদীকে আদালতে তথা বিচারালয়ে সাক্ষী দিতে হবে তখন তার দাবি হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা শপথ করা কবিরা গুনাহ। এটা পরিহার করতে হবে। এটা আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাদের নিকট সম্পূর্ণভাবে নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়।

ঐ মূল নীতিগুলোর মধ্যে ২নং মূলনীতি হলো ঃ যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর নিকট শরীয়তের কোনো বিধান সম্পর্কে অহী প্রেরণ করেন এবং তার কারণ ও এর পেছনে অন্তর্নিহিত হিকমত তাকে অবহিত করেন তখন তাঁর জন্য এটি বৈধ যে, তিনি তার জন্য কারণ ও সীমা নির্ধারণ করবেন। এটা হলো নবীর কেয়াছের সীমা, আর তাঁর উম্মতের কেয়াছের সীমা হলো তারা তাঁর বর্ণিত সীমা অবগত হবেন এবং যেখানে যেখানে সে কারণ পাওয়া যাবে সেখানে তা প্রয়োগ করবেন। তার উপমা হলো যেসব জিকির-আজকারগুলো, দোয়াগুলো, যেগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল সন্ধ্যা ও শোয়ার সময় আমল করতে আদেশ করেছেন। তিনি যখন নামাযের সময় নির্ধারণের হেকমত জানতে পারলেন তখন তিনি সকাল সন্ধ্যা ও শোয়ার সময় জিকিরের বিষয়টি ইজতিহাদ করলেন ও তা করার বিধান দিলেন।

ঐ মূলনীতিগুলোর ৩নং মূলনীতি হলো ঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো আয়াতের سياق তথা পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে পারেন। তা বুঝা নবী ব্যতীত অপর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার বিষয় বুঝা ও বিভিন্ন দিক নির্ধারণ কঠিন হওয়ার কারণে। তখন নবীর অধিকার ও কর্তব্য হলো তার বুঝ অনুযায়ী সে আয়াতের হুকুম ও বিধান জারি করা। যেমন−

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

"সাফা ও মারওয়া নামের পাহাড় দুটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

এ আয়াত হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছিলেন সাফা পাহাড়ের উল্লেখ প্রথমে শুধুমাত্র কথার ছলে বলা হয়নি। তাতে শরীয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সায়ীর বিধান যেভাবে আরম্ভ করতে বলেছে সেভাবে করতে হবে। অর্থাৎ সাফা হতে সায়ী শুরু করতে

হবে। এদিকে দৃষ্টি রেখে সাফাকে প্রথমে নেয়া হয়েছে। যেমন কখনো কখনো প্রশ্নের ধারণানুযায়ী আগ পিছ করা হয় অর্থাৎ প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রশ্ন যে ধারাবাহিকতার হয়, উত্তরও সে ধারাবাহিকতায় দেয়া হয়। কোনো শব্দকে প্রথমে নেয়ার অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। তিনি বলেছেন- ابدأ وابما بدا الله به "আল্লাহ তায়ালা যেখান থেকে শুরু করেছেন তোমরাও সেখান থেকে শুরু কর।" যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-

لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ ـ

"তোমরা সূর্যকেও সিজদা করো না, চাঁদকেও সিজদা করো না, বরং তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ : لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ـ

"যখন তারকারাশি ডুবে গেল তখন তিনি বললেন, আমি ডুবে যাওয়া সত্তাদের ভালোবাসি না।"

উপরোক্ত দুটি আয়াত হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছেন যে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الاية ـ

"পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকই আল্লাহর জন্য।"

এ আয়াত হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছেন যে, নামাযের মধ্যে কেবলামুখী হওয়া এমন একটি ফরজ যা শুধুমাত্র ওজরের সময় বাদ দেয়া যেতে পারে। এ থেকে অন্ধকার রাত্রে কেউ ভুলে কেবলা বাদ দিয়ে অন্যদিকে মুখ করে নামায আদায় করলে তা ঠিক হবে এ মাসয়ালা বের করা হয়েছে। আবার শহর হতে বেরিয়ে সফরে যাওয়ার সময় বাহন যেদিকেই চলুক না কেন সেদিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করা জায়েব হওয়ার বিধান দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ মূলনীতি হলো ঃ আল্লাহ্ তায়ালা যখন এমন হুকুম দেন যা সাধারণ লোকদের সাথে তথা সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্কিত হয়। তখন তাঁর এ হুকুমের দাবি হলো যাদেরকে তা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন হুকুম দাতার আনুগত্য করে এ হুকুম পালন করা। যেমন–

(১) যখন কাজি-বিচারকদের হুকুম করা হলো, ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করার। তখন এ হুকুমের দাবি হলো, অন্যায়কারীদের উচিত হলো কাজি-বিচারকের আনুগত্য করা।

(২) যখন যাকাত আদায়কারীদের যাকাত আদায়ের হুকুম দেয়া হলো তখন এ হুকুমের দাবি হলো যাকাত দাতাগণ আনন্দচিত্তে ও খুশি মনে যাকাত দিয়ে দেবে।

(৩) যখন নারীদেরকে পর্দা করার বিধান দেয়া হলো তখন পুরুষদের বলা হলো তারা যেন নারীদের থেকে তাদের চোখকে নিচু করে নেয় অর্থাৎ তারাও যেন নারীদের প্রতি চোখ তুলে না তাকায়।

পঞ্চম মূলনীতি হলো ঃ আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন তখন তার দাবি হলো তার বিপরীত কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করা। অবস্থার প্রেক্ষিতানুযায়ী। আবার তিনি যখন কোনো কাজের হুকুম করেন তখন কর্তব্য হলো তার বিপরীত কাজটি না করা। সুতরাং আল্লাহ জুমার দিনে আযান হওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করে নামাযে যাওয়ার যখন হুকুম দিয়েছেন তখন এ হুকুমের দাবি হলো– আযান শোনার পর শ্রোতা ক্রয় বিক্রয় হতে তো বিরত থাকবেই বরং অন্যান্য কামাই রোজগার হতেও বিরত থাকবে।

৬ষ্ঠ মূলনীতি হলো ঃ আল্লাহ্ তায়ালা যখন পাকাপাকিভাবে কোনো বিষয়ের হুকুম প্রদান করেন তখন তার দাবি হয় সে জন্য উৎসাহিত করার ও সেজন্য সকল মাধ্যম সহজতর করার ও সে জন্য ভূমিকা পালন করা। আবার যখন তিনি পাকাপাকিভাবে কোনো বিষয় হতে বাধা প্রদান করেন তখন তার দাবি হয় তার সকল মাধ্যম বন্ধ করা এবং তাকে এবং তার দিকে ধাবিতকারী সকল কিছুকে নিশ্চিহ্ন করার।

মূর্তি পূজা করা যখন পাপ ছিল, ছবি তৈরি করা ও মূর্তি বানানো সেদিকে উৎসাহিত করত, যেমনটি অতীতের উম্মতদের মাঝে ছিল– তখন প্রয়োজন দেখা দিল মূর্তি তৈরি কারকদের এ কাজ করা হতে বিরত রাখা। আবার যখন মদপান করা পাপ ছিল তখন কর্তব্য ছিল মদ প্রস্তুতকারীদের তা করা হতে বিরত রাখা

এবং যেসব অনুষ্ঠানে মদপান করা হয় সেসব অনুষ্ঠানে যাওয়া হতে বারণ রাখা। যখন গৃহযুদ্ধ, হত্যা, নিষিদ্ধ গুনাহ ছিল তখন উচিত ছিল গণ্ডগোলের সময়, ফিতনার সময় অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ রাখা।

এরূপ করা রাষ্ট্র প্রশাসনের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ যখন রাষ্ট্র প্রধান জানতে পারলেন যে, খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশানো হচ্ছে, পানীয়ের সাথে বিষ মিশানো হচ্ছে, তখন তারা ঔষধ বিক্রেতাদের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করল যে, তারা সে পরিমাণ বিষই বিক্রয় করবে যে পরিমাণ কারো মৃত্যুর কারণ হবে না। আবার যখন রাষ্ট্র শাসকগণ জানতে পারল যে, কিছু লোকের পক্ষ হতে বিদ্রোহ হতে পারে, তখন তারা লোকদেরকে ঘোড়ায় আরোহণ করতে বারণ করল এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ চলতে নিষেধ করল এবং এ বিষয় জনগণ হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করল।

এমনিভাবে ইবাদতের বিষয়টিও, নামায যখন সর্বোত্তম ইবাদত তখন কর্তব্য হলো তা জামাতের সাথে আদায়ের জন্য উৎসাহ দেয়া। কারণ জামাতের সাথে নামায আদায় নামাযকে শক্তভাবে ধারণ করার বিষয়ে সহযোগিতাকারী, তখন আযানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল যাতে সকলে একই সময়ে একই স্থানে একত্রিত হতে পারে। তখন প্রয়োজন দেখা দিল মসজিদ তৈরির এবং তাকে পরিচ্ছন্ন ও সুঘ্রাণ যুক্ত রাখার। আবার যখন মেঘলা দিনে রমজানের চাঁদ দেখে রোজা রাখা চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল হলো তখন শাবান মাসের তারিখগুলোর হিসাব রাখা মোস্তাহাব হলো। এর প্রমাণ রাষ্ট্র প্রশাসনের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়, যখন রাষ্ট্র শাসকগণ দেখতে পায় যে, তীর নিক্ষেপ করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত, তখন তারা হুকুম দিল কামান ও তীর অধিক পরিমাণে উৎপাদন করার এবং তার ব্যবসা করার।

সপ্তম মূলনীতি হলো ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন এবং কোনো বিষয় হতে বাধা দেন তখন আল্লাহ চান যে, যারা তার আনুগত্য করে তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন এবং যারা তার নাফরমানী করে তাদেরকে খাটো করে দেবেন।

(১) যখন পবিত্র কুরআনের প্রচার-প্রসার ও তার তেলাওয়াত করার ক্ষেত্রে নিয়মিত হওয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল তখন প্রয়োজন দেখা দিল তার ব্যাপক প্রচারের। তখন বলা হলো সে ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ ইমামতি করবে না যে অধিক পরিমাণে ভালোভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারে এবং মজলিসে, মাহফিলে, পবিত্র কুরআনের পাঠকদের, ক্বারীদের প্রশংসা করা হলো।

(২) যখন তোহমত দেয়া, কারো নামে অপপ্রচার করা গুনাহের কাজ প্রমাণিত হলো তখন প্রয়োজন দেখা দিল অপপ্রচারকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না একথা বলার।

(৩) পথভ্রষ্ট লোকদের এবং বদকারদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে মেলামেশা করার বিষয়টি ও তাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়ার ব্যাপারটিও এর উপর কেয়াস করা যায়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপকারীদের পুরস্কৃত করা এবং দেয়ালে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা এবং দানের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রথমে দেয়ার বিষয়টি।

অষ্টম মূলনীতি হলো ঃ যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো শ্রেণীর লোকদের কোনো কাজ করার হুকুম প্রদান করেন বা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন তখন এর দাবি হলো সে কাজ উত্তমরূপে সমাধা করা ও আন্তরিকতার সাথে সে কাজে অগ্রগামী হওয়া। অন্তরে তার প্রতি জযবা ও প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করা, এ কারণে কেউ ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করার ইচ্ছা পোষণ করা ও বিবাহে বিশাল ধরনের মোহর ধার্য করে তা আদায়ের নিয়ত না করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ এতে শরীয়তের বিধানের সাথে মজাক -ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়।

নবম মূলনীতি হলো ঃ যখন কোনো কিছুর মধ্যে খারাপ তথা মন্দের সন্দেহ থাকে তখন তার দাবি হলো ঐ বস্তুকে অপছন্দ করা। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

فَلَا يَغْمَسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ ـ

"কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যেন তার হাত পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করে কারণ সে জানেনা ঘুমের ঘোরে তার হাত কোথায় ছিল।"

মোদ্দা কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে ইবাদত ও জীবন জীবিকার উত্তম পন্থা ভালোভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বিভিন্নভাবে তা উম্মতের সামনে উপস্থাপন ও বর্ণনা করেছেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন সেক্টরে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল হুকুম পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় এবং এর পরবর্তী অধ্যায়গুলোর গুরুত্ব

এ অধ্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহের যে স্ববিস্তার বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর পরবর্তী অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো বর্ণিত

হবে এগুলো উম্মতের ফিকাহ্ শাস্ত্র বিশারদদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলদায়ক। আশা করি উম্মতের ফকীহগণ তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবেন। পূর্ববর্তী ফকীহগণও এ অধ্যায়গুলোকে এবং এর মূলনীতি সমূহকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসগুলোকে গবেষণার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের প্রণীত গ্রন্থাবলিতে তার স্বাক্ষর রেখেছেন। এবং এ মূলনীতিগুলোর আলোকে হাদীসসমূহকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অধ্যায়-৬৫

সংশয়পূর্ণ স্থানের যাচাই-বাছাই ও মূলনীতি থেকে বিধান বের করা

মনে রাখা দরকার, অনেক বিধান এমন রয়েছে যা শুধু মূল ব্যাপারের নামোল্লেখ করে জারি করা হয়েছে। তা জানা যায় তার বিভাজন ও শ্রেণী-বিন্যাসের মাধ্যমে। অথচ তার সাম্প্রতিক অর্থজ্ঞাপক কোনো সংজ্ঞা নেই। তাতে প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক পৃথক বিধানের উল্লেখ নেই। যেমন একটি মৌলিক বিধান হলো ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ـ

অর্থাৎ "চোর পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী হোক তার হাত কেটে দাও।"

এখানে চুরির দণ্ডবিধি জানানো হয়েছে। এও জানা গেল তা প্রয়োগ হয়েছে বনী উবাইবাক, তাঈমা ও মাখসূমীয়ার এক নারীর ক্ষেত্রে। তবে এটাও জানা কথা যে, চুরির কয়েকটি ধরন রয়েছে।

যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, পড়ে থাকা মাল নেয়া, রাহাজানি ও গায়ের জোরে যখন খুশি যার মাল নিয়ে যাওয়া ও অপচয়। প্রয়োজন ছিল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর প্রতিটি ধরনের পৃথক পৃথক অবস্থা জিজ্ঞেস করে বা জেনে নেয়া। তা হলে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে যেত।

এক্ষণে এগুলো যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে, প্রত্যেকটি ধরনের স্বরূপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। তা হলে জানা যাবে, চুরি থেকে এসবের পার্থক্য

কতটুকু ও কি ধরনের। তখন সে সবের কোন কোনটি চুরি নয় তা বুঝা যাবে। চুরি বলতে সাধারণত কোন কাজকে বুঝা হয় তাও এখানে বিবেচ্য। এভাবে চুরির সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলো বের করে তার ভিত্তিতে কোনটি চুরি এবং কোনটি চুরি নয় তা নির্ধারণ করতে হবে। সুনির্দিষ্ট লক্ষণের ভিত্তিতেই চুরির সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে।

যেমন ডাকাতি বা রাহাজানি ইত্যাকার নাম থেকেই বুঝা যায় যে, এরূপ কাজের যারা শিকার হয় তারা শক্তি দ্বারা মোকাবেলা ছাড়া রেহাই পায় না। এ সব কাজ এমন জায়গায় করা হয় সেখানের লোকের সাহায্য পেয়ে মোকাবেলা করার সুযোগ থাকে না। তেমনি ছিনতাই এমন এক কাজ যা দেখতে না দেখতে নিমেষের মাঝে করে উধাও হয়। আত্মসাৎ থেকে বুঝা যায় শুরুতে পরিচিতি ও বিশ্বস্ততার সুযোগে এ কাজটি সম্ভব হয়েছে। পথে পাওয়া মাল কথাটি বলে দেয় উদাসীনতা ও অরক্ষণীয়তাই এ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। বলপূর্বক কিছু নেয়া থেকে বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষ তার তুলনায় দুর্বল এবং সে জানে, এ কাজের বিচার চাওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। যদি সে বিচারকের কাছে যায়ও তথাপি বিচারককে প্রভাবিত করে হোক কিংবা ঘুষ দিয়ে হোক সবল ব্যক্তি তার পক্ষেই রায় নিতে পারবে। অপচয় বা অপব্যয় দ্বারা সাধারণত এটাই বুঝায় যে, কেউ কোনো কিছু বেপরোয়া ব্যয় বা খরচ করে চলে। তার ব্যাপারে সবাই করুণা দেখিয়ে থাকে। যেমন পানি বা জ্বালানি খরচে বেপরোয়া হওয়া। পক্ষান্তরে চুরি বলতে কারো কোনো কিছু রাতের অন্ধকারে না বলে নেয়াকে বুঝায়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটখাটো চুরির ক্ষেত্রেও তিন দিরহাম জরিমানার বিধান রেখেছেন। ফলে তা পথে পাওয়া মাল থেকে পৃথক হয়ে গেল। তেমনি বললেন, আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর বেলায় হাত কাটার বিধান নয়। তিনি আরও বললেন গাছের ফল পেড়ে খাওযা কিংবা পাহাড়ে পড়ে পাওয়া মালের জন্য হাত কাটা নয়। এ থেকে তিনি এ ইঙ্গিতই দিলেন যে, হাত কাটার মতো চুরির বস্তু হতে হবে সুরক্ষিত ও প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ।

তেমনি মাত্রাতিরিক্ত বিলাস জীবন ও প্রাচুর্যেরও চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ সুকঠিন। তাই এর একটা মোটামুটি সংজ্ঞা নেয়া যেতে পারে। সমাজ জীবনে এর সুফল অনিয়ন্ত্রিত থাকে। কোন বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারা এর মাত্রা নির্ণয় করা যায় না। কে কতখানি বিলাসপ্রিয় আর কে কত পরিমাণ প্রাচুর্য পেলে পাকড়াও করা হবে এ পার্থক্য নির্ণয় যথাযথভাবে সম্ভব নয়।

এটা জানা কথা যে, অনারবরা উত্তম বাহন, সুউচ্চ বাসস্থান, সর্বোচ্চ পোশাক-আশাক ও মহামূল্যবান অলংকারাদি ব্যবহারে অভ্যস্ত। অথচ তা বিলাস সামগ্রী। তেমনি এটাও সুস্পষ্ট কথা যে, মানুষের রুচিভেদে বিলাস দ্রব্যেও পার্থক্য দেখা দেয়। এক জাতির বিলাসিতা অন্য জাতির কাছে সহজ সরল জীবন বলে বিবেচিত হয়। এক দেশের উত্তম পোশাক ও চালচলন অন্য দেশের লোকের কাছে দারিদ্র্য বলে বিবেচিত হয়। এটাও জানা কথা যে, জীবন যাপনের ধারাও কোথাও উত্তম বস্তু দিয়ে হয়, কোথাও সাধারণ বস্তু দিয়ে হয়। অবশ্য সাধারণ বস্তু দ্বারা জীবন যাপনকে কখনো বিলাসিতা বলা যায় না। তেমনি বিলাসিতার উদ্দেশ্য ছাড়াই যারা স্বভাবত ভালো বেশভূষা নিয়ে চলে ও ভালো খায় দায় কিংবা পরিবেশগত ভাবেই সে সবে যারা অভ্যস্ত তাদেরও বিলাসী বলা যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে কেউই সেটাকে বিলাসিতা ভাবে না।

শরীয়ত সাধারণভাবে প্রাচুর্য ও বিলাসিতার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং সে সব বস্তুর উল্লেখ করেছে যেগুলোকে লোক বিলাসিতার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে থাকে। এক শ্রেণীর লোক বিলাস জীবনের প্রদর্শনীর জন্যে সেগুলো ব্যবহারের অভ্যেস গড়ে তোলে। ইরানি ও রোমানরা সেসব বিলাস সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে একমত। এ কারণেই সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো জীবনধারা বা কোনো দূর দেশের জীবন ধারার দিকে লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। উক্ত দলীলের ভিত্তিতেই রেশমি বস্ত্র ও সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে।

শরীআত দেখতে পেল, বিলাসী জীবনের মূল কথা হচ্ছে, এক শ্রেণীর লোক সব ধরনের জীবন ধারা থেকে বেছে বেছে উত্তম বস্তু নিয়ে নেয় এবং সাধারণ সামগ্রী উপেক্ষা করে। তারপর পূর্ণ বিলাসিতার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, বিশেষ বিলাস সামগ্রীর ভেতর থেকে তারা সর্বোত্তমটিই বেছে নেয় এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প মানের পণ্যটি অবজ্ঞা ভরে উপেক্ষা করে। অবশ্য দুর্লভ বস্তুর ক্ষেত্রে তারা এ নীতি অনুসরণ করে না। অবশ্য শরীআতের বিধানসুলভ বস্তুকে বিবেচনায় আনে না। তবে এ ক্ষেত্রে যেহেতু বিলাসীদের আকর্ষণ বিদ্যমান তাই সেটাকেও হারাম করা হয়েছে। মূলত বিলাস জীবন যেহেতু ঘৃণার্হ, তাই বিলাস সামগ্রী বলে চিহ্নিত বস্তুর অনুরূপ কিংবা আনুসঙ্গিক বস্তু হারাম হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এ নীতির ভিত্তিতে টাকার বদলে অতিরিক্ত টাকা ও খাদ্যসামগ্রীর বদলে অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী নেয়া হারাম করা হয়েছে। অথচ ভালো জিনিসের বেশি

দাম নেয়া হারাম নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে জিনিসে তারতম্য হয়ে গেছে। ফলে বিক্রেতার মর্জির উপর তার দাম নির্ভরশীল হয়ে গেল। জিনিসের বিনিময়ের ক্ষেত্রে একই জিনিস হওয়াই যথেষ্ট নয়, জিনিসের মানও এক হতে হবে। যেমন এক বাঁদীর বদলেই দুই বাঁদী খরিদ করা অবৈধ নয়। তেমনি এক কাপড়ের বদলে দুই কাপড় কোনো হারাম নয়। কারণ এ সবের মূল্য মানে তারতম্য থাকে। ভালোটা ভালো দামে ও মন্দটা কম দামে বিক্রি হয়। তাই সাধারণের ধারণা অনুসারে জিনিসের বদলে জিনিসের পরিমাণ এক থাকা জরুরি নয়।

আমার এ ভূমিকার পর এ অধ্যায়ের অনেক মাসআলার সমাধান এসে গেল। যেমন এক পশুর বদলে একাধিক পশু খরিদ করা কিংবা ঐ ধরনের অন্যান্য ব্যাপার এলে চিন্তা করে তার সমাধান পাওয়া যাবে।

কখনো দুটো ব্যাপারে বাহ্যত বেশ সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তারতম্য সাধারণের কাছে বোধগম্য নয়। যারা গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন তাদের চোখেই কেবল তা ধরা পড়ে। সেটা শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতদের মতানুসারী আলেমগণই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো বাহ্যিক নিদর্শন নির্ধারিত করে তার ভিত্তিতেই কোনটা পাপের ও কোনটা পুণ্যের তা নির্ণয় করতে হবে। তারপর তার ভিত্তিতে উভয়ের বিধি বিধান বলে দিতে হবে। যেমন বিবাহ ও ব্যভিচার।

বিবাহের তত্ত্বকথা হলো এই, এর মাধ্যমে সৃষ্টির ধারা সুশৃঙ্খলভাবে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাই তার দাবি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গভীর ও স্থায়ী হবে, উভয়ের সন্তান উৎপাদনের অভিলাস থাকবে এবং উভয়ে নিজ নিজ ইজ্জত আবরুর হেফাজত করবে। এটাই সবার আকাঙ্ক্ষিত ও পসন্দনীয় কাজ।

পক্ষান্তরে ব্যভিচার বা যৌন স্বেচ্ছাচারের মূল কথা হলো এই যে, ইচ্ছাশক্তিকে বিভ্রান্তি ও যৌন স্বেচ্ছাচারের জন্য লাগামহীন করে দেয়া। ফলে তার লজ্জা শরমের বালাই থাকে না, ইজ্জত আবরুর আগল ভেঙ্গে যায় ও সৃষ্টি কৌশলের সামগ্রিক নিয়ম শৃঙ্খলা চুরমার হয়ে যায়। এ কাজটি সৃষ্টিকর্তার গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলো।

বহু ক্ষেত্রেই বিয়ে ও মুক্ত যৌনাচারে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন দুটোতেই যৌন চাহিদা পূরণ হয় এবং নারীর প্রতি পুরুষের যৌনাকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই বাহ্যিক কোনো নিদর্শন দ্বারা এ দুটোর পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে। তার ভিত্তিতেই কোনটি বাঞ্ছিত ও কোনটি অবাঞ্ছিত তা বলে দিতে হবে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের জন্যে কয়েকটি নিয়ম বেঁধে দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য স্থির করে দিলেন।

১। পুরুষ পুরুষকে নয়, বরং নারীকে বিয়ে করবে। কারণ এ পথেই বংশধারা চালু থাকবে। পরন্তু সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিয়ে করতে হবে স্থায়িত্বের জন্যে, আমোদ ফুর্তির জন্যে নয়। তাতে পরামর্শ প্রস্তাবনা ও ঘোষণা থাকতে হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত নারীর সম্মতি থাকতে হবে। এ সবই বিয়ের শর্ত।

২। স্বামী স্ত্রী উভয়ে পারস্পরিক সহায়তার জন্য উদ্বুদ্ধ থাকবে। এটা তখনই হতে পারে যখন বিয়ে সাময়িক না হয়ে স্থায়ী ও অপরিহার্য হয়। এ কারণেই গোপন বিয়ে ও সাময়িক বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। একই কারণে সমকামিতাকে হারাম করা হয়েছে।

অনেক সময় এক পুণ্য কাজ অন্য পুণ্য কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তখন সে দুটোর ভেতরেও পার্থক্য সৃষ্টি জরুরি হয়। যেমন কিয়াম হচ্ছে রুকু ও সিজদার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। কখনো আবার কোনো কাজ খুব কল্যাণ দেয় না বটে, কিন্তু করা হয়। যেমন দু'সিজদার মাঝে বসা। কখনো কোনো এক কাজের শর্ত গোপন ও কল্পনীয় ব্যাপার হয়। তখন দৈহিক কোনো কাজ বা কথা দ্বারা তা চিহ্নিত করতে হয় এবং সেটাকে রুকন বানাতে হয় যেন গোপন কাজটা নিয়মনীতির আওতায় চলে আসে। আল্লাহ পাকের জন্য খালেস নিয়তে ইবাদত করা একটা অন্তর্নিহিত ব্যাপার এবং নিয়ত করা একটা গোপন কাজ। তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে কেবলামুখী হওয়া ও তাকবীর বলাকে এবং এ দুটোকে নামাযের রুকন বা অঙ্গ করা হয়েছে।

যখন কোনো আয়াতে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয় কিংবা তার অবস্থা থেকে বিশেষ কোনো বিধান বুঝা যায়, তখন তা পালনে কোথাও সংশয় সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে পরিভাষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জরুরি হয় কিংবা সেই বিশেষ বিধানের সংজ্ঞা সম্পর্কে আরববাসীর প্রচলিত ধারণা অবহিত হতে হয়। যেমন রমযান সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো। অতঃপর মেঘ ঢাকা অবস্থায় তা অনুসরণের ক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিল। সেক্ষেত্রে আরবরা সেভাবে মাস নির্ধারণ করে অর্থাৎ শাবান মাসকে ত্রিশ দিন ধরে রমযান মাস শুরু করে, রোযাও সে হিসেবে রাখতে হবে। কারণ, আরবী মাস কখনো উনত্রিশ দিনে ও কখনো ত্রিশ দিনে হয়। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা উম্মী জাতি। না লিখতে জানি, না কোন মাস কত দিনে হয় তার হিসাব জানি। –আল হাদীস।

তেমনি কসরের আয়াতে সফর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অতঃপর তা পালনে কখনো সংশয় দেখা দিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম ফায়সালা করলেন যে, সফর বলতে নিজ স্থান থেকে অন্য এমন কোনো স্থানে গমনকে বুঝাবে যেখানে যেতে একদিন ও একরাতে পৌছা যায় না এবং পরবর্তী দিনও প্রয়োজন হয়। তাই তার দূরত্ব ধরা হবে চার বুর্দ বা আটচল্লিশ মাইল।

যে বিধান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং উম্মত তা থেকে মুক্ত রয়েছে সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নীতি হলো এই যে, সে বিধানটি সার্বজনীন বিধান নয়, বরং ব্যক্তি বিশেষের উপযোগিতা নির্ভর বিধান। হযরত তাউস (রহঃ) আসরের পরে যে দু'রাকাত নামায পড়তেন সে ব্যাপারেও এই কথা। এ কারণেই তিনি অন্যান্যকে তা অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছুর হাকিকাত জানতেন। তাই তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী আমলের ওপর সংশয় করা চলে না।

যেমন চার বিয়ের ব্যাপারটি। এর বেশি বিয়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখা সম্ভব না হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে সচেতন ও সজ্ঞাত ছিলেন। তিনি জানতেন দাম্পত্য জীবন সার্বিকভাবে যাপন করার উত্তম পন্থা কোনটি। এ জন্যে তিনি এক্ষেত্রে যা করেছেন, অপরের জন্যে তা বৈধ রাখেননি। কারণ তাদের পক্ষে অনুসরণ সম্ভব নাও হতে পারে।

অথবা সে বিধানটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি ব্যক্তিগত কারণে না হয়ে কোনো প্রচলিত রীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টির জন্যেও হতে পারে। যেমন তিনি বললেন– কোনো জিনিস ক্রয় করে বিক্রেতার ওপর কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না। অথচ তিনি হযরত জাবের (রাঃ) থেকে একটি উট কিনে শর্ত লাগালেন সেটাকে মদীনা পর্যন্ত চালিয়ে নেবে।

অথবা সে বিধান নিষ্পাপ নবী ছাড়া অন্যদের বিপথে নিয়ে যাবে। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার অবস্থায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে চুমু খেয়েছেন। সে ব্যাপারে তিনি বলেন– তোমাদের কে আছ যে লোক নিজের প্রকৃতির ওপর সেভাবে বিজয়ী থাকতে পার যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারতেন?

অথবা রিসালাতের সাথে সে কাজটি এ জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তাঁর পবিত্র আত্মা যখন কোনো নেক কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তা বিশেষ অনুমোদন লাভ করে। কারণ, তাঁর আত্মা সর্বদা আল্লাহ পাকের দিকে অধিক নিবিষ্ট থাকার ও ঔদাসীন্যের সকল পর্দা ছিন্ন করার জন্য সদা উদগ্রীব ছিল। যেমন কোনো এক সক্ষম ব্যক্তির খাবার চাহিদা বেশি হয়ে থাকে। একটি বর্ণনা মোতাবেক তাঁর জন্যে তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত নামায ওয়াজিব ছিল।

অধ্যায়-৬৬

অবকশ দান ও সহজিকরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে তুমি তাদের বেলায় বিনয়ী ও নম্র হয়েছ। যদি তুমি উগ্র মেজাজ ও রূঢ় স্বভাবের হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যেত। তিনি আরও বলেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের ব্যাপার সহজ ও আরামদায়ক করতে চান, কঠিন ও কষ্টদায়ক করতে চান না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু মূসা (রাঃ) ও মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা পরিচালনার জন্য পাঠান তখন বলেন ঃ

يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَبَشِّرْ وَلَا تُنَفِّرْ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ـ

অর্থাৎ তুমি আরাম দিও, কষ্ট দিও না, খুশি রেখ, অখুশি করো না এবং ঐক্যবদ্ধ রেখো, বিভক্তি সৃষ্টি করো না।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ـ

অর্থাৎ তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্যে পাঠানো হয়নি।

দ্বীনের কাজগুলোকে সহজ করার ব্যাপারটি কয়েকভাবে অর্জিত হতে পারে।

১। কোনো ইবাদতের জন্যে কোনোরূপ কষ্টদায়ক ব্যাপারকে শর্ত বা রুকন বানানো। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যদি উম্মতের জন্যে কষ্টদায়ক না ভাবতাম তা হলে প্রত্যেক নামাযের আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

২। কিছু কিছু ইবাদতকে এরূপ আনুষ্ঠানিক রীতিতে পরিণত করে দেয়া যা সবাই সানন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন, দুই ঈদের নামায ও জুমার নামায। এর প্রয়োজন সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– ইয়াহুদি সম্প্রদায় যেন জানতে পায়, দ্বীনের কাজে আনন্দ রয়েছে।

মূলত বড় বড় মজলিসে সেজেগুজে আগে গিয়ে হাজির হওয়ার প্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার।

৩। সে সব কাজকে সুন্নাত বানানো যার প্রতি মানুষের মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি সম্মত হয়। তা হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পালন করবে। এ কারণেই মসজিদকে পাক-সাফ রেখে আকর্ষণীয় করা ও মুসল্লীদের খোশবু মেখে নামাযে আসা সুন্নাত করা হয়েছে। মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত ও সুরেলা কণ্ঠে আযান দেয়াকে মুস্তাহাব করা হয়েছে।

৪। ইবাদতের ক্ষেত্রে কাজ না থাকা চাই এবং যে কাজ মানুষ অপছন্দ করে তা দূর করা চাই। এ কারণেই ক্রীতদাস, গেয়ো, ও জারজ ব্যক্তির ইমামতিকে মাকরূহ করা হয়েছে। স্বভাবতই মানুষ তাদের মুক্তাদি হতে অপমানবোধ করে।

৫। অধিকাংশ লোকের স্বভাব যা দাবি করে এবং যা বর্জন করায় তাদের মনে খটকা সৃষ্টি হয় তা বহাল রাখা চাই। যেমন খলীফাই ইমামতের অধিকতর হকদার, তেমনি হকদার মেহমান নেওয়াজ ব্যক্তি তার বাড়িতে ইমামতি করার। তেমনি একাধিক স্ত্রীর স্বামী নতুন বিয়ে করলে তিন অথবা সাতদিন একাধারে নতুন স্ত্রীকে দিয়ে পরবর্তী দিনগুলো স্ত্রীদের ভেতর যথানিয়মে বণ্টন করবে এটাই মানুষের স্বাভাবিক দাবি।

৬। মানুষকে সব সময় দ্বীনের তালীম দিতে থাকবে, তাদের সদুপদেশ দেবে এবং ভালো কাজে উৎসাহ দেবে ও মন্দ কাজে নিরুৎসাহিত করবে। যেন তাদের অন্তর প্রেরণা প্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের জন্যে দ্বীন পালন সহজ হবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এ কাজ করতেন।

৭। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে যে কাজ করতে বলতেন তা তিনি নিজেও করতেন। কখনো তিনি সেক্ষেত্রে অন্যদের অবকাশ দিতেন তা না করার। এর ফলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কার্যধারার ওপর লোকের আস্থা বেড়ে যেত।

৮। হুযুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতেন যেন তিনি তাদের পূর্ণ দ্বীনদার ও সংস্কৃতিবান করেন।

৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে গভীর প্রেরণা ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জন। তার জন্যে সবাই তাঁর কাছে এরূপ মনঃসংযোগ সহকারে বসতেন যেন মাথার ওপর পাখি বসছে বলে কেউ মাথা নাড়াচ্ছে না।

১০। যে ব্যক্ত সত্যদ্রোহী হবে তাকে শায়েস্তা করা চাই। তাকে সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ ও হতাশ করতে হবে। যেমন হন্তা নিহতের ওয়ারিশ হতে পারবে না এবং জোর জবরদস্তির তালাক কাজে আসবে না। এর ফলে কেউ সে সব কাজ করাকে লাভবান ভাববে না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

১১। ভারী কাজকে আস্তে আস্তে বিধানে রূপ দেবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কুরআনে পয়লা জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনামূলক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর যখন মানুষ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হলো, তখন হালাল হারামের বিধান অবতীর্ণ হলো। যদি শুরুতেই শরাব হারাম করা হতো, তা হলে শরাবীরা বলত : আমরা কখনো শরাব ছাড়তে পারব মা। তেমনি শুরুতেই যদি বলা হতো, জ্বেনা ছাড়, তাহলে তারা বলত : আমরা কখনো জ্বেনা ছাড়তে পারব না।

১২। সহজিকরণের আরেকটি পথ হলো এই, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো কাজ করবেন না যা লোকদের ভেতর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই কখনো কখনো মুস্তাহাব কাজও বর্জন করা হতো। যেমন হযরত আয়েশাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি তোমার জাতি কাফের হয়ে যাবার ভয় না থাকত তা হলে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের ওপরই কাবাঘর তৈরি করতাম।

১৩। শরীয়াত প্রণেতা বিভিন্ন পুণ্য কাজের বিধান দান করেছেন। যেমন ওযু, গোসল, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। এগুলো মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেননি। তবে তা পালনের নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্ত-শরায়েতের ক্ষেত্রে আঁটঘাট বেঁধে কিছু করে যাননি। বরং সেগুলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির আনুকূল্যে রেখে দিয়েছেন। তারা যেন মূল বক্তব্য ও বিধান বুঝে নিয়ে নিজেদের সাধ্যমত তা পালন করতে পারে। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না। কিন্তু তিনি শব্দ উচ্চারণে বিশুদ্ধতার কথা বলেন নি। অথচ কিরআতের বিশুদ্ধতা তার ওপর নির্ভরশীল। কোথায় তাশদীদ হবে ও সাকিন হবে তাও বলেননি। তেমনি তিনি বলেছেন : কেবলামুখী হয়ে নামায পড়তে হবে। কিন্তু এ কথা বলে দেননি তা আমরা কিভাবে নির্ধারণ

করব। তেমনি তিনি বলেছেন, শতকরা আড়াই দিরহাম যাকাত দিতে হবে। কিন্তু এটা বলে দেননি যে, দিরহামের ওজন কতটুকু হবে?

এসব নিয়ে কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করেছে তো তিনি সে জবাবই দিয়েছেন যা প্রশ্নকর্তার নিজেরও জানা রয়েছে। তার চেয়ে বেশি কিছু বলেন নি। যেমন রমযানের পয়লা দিন কখন শুরু হবে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মেঘলা দিন হলে শাবানের ত্রিশদিন পূর্ণ হলে শুরু হবে। তেমনি জঙ্গলে অবস্থিত যে পানি জীব জানোয়ার ব্যবহার করে তা পাক কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, দুই কুল্লা পরিমাণ পানি হলে তা পবিত্র। কুল্লা বলতে কতটুকু পানিকে বুঝায় তা আরবদের জানা ছিল।

এরপর কথা হলো এই যে, প্রত্যেক বস্তুকে তার মূল অবস্থায় রেখে বর্ণনা করা চলে। ফলে প্রকাশ্যে কি গোপনে ও বিধিবদ্ধ না থাকা অবস্থায় একই থেকে যায়। প্রয়োজনে যেন তার সমসাময়িক প্রচলিত ব্যবস্থা চলতে থাকে। কোনো কিছু আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেয়া হলে তা লোকের জন্য কষ্টকর হয়। বেশি বাঁধাবাঁধি হলে বেশি কষ্ট হয়। অথচ শরীআত মেনে চলা সাধারণ অসাধারণ সবার জন্যেই অপরিহার্য। তাই তার বিধিবিধান সবিস্তারে বর্ণিত হলে তা মনে রাখাও কঠিন হয়। তার চেয়ে বড় কথা হলো, মানুষ বিধানের নিয়ম-নীতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে যায়, তখন তার উপকারের দিকটা ভাববার সময় পায় না। তখন তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও তার দৃষ্টিগোচর হয়না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, ক্বারী ও মুজাব্বিদরা দিনরাত শব্দের উচ্চারণ নিয়েই মন মগজ ব্যস্ত রাখে, তার মর্ম নিয়ে ভাবার সময় পায় না। তাই এটাই উত্তম পন্থা যে, বিধানের মৌলিক দিকগুলো বলে দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় লোকদের প্রচলিত জ্ঞান ও ধারণার ওপর ছেড়ে দেয়া। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১৪। শরীআতদাতা মানুষকে তাদের মূল জ্ঞান-বুদ্ধি মোতাবেক আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বিজ্ঞান, যুক্তিশাস্ত্র বা নীতিজ্ঞান না শিখেও খোদাদত্ত জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারাই তাঁর আহ্বান যেন বুঝতে পায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى -

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর আরশে সমাসীন রয়েছেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাবশী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ কোথায়

আছেন? সে জবাবে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলাটি ঈমানদার।

তেমনি কেবলামুখী হওয়া কিংবা পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা ঈদের নামাযের সময় জানার জন্য মানুষকে হিসাববিজ্ঞান কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী রাখা হয়নি। বরং মূল বিধানটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবলা তো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝেই রয়েছে। তাই কাবার দিকে মুখ হলেই চলবে।

তেমনি বলেছেন, যেদিন তোমরা হজ্ব করে ফিরবে হজ্ব এবং ঈদুল ফিতর সেদিন হবে যেদিন তোমরা রোযা শেষ করবে।

অধ্যায়-৬৭

উৎসাহ ও নিরুৎসাহ তত্ত্ব

বান্দার উপর আল্লাহ পাকের অন্যতম অনুগ্রহ ও অবদান হলো এই যে, তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে কোন কোন কাজে পুরস্কার আর কোন কোন কাজে শাস্তি রয়েছে তা আগাম বান্দাদের জানিয়ে দিলেন। ফলে বান্দাদের অন্তরে জান্নাত লাভের উৎসাহ ও জাহান্নামের পথে নিরুৎসাহ সৃষ্টি হলো। তারা শরীআত অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ হলো। মানুষ স্বভাবতই লাভের কাজে এগিয়ে যায় ও লোকসানের কাজ ছেড়ে দেয়।

তাই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

অর্থাৎ অবশ্যই এটা ভারী কাজ, কিন্তু তাদের জন্যে ভারী নয় যারা এ ভাবনায় ভীত যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রভুর সম্মুখীন হবে এবং নিঃসন্দেহে তাঁর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে।

উৎসাহ-নিরুৎসাহ তথা প্রলোভন-ভীতি তত্ত্বের কয়েকটি মূলনীতি রয়েছে। তার ভিত্তিতে এর শাখা-প্রশাখাগুলো নির্ণীত হয়। ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম তার মৌলিক রূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সবিস্তারে জানতেন না। আমার এ কথার সমর্থনে এ হাদীসটি দলীল হতে পারে-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِيْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَاتِيْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَئَيْتُمْ لَوْوَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ -

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্ত্রী সহবাসেও তোমাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের কেউ তার কাম চরিতার্থ করলে তাতেও সে ছাওয়াব পাবে? তিনি বলছেন, সে যদি বিপথে তা করত তাহলে তো আজাব পেত, সেটা কি তোমরা দেখছ না।

সাহাবায়ে কেরাম যে কোনো মাসআলার উপর নির্দ্বিধায় আমল করতেন, কিন্তু তার তত্ত্ব জানার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তাই তা তাদের কাছে উহ্য থাকত। তার কারণ এই যে, মোটামুটি জানতেন যে, যেমন কর্ম তেমন ফল, এটাই তো মূলনীতি। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কি প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়, যখন তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোনো প্রশ্ন করেছেন তখন তিনি প্রচলিত সুস্পষ্ট একটি নীতি তুলে ধরে তার ভিত্তিতেই তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

ফকীহদের উদ্বৃত একটি হাদীসও আমার বক্তব্যের দলীল, যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لَوْكَانَ عَلٰى اَبِيْكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ نَعَمْ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يَقْضِىَ -

অর্থাৎ যদি তোমার বাপ ঋণগ্রস্ত থেকে মারা যান তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করবে? সাহাবী (রাঃ) বললেন– হাঁ, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আল্লাহই বেশি হকদার।

ফকীহগণ বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে কোনো বিধান কোনো একটি মূলনীতির ভিত্তিতে এসেছে।

এসব পর্যালোচনার সার কথা হলো এই, পুণ্য কাজের দ্বারা আত্মা সুশোভিত হয়। যেমন তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠ। তেমনি তা থেকে নাগরিক জীবনেও শান্তি-শৃঙ্খলা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে পাপ কাজে এর বিপরীত ফল দেখা দেয়।

এক্ষণে কথা হচ্ছে যে, যৌনতৃপ্তি মিটানো তো জৈবিক চাহিদার অনুসরণ বৈ নয়। তাই এটা যে কোনো পথে বাস্তবায়নের ভেতর সাধারণ বুদ্ধি অতিরিক্ত কোনো কল্যাণ দেখতে পায় না। এতে এমন কোনো ব্যাপার নেই যা মূলনীতি হতে পারে। সে ধরনের চিন্তা প্রয়াসও হাস্যকর। তবে সংশ্লিষ্ট হাদীসের তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী সহবাসে স্বামী ও স্ত্রীর লজ্জাস্থান সুরক্ষিত ও পবিত্র থাকে এবং তার ফলে হারাম পথে কামনা চরিতার্থতা থেকে বাঁচা যায়।

এবারে আমি তারগীব ও তারহীবের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি। প্রত্যেকটি পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন রহস্যও রয়েছে।

১। আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে কোন আমলের কি তাছীর তা এখন বলে দেয়া হচ্ছে। যেমন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি এ দুটোর যে কোনো একটির জয়ী হওয়া বা পরাজিত হওয়ার বাস্তব প্রকাশকেই পুণ্য বা পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۰

এ দোয়াটি পাঠ করবে, তার জন্যে দশটি গোলাম আযাদ করার ছাওয়াব লেখা হবে, একশত পুণ্য লেখা হবে, একশত পাপ মাফ করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে। সেদিন তার চাইতে ভালো আমল আর কেউ পেশ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি এ আমল আরও বেশি করে থাকে তার কথা ভিন্ন।

আমি এ সব আমলের তত্ত্বকথা পূর্বের আলোচনায় বলে এসেছি।

২। এ আমল অনুসরণ করে শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার সুফল ও সুপ্রভাব বর্ণনা করা যাক। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলেছেন : সন্ধ্যা পর্যন্ত আমলকারী শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে, অন্যত্র তিনি বলেছেন : বদকার লোক এ আমল অনুসরণ করতে পারবে না। তার অর্থ দাঁড়াল এই যে, এ আমল অনুসরণকারী শয়তান থেকে সুরক্ষিত নেককারে পরিণত হলো। তেমনি এ আমল রিযিক বাড়িয়ে দেয় ও সব কিছুতে বরকত এনে দেয়।

এ আমলের অন্যতম রহস্য এই যে, প্রথমে আল্লাহ পাকের মহিমা ঘোষণা করে তাঁর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া হয়। ফলে এটা তার দোয়া কবুলের উছিলা

হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদছীতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ পাক বলেন, যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিব।

অপর একটি রহস্য এই যে, এ আমলকারী আল্লাহর স্মরণে মশগুল হয় ও মহামহিমান্বিত প্রভুর মহান দরবারের দিকে নিবিষ্টচিত্ত হয়। ফলে গায়েবী মদদ পেয়ে শয়তানের সকল প্রভাব থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়।

অপর একটি রহস্য এই যে, ফেরেশতা তার জন্যে দোয়া করে। ফলে সে পুণ্য পথেই অগ্রসর হতে থাকে। কখনো সে কল্যাণের পথে চলে, কখনো আবার অকল্যাণ প্রতিরোধের পন্থা নেয়।

৩। এ আমলের প্রভাব আখেরাতে কী হবে এখন তা বলা যাক। দুটো পটভূমির মাধ্যমে সে রহস্য জানা যাবে।

পয়লা পটভূমি হলো এই যে, আখেরাতে কোনো কিছুর ছাওয়ার বা আজাবের কারণ হবার স্বীকৃতি তখনই লাভ হবে যখন তার সাথে পুরস্কার বা শাস্তি কোনো একটির সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকবে। অথবা সেটার সাথে সেই চার স্বভাবের সামঞ্জস্য থাকবে যার ওপর সৌভাগ্য ও আত্মশুদ্ধি অর্জন হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। সেই চারটি স্বভাব হলো : পবিত্রতা, প্রভুর সামনে বিনয়, দান-খয়রাত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কিংবা সর্বোচ্চ পরিষদের অভিপ্রায় অনুসারে শরীআতের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরামের মিশনের সহায়তা করা। সামঞ্জস্য বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, কাজটি উক্ত প্রতিফলের যে কোনো একটির যথোপযুক্ত আশ্রয়স্থল হবে। অথবা তার স্বভাবই সে প্রতিফলটির অপরিহার্য দাবিদার হবে অথবা তার উসিলা হবে। যেমন কেউ যদি খালেস নিয়তে নির্মল চিত্তে আদায় করে তা হলে জানা গেল যে, সে আল্লাহর মহিমান্বিত দরবারের নৈকট্য লাভ করেছে এবং জৈবিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। তেমনি পরিপূর্ণ ওযু আত্মার ওপর পবিত্র প্রভাব বিস্তার করে। অনুরূপ কার্পণ্যের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে কেউ যদি অতিরিক্ত দান–খয়রাত করে, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে, নিজের হকের ক্ষেত্রেও ঝগড়া এড়িয়ে যায় ইত্যাকার কাজ প্রমাণ দেয় যে, লোকটার অন্তর ঔদার্যে পরিপূর্ণ এবং উপরোক্ত কাজগুলো তারই নিদর্শন।

তেমনি ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, বন্ধুদের পারস্পরিক ঝগড়া মিটানো ইত্যাদি পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কারণ ও উসিলা হয়ে

থাকে। তেমনি আরবদের সাথে মহব্বত রাখা, তাদের মতো লেবাস পোশাক পরা ও তাদের জীবনযাত্রা অনুসরণ করার কারণ হয়ে থাকে। এটাই সত্য ধর্ম অর্জনের সহজ উপায়। কারণ আল্লাহ তাআলার দ্বীন মূলত আরবদের অভ্যেসকে সামনে রেখেই নির্ধারিত হয়েছে এবং নবীর শরীআতের শান-শওকত তাদের মাধ্যমেই সমুন্নত হয়েছে।

তেমিন সূর্যাস্তের বেশ আগেই ইফতারের আয়োজন করে রাখা মূলত অন্যান্য জাতির সাথে স্বাতন্ত্র্য রাখার ও তাদের বিকৃতি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার সহায়ক হয়েছে।

মানব সমাজের বিজ্ঞ মনীষী, প্রকৌশলী ও ডাক্তার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বিধি ব্যবস্থা প্রদান ও অবলম্বনের এ ধরনের সতর্কতামূলক পন্থাই অনুসরণ করেন। আরববাসীও তাদের বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে এ নীতি অনুসরণের কথাই বলে আসছেন। আমি তার থেকে কিছু উল্লেখও করেছি।

যদি কোনো আমল কষ্টকর হয়, দুর্বোধ্য হয়, কিংবা মন মেজাজের পরিপন্থী হয়, তার ওপর সে ব্যক্তিই স্থির থাকতে পারে যার এখলাস মজবুত ও যথার্থ হয়। এ ধরনের আমল ইখলাসের স্বরূপ উদঘাটন করে। যেমন যমযমের পানি খুব তৃপ্তি মিটিয়ে পান করা কিংবা হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে মহব্বত রাখা। কারণ এগুলো খোদায়ী বিধানের পরীক্ষামূলক বিধান। তেমনি আনসারদের সাথে মহব্বত রাখাও ক্ষেত্র বিশেষে কঠিন আমল। কারণ সা'দী ও ইয়ামনীরা সর্বদা তাদের সাথে শত্রুতা চালিয়ে আসছিল। অবশেষে ইসলাম এসে তাদের ভেতর মহব্বত সৃষ্টি করেছে। মূলত তাদের সাথে মহব্বত রাখতে পারাটা প্রমাণ করে যে, তাদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তেমনি ইসলামের সৈনিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ববোধ নিয়ে কেউ যদি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে রাত জেগে তাদের পাহারা দেয় তাহলে তা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর বাণীকে উচ্চকিত করা ও আল্লাহর দ্বীনকে মহব্বত করার ক্ষেত্রে তার যথার্থ দৃঢ়তা রয়েছে।

দ্বিতীয় পটভূমি এই যে, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং তার আত্মা ও কায়া যখন তার ভালো কিংবা মন্দ আমলের দিকে রুজু করে তখন তার চেহারায় তার ছাপ পড়ে এবং তাতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে সেখানে পুরস্কৃত হবে, না শাস্তি পাবে। সেই পুরস্কার বা শাস্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে এ জগতের কার্যকারণ ভিন্নধর্মী। এখানে আত্মার কিছু ব্যাপার অন্য কিছু ব্যাপারকে অপরিহার্য করে। সেই আত্মিক কার্যকারণ মোতাবেকই নিদ্রিত

ব্যক্তির সামনে পরিণাম ফলটি রূপ ধারণ করে। যেমন মুয়াজ্জিন সবাইকে জানিয়ে দিল, এখানে স্ত্রীসংগম ও খানাপিনা চলবে না আর তার পরিণাম ফল এই দেখা দিল যে, সবার লজ্জাস্থান ও মুখে মোহর লেগে গেল। মেছালী জগতে কার্য-করণের এ ধরনের ফলাফলই দেখা দেয় আর সেখানকার বিধান এর উপরই প্রতিষ্ঠিত।

যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ) শুধুমাত্র হযরত দাহিয়াহ কলবী (রাঃ)-এর রূপ ধরে আসতেন, অন্য কোনো রূপ ধারণ করতেন না, এর কারণও বিশেষ তাৎপর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। তেমনি আগুন হযরত মূসা (আঃ)-এর সামনে আত্মপ্রকাশ করল বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে। আরিফ তথা এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এর তাৎপর্য বুঝতে পায়। তিনি জানেন, কোন কাজের পরিণামটি কি ধরনের রূপ নিয়ে ধরা দেবে। যেমন স্বপ্নের দক্ষ ব্যাখ্যাকার বলতে পারেন, স্বপ্নদ্রষ্টা যে চিত্রটি স্বপ্নে দেখেছে তার তাৎপর্য কি হবে।

মোটকথা এভাবেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পান, যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইলম গোপন রাখে এবং তা কাউকে শেখায় না, তাকে আগুনের লাগাম লাগিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ বিদ্যা গোপন করায় আত্মা বিব্রত হয় ও কষ্ট পায় এবং লাগামও কাউকে বিব্রতকর কষ্ট দান করে। তাই বিদ্যা গোপনের এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাভাবিক শাস্তি।

তেমনি যে ব্যক্তি ধনসম্পদ লিপ্সু ও তার মন মগজ সবই ধনলিপ্সা গ্রাস করে ফেলে, তার গলায় আগুনের সাপ জড়িয়ে দেয়া হবে। তেমনি যে ব্যক্তি টাকা পয়সা ও গরু ছাগল রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করা থেকে বিরত থাকে তাকে মালায়ে আলায় নির্ধারিত সেই শাস্তিই প্রদান করা হবে যা উক্ত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তেমনি যে ব্যক্তি লৌহ নির্মিত আংটি কিংবা বিষপান করে আত্মহত্যার মাধ্যমে নাফরমানি করবে তাকে তদনুরূপ শাস্তিই দেয়া হবে।

তেমনি যে ব্যক্তি দরিদ্রদের বস্ত্র দান করবে তাকে কেয়ামতের দিন জান্নাতের রেশমি বস্ত্র পরিধান করানো হবে। যে ব্যক্তি একজন মুসলমান গোলামকে আজাদ করে তাকে গোলামীর বিপদ থেকে মুক্তি দেবে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই গোলামের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে।

৪। প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনের আরেকটি পদ্ধতি হলো এই, যাদের তা প্রদর্শন করা হবে তাদের ধারণায় যা ভালো বা মন্দ তা দিয়েই তাদের উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করবে। হোক তা শরীআত মোতাবেক ভালো বা মন্দ কিংবা

তাদের অভ্যাসগত ভালো বা মন্দ। অবশ্য এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেটা যেন শরীআত ও অভ্যেস এ দুটোর সমন্বিত ব্যাপার হয়। মোটকথা উপমা ও উপমিতের ভেতর যে কোনো ধরনের সাযুজ্য বহাল থাকলেই হলো। যেমন ফজর নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকিরকারীকে এক হজ্ব ও এক উমরাহকারীর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। তেমনি হাদিয়া দিয়ে ফেরত নেয়া লোককে সেই কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যেটা বমি করে চেটে খায়।

প্রলোভন বা ভীতির কাজটি সবার কাছেই লোভনীয় বা ভীতিকর হয়। তা যে করবে তাকে যেন দোয়া বা বদদোয়া করা হয়। এসব উপমা-উদাহরণের মাধ্যমে আমল কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা নির্দ্বিধায় সবার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন শরীআত প্রণেতা বলেন ঃ

"এটা মুনাফিকের নামায। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" কিংবা এটা শয়তানের কাজ অথবা এটা ফেরেশতার কাজ। 'যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে আল্লাহ তাকে রহম করুন। এ ধরনের আরও কিছু বক্তব্য রয়েছে।

উৎসাহিত ও নিরুৎসাহিত করার অপর একটি পদ্ধতি হলো এই যে, কোন কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন ও কোনটি অপছন্দ করেন এবং কোন কাজে ফেরেশতাদের দোয়া ও কোন কাজে বদদোয়া লাভ হয় তা তুলে ধরা। যেমন শরীআত প্রণেতা বলেন, আল্লাহ পাক এই কাজ অপছন্দ করেন। তেমনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সারির ডানদিকের লোকদের ওপর রহমত নাযিল করেন। এর রহস্য আমি বলে এসেছি।

অধ্যায়-৬৮

পরিপূর্ণতা অর্জনে সাফল্য বা ব্যর্থতার ভিত্তিতে উম্মতের বিভিন্ন স্তর

এ অধ্যায়ের মূলনীতি সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَاَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَآ اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা তিন শ্রেণীর হবে। অতঃপর ডানদিকের সহচর। ডান দিকের সহচর কারা? আর বামদিকের সহচর, বামদিকের সহচর কারা? আর আগে বেরিয়ে যাবার দল সবার আগে রয়েছে। তারা নৈকট্য লাভকারী দল।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ـ

অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের মহাগ্রন্থের উত্তরাধিকারী বানালাম যাদের আমি বান্দাদের ভেতর পছন্দ করেছি। তাদের একদল নিজেদের ওপর অত্যাচারী, অন্য একদল মাঝামাঝি অবস্থায় এবং অপর দলটি আমার অনুমোদনক্রমে কল্যাণের সাথে আগে চলে গেছে, এটা বড়ই মর্যাদার ব্যাপার।

তোমরা জান যে, সর্বোচ্চ স্তর হলো লোকদের ভেতর মুফহামীনদের (দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তদের)। তাদের কথা আমি আগেই বলে এসেছি। তার পরবর্তী স্তর হলো সাবেকীনদের (নৈকট্য প্রাপ্ত)। তাদের আবার দুটো শ্রেণী রয়েছে।

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে আসহাবে ইসতিলাহ ও উলুব। তারা পরিপূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে মুফহামিনদের মতোই যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা মুফহামিনদের স্তরে পৌঁছতে ব্যর্থ হন। বস্তুত তাদের যোগ্যতা হচ্ছে নিদ্রিত ব্যক্তির যোগ্যতার মতোই; তা কাজে লাগা বা না লাগা নির্ভর করে জাগ্রতকারীর ওপর। যখন পয়গম্বরদের আহ্বান তাদের জাগিয়ে দেয়, তখন তারা নিজ যোগ্যতা অনুসারে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করে। সেই জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহাটি তার অন্তরে নিহিত থাকে। ফলে সে ধর্মীয় মুজতাহিদের মতোই গবেষণায় রত হয় এবং সেই ইলহামের মোটামুটি অবস্থাটি অর্জন করে।

ইলহামের মোটামুটি অবস্থা বলতে এ কথাই বুঝায় যে, মহিমান্বিত দরবারের পবিত্র মজলিস তার ভেতর ব্যাপক যোগ্যতার কারণে তার দিকে আকৃষ্ট হয়। আর এ আস্থাটি সাবেকীনদের (অগ্রবর্তী দল) সব শ্রেণীর ভেতর প্রায় সমভাবে বিদ্যমান। আম্বিয়ায়ে কেরামও এ কথা বলে গেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো মাজজব ও উন্নত পর্যায়ে উন্নীতদের। খোদাদত্ত তাওফীকের বদৌলত তারা সাধনা ও সান্নিধ্য প্রাপ্তির পথে নিমগ্ন থাকে। ফলে

তাদের জৈবিক দিকগুলো পরাভূত ও নির্লিপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের ইলম ও আমলে পূর্ণতা দান করেন। তাই তারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ফলে তাদের থেকে অনেক বড় বড় ঘটনা প্রকাশ পায়। অধ্যাত্মবাদের শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গদের মতোই তাদের হেদায়েত, কাশফ ও গায়েবী ইলম হাসিল হতে থাকে।

সাবেকীনদের উভয় শ্রেণী দুটো ব্যাপারে একমত। ১। তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে।

২। তাদের স্বভাব প্রকৃতি খুবই শক্তিশালী হয়। তাদের উদ্দিষ্ট মর্যাদার স্তর তাদের সামনে যথাযথভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। কিন্তু তার আকার-প্রকারের দিকে তাদের নজর থাকে না। সেটা তার প্রয়োজনও ভাবে না। সেটা তাদের দেখা প্রয়োজন হয় মর্যাদার রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্যে। কারণ, তার মাধ্যমেই উদ্দিষ্ট বস্তু রূপ ধারণ করে।

সাবেকীনদের ভেতর একদল থাকে নিঃসঙ্গ ও নির্জন বাসের লোক। তারা অদৃশ্য জগতের দিকে নিবিষ্টচিত্ত থাকে। আল্লাহর জিকির তাদের পার্থিব সব ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তাদের ছাড়া অপর দলটি হলো সিদ্দীকদের। তারা আল্লাহ তাআলার কঠোরতম অনুসারী। অন্য একাগ্রতা ও ইখলাসের কারণে তারা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

আরেকটি দল হলো শহীদদের। তারা মানুষের পথিকৃৎ হয়ে জন্ম নেন। তাদের উপরে সর্বোচ্চ পরিষদের এ প্রভাব প্রতিফলিত হয় যে, তারা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর ও মারমুখী এবং মোমেনদের ব্যাপারে কোমল ও দয়ার্দ্র হন। পাপ ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে পুণ্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাই তাদের কাজ হয়ে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁর উম্মতদের দুনিয়ার বুকে বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম চালিয়ে থাকেন। এমনকি কিয়ামতেও তারা কাফিরদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিশনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ কারণেই অন্যান্য দলের মোকাবেলায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকতর মর্যাদা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

আরেকটি দল হলো সত্য জ্ঞান সমৃদ্ধ মনীষীবৃন্দের। তাঁরা উন্নত মানের জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী হন। তাঁরা যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে ইলম ও হিকমতের বাণী শুনতে পেলেন তখন তাদের ভেতর অভাবনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে তাদের অন্তর্জগতে আল্লাহর কিতাবের অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। হযরত আলী (রাঃ) সেদিকেই ইঙ্গিত করে বললেন ঃ আমাকে কিতাবুল্লাহর সেই বুঝ দান করা হয়েছে যা একজন যথার্থ মুসলমানকে প্রদান করা হয়।

অগ্রবর্তীদের একটি শ্রেণী এরূপ যে, তারা ইবাদতের কল্যাণকারীতা খোলা চোখে দেখতে পান। ইবাদতের জোতিতে তাদের আত্মা রঞ্জিত হয়েছে। তাদের আত্মার মণিকোঠায় তার প্রভাব ছড়িয়ে গেছে। ফলে তারা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে মশগুল হন।

তাদের অপর শ্রেণীটি হলো জাহেদদের। তাদের অন্তরে পরকাল বিশ্বাস ও তার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় মজবুত ভিত্তিতে ঠাঁই নিয়েছে। ফলে তারা পার্থিব স্বাদ আহলাদ ও আকর্ষণ অকিঞ্চিৎকর ভেবেছে। তাদের দৃষ্টিতে মানব সমাজ হলো গুরুত্বহীন এক উটের পাল।

অপর একটি শ্রেণী রয়েছেন যারা আম্বিয়ায়ে কিরামের খেলাফত প্রতিষ্ঠার মিশনের উত্তরাধিকারী। তারা সৃষ্টিজগতের ভেতরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। তাদের ইনসাফ গুণটিকে তারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত করেন।

অপর এক শ্রেণীর লোক হচ্ছেন চমৎকার স্বভাবের ও উদার চরিত্রের লোক। তারাই মহানুভব ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত। তারা দান-খয়রাত করেন, বিনয়ী হন ও অত্যাচারীকে ক্ষমা করেন। তারা ফেরেশতা স্বভাবের লোক বিধায় ফেরেশতাদের সাথেও সম্পৃক্ত হন। যেমন হাদীসে আছে যে, কোনো কোনো সাহাবীকে ফেরেশতারা সালাম দিতেন।

এ সব শ্রেণীর প্রতিটি শ্রেণীর ভেতরই প্রকৃতিগত বিশেষ যোগ্যতা বিদ্যমান যাকে জাগ্রত ও সক্রিয় করার জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আহবান পৌছার প্রয়োজন থাকে। তার সাথে সংযোগ ঘটে তার সাধনাগত শ্রমলব্ধ যোগ্যতার। সে যোগ্যতা তাকে শরীআতের পূর্ণ অনুসারী করে তোলে। এ প্রকৃতিগত ও অর্জিত যোগ্যতা মিলে তাকে পূর্ণত্ব দান করে। যে সব মুফহাসীন বা দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন লোক নবুওয়াতের দায়িত্ব পাননি, তারাও সাবেকীন বা অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত হন।

অগ্রবর্তী দলের পরবর্তী শ্রেণীটি হলো আসহাবে ইয়ামীন বা ডান দিকের দল। তাদেরও কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে।

তাদের একটি শ্রেণীতে তারা রয়েছে যাদের অন্তর ও আত্মা সাবেকীনদের কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। তাদের প্রকৃতিগত যোগ্যতা লাভের সৌভাগ্য হয়নি বলেই তারা আত্মনির্ভর না হয়ে অবয়ব নির্ভর হয়ে থাকে। কিন্তু আত্মার সাথেও তারা সম্পর্ক রাখে।

এক শ্রেণী হলো তাজাজুবদের। তাদের আত্মিক শক্তি দুর্বল ও জৈবিক শক্তি প্রবল হওয়া সত্ত্বেও কঠোর সাধনার সৌভাগ্য ও মনোবল অর্জিত হওয়ায় তারা এ শ্রেণীভুক্ত হতে পেরেছে। তারা সেই জ্ঞান লাভ করে যা নিম্ন পরিষদে পাওয়া যায়। তাদের কারো ভেতর আবার জৈবিক শক্তির দুর্বলতাও পরিলক্ষিত হয়। তাদের ভেতর আল্লাহর জিকর তুফান সৃষ্টি করে। তাদের ইলহাম, ইরাদাত ও তাহারাত পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, বরং সবটাই অপূর্ণভাবে অর্জিত হয়।

এক শ্রেণীকে আহলে ইসতিলাহ্ বলা হয়। তাদের ভেতর নেক স্বভাবের দিকটি খুবই দুর্বল। তদুপরি যদি তার বদ স্বভাবের দিকটি প্রবল হয় এবং যদি সে কঠোর রিয়াজাত অনুসরণ করে চলে তা হলে এ শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে তার জৈবিক দিকটি যদি দুর্বল হয় এবং নিয়মিত বিভিন্ন ওজিফা আদায় করে, তা হলে যদিও তার কাশফ হাসিল না হয়, তথাপি তার অন্তরের মণিকোঠায় সেসব আমলের বরকতে ফেরেশতা স্বভাবের উন্মেষ ঘটে।

এ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের অবস্থা এই যে, তাদের আমলের ভেতর নির্ভেজাল ইখলাসের অভাব থাকে। যেমন তারা সাদকা দেয়, অথচ তা ছাওয়াবের নিয়তে দিলেও প্রকৃতিগত কার্পণ্য থাকায় মনোকষ্ট সহকারে দেয়। তারা নামায পড়ে সমাজের প্রথার খাতিরে, আবার ছাওয়াবেরও আশা রাখে। ব্যভিচার বা শরাবখোরী থেকে তারা কিছুটা খোদার ভয়ে এবং কিছুটা সাহস ও সামর্থ্যের অভাবে বেঁচে থাকে। তাদের আমলগুলো তখনই কবুল হবে যখন দেখা যাবে যে, প্রকৃতিগতভাবেই তাদের অন্তর নির্ভেজাল ইখলাস অর্জনের শক্তি রাখে না এবং তারা অন্যান্য আমলেরও যথারীতি পাবন্দ রয়েছে। কারণ, নেক স্বভাবের যাত্রা শুরুর স্তর হিসেবে এটাকে গণ্য করা যায়। লজ্জা শরম কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধুই কল্যাণের হয়, কোথাওবা দুর্বলতারও লক্ষণ হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লজ্জা সবটাই ভালো। মানে তা দুর্বলতার কারণেই

হোক কিংবা ভালো উদ্দেশ্যে হোক সর্বক্ষেত্রেই লজ্জা প্রশংসনীয়। এ বক্তব্যে আমার পূর্ব অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হলো।

অনেক লোক এরূপ রয়েছে যাদের ওপর কখনোবা উর্ধ্ব জগতের বিজলি বিচ্ছুরিত হয়, অথচ তাদের সেরূপ কোনো যোগ্যতা নেই। এমনও নয় যে, তারা সে খবরই রাখে না, যেমন তওবা ও অনুশোচনাকারী, সংগোপনে জিকির ও ক্রন্দনকারী কিংবা সে ব্যক্তি প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে আদৌ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পাপে জড়িয়ে পড়ে অথবা অসুস্থতা বা বিপদাপদে মন মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে পাপ কাজ করে ফেলে, এসব ক্ষেত্রে তাদের পাপ মাফ করে দেয়া হয়। মোটকথা, আসহাবে ইয়ামীনরা সাবেকীনদের দুটো স্বভাবের একটি হারিয়ে ফেলে ও অন্যটি অনুসরণ করে।

এ শ্রেণীর একটি দলকে বলা হয় আসহাবে আরাফ। তাও আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। এ দলটির লোকের মন মেজাজও ঠিক আছে, লোকও ভালো স্বভাবের কিন্তু তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছেনি। অথবা তাদের ভাষায় এমনভাবে দাওয়াত পৌঁছেনি যা তাদের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে। মানে, দাওয়াতটি অবশ্যই তাদের বোধগম্য ভাষায় সংশয়মুক্তভাবে পৌঁছতে হবে। তারা স্বভাবতই নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজে জড়িত হয় না। তেমনি তারা আল্লাহকে স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করে না। তারা পার্থিব জীবনে সৎভাবে মানুষের সাথে জীবন যাপন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যুর পর তাদের এক অনিশ্চিত অবস্থায় রাখা হবে। শাস্তিও হবে না ছাওয়াবও পাবে না। এ অবস্থায় থেকে থেকে যখন তাদের পাশব প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হবে, তখন তাদের ওপর ঐশী আলোর কোনো একটি অংশের বিকিরণ ঘটবে।

২। দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই যাদের বুদ্ধি অপূর্ণ বা বিকৃত। যেমন শিশু, মাতাল, গেঁয়ো গোলাম এবং এ ধরনের এমন সব লোক যাদের ব্যাপারে সবারই ধারণা যে এরা হিসেবের বাইরে। কারণ তাদের কোনো কিছুতেই পরোয়া নেই এবং কোনো রীতিনীতির আওতায়ই তারা আসে না। মোটকথা, তারা নির্বোধ শ্রেণী। তাদের ভেতর মৌলিক ঈমানই যথেষ্ট। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা হাবশী দাসীকে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ কোথায় আছেন? সে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল।

এ ধরনের লোকদের থেকে এতটুকুই আশা করা যায় যে, তারা মুসলিম সমাজে মিলেমিশে থেকে তাদের মতোই জীবন যাপন করে। ফলে তাদের তাওহীদী ঈমান বহাল থাকে। পক্ষান্তরে যারা খারাপ অভ্যেস গড়ে তোলে ও ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে বিকৃত ধারণা পোষণ করে, তারা জাহেল। তাদের নানা ধরনের শাস্তি দেয়া হবে।

এর পরবর্তী স্তর হলো মুনাফিকদের। তারা মুখে ঈমানের কথা বলে অথচ কাজ করে তার বিপরীত। তাদেরও কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে।

এ মুনাফিকদের সৌভাগ্য হয়নি ঈমানের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার। হয়ত তাদের পথে প্রকৃতগত পর্দা অন্তরায় হয়েছে। যেমন তারা পনাহার, নারী সম্ভোগ কিংবা হিংসা-বিদ্বেষে এরূপ ডুবে গেছে যে, বাহ্যিক ইবাদত ও ঈমান তাদের কোনোই উপকারে আসেনি। অথবা তারা সামাজিক পরিবেশ ও কুসংস্কারে এরূপ নিমজ্জিত ছিল যে, তাদের রীতিনীতি, বেরাদারী ও দেশের মাটির মায়া ছাড়তে পারেনি। অথবা তাদের বিবেক বুদ্ধির ওপর পর্দা পড়ে যাওয়ায় তারা সত্যের আলো দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন মুতাশাব্বেহ দল। অর্থাৎ যারা খোদাকে কোনো সৃষ্টির অনুরূপ ভাবে। তা ছাড়া যারা ইবাদতে কিংবা মদদ কামনায় আল্লাহর সাথে সংগোপনে অন্যকেও জড়িয়ে ফেলে ভাবে যে, এটা কোনো শিরকের কাজ নয়, তারাও উক্ত শ্রেণীভুক্ত। তাদের যুক্তি হলো, জাতির ধর্মের কোথাও এ সব ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দলীল পাওয়া যায় না। মোটকথা তাদের পূর্বতন শিরক ও কুফরীর আবরণ থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

এদের কিছু লোক দুর্বল চিত্তের পাপাচারী এবং হায়া শরম বলতে তাদের কিছুই নেই। তাই শুধুমাত্র আল্লাহ-রাসূল প্রীতি তাদের পাপ থেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি শরাবও পান করত, আবার আল্লাহ্-রাসূলকেও ভালোবাসত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিলেন, তার আল্লাহ-রাসূল প্রীতি কোনোই উপকারে আসেনি।

অপর একটি দল হলো ফাসেক। এ দলটি তারা যাদের কার্যকলাপ কখনো নীচ প্রবৃত্তির লোকদের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাদের কিছু লোকের জৈবিক চাহিদা খুবই তীব্র থাকে। মোটকথা তারা জীব জানোয়ারের জীবনধারার অনুসারী হয়ে গেছে। কিছু লোক বিকৃত মন-মেজাজ ও ধ্যান ধারণার শিকার হয়ে থাকে। তারা সেই রুগীর মতোই যারা মাটি বা পোড়া রুটি খেতে চায়। মোটকথা তারা শয়তানী কার্যকলাপের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ফাসিকদের পরের স্তরটি হলো কাফিরদের। তারা অত্যন্ত দাম্ভিক ও নাফরমান হয়ে থাকে। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিও ঠিক থাকে, তাদের কাছে দাওয়াতও ঠিকমত পৌঁছে থাকে, তথাপি তারা কালেমা পড়তে অস্বীকার করে। অথবা তারা আল্লাহ্ তাআলার সেই অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করল যা তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে শরীআত আকারে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তারা লোকদের আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। তারা পার্থিব জীবনকেই সন্তুষ্ট চিত্তে বেছে নিয়েছে। পারলৌকিক জীবনের দিকে তাদের আদৌ দৃষ্টি নেই। তাই তাদের ওপর চিরস্থায়ী অভিশাপ এবং তারা অনন্ত কাল জাহান্নামের জিন্দানখানায় আবদ্ধ থাকবে। তাদের একদল কট্টর জাহেল ও অন্যদল ঘৃণ্য মোনাফেক। মোনাফেকরা মুখে ঈমানের দাবিদার হলেও অন্তরে তাদের নির্ভেজাল কুফরী বিদ্যমান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৬৯

অন্যান্য দ্বীন বিলুপ্তকারী দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা

ভূমণ্ডলে যত জাতি ও সম্প্রদায় আছে তাদের নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা কর। দেখতে পাবে, পেছনের অধ্যায়গুলোতে আমি যা কিছু আলোচনা করেছি তার বিন্দুমাত্র তারতম্য কোথাও নেই। খোদার শপথ! কখনো কোথাও তার ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। সব জাতির ভেতর এ জাতি ও ধর্মের প্রবর্তকের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর মর্যাদার প্রতি আস্থা বিরাজমান। তারা তাঁকে পরিপূর্ণ ও অতুলনীয় বলেও মনে করে। কারণ তারা তাঁকে ইবাদাতে অটল দেখতে পায়, তাঁর অলৌকিকত্ব দেখতে পায়, এবং তাঁর প্রার্থনার গ্রহণযোগ্যতার তারা সাক্ষী হয়ে আছে।

মূলত প্রত্যেকটি দ্বীনেই কিছু দণ্ডবিধি, বিধিবিধান ও দণ্ড দানের ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলো ছাড়া জাতির ভেতর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। অতঃপর তাতে এমন কতগুলো ব্যাপার থাকে যেগুলো উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর সহায়ক হয় ও সেগুলো সহজপ্রাপ্য করে। হয়তবা সেগুলোর সাথে অনেকটা সাদৃশ্য রাখে।

প্রত্যেক জাতির একটা রীতিনীতি থাকে, থাকে স্বতন্ত্র বিধি বিধান। তারা তা পালনের জন্যে পূর্বসূরিদের অভ্যেস ও আচরণের অনুসারী হয়। সেক্ষেত্রে তারা জাতির পরিচালক ও দ্বীনের ইমামদের চরিত্র অধ্যয়ন ও অনুকরণ করে থাকে।

তারই ভিত্তিতে তারা তাদের দ্বীনের বুনিয়াদ ও বিধিবিধান মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অবশেষে ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মের সাহায্য করে। এমনকি তা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করে। পরন্তু তার জন্যে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে। তার কারণ এই যে, তার ভেতরে এমন কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা ও মজবুত কল্যাণধর্মীতা প্রতিষ্ঠিত হয় যার তত্ত্ব জানার ক্ষমতা সাধারণ ধর্মাবলম্বীর থাকে না।

যখন প্রত্যেক জাতির ধর্ম স্বতন্ত্র হয়ে যায় এবং তারা নিজ নিজ বিশেষ রীতিনীতি নির্ধারণ করে নেয়, তখন তা রক্ষার জন্য বাকযুদ্ধ থেকে শুরু করে সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত করে থাকে। ফলে পর্যায়ক্রমে তাদের ভিতর অত্যাচার অবিচার বেড়ে যায়। কারণ অযোগ্য ও অপাত্রে নেতৃত্ব এসে যায়। তাছাড়া নতুন নতুন রীতিনীতি তাতে সংযোজিত হয়। ধর্মনায়করা গাফেল ও উদাসীন হয়ে যায়। ফলে অধিকাংশ ধর্মাবলম্বী ধর্মীয় কাজকর্ম ছেড়ে দেয়। অবশেষে তাদের ধর্ম বলতে যে সব নিদর্শন অবশিষ্ট থাকে তা থেকে ধর্মের আসল রূপ জানার কোনো উপায় থাকে না।

তারপর এক জাতি অপর জাতির মুণ্ডপাত করে থাকে ও নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মকে ধর্ম বলেই স্বীকার করে না। এমনকি ধর্মে ধর্মে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। এভাবে সত্যধর্ম বিলুপ্ত হয়ে অধর্মই ধর্ম বলে চলতে থাকে। ঠিক তেমনি মুহূর্তে এমন এক সত্যপথ প্রদর্শকের প্রয়োজন যিনি সব ধর্মের সাথে এরূপ আচরণ করবেন যা এক জালিম বাদশাহর মোকাবিলায় একজন সত্যানুসারী খলীফা করে থাকেন। কালীলা ও দিমনার হিন্দি থেকে ফার্সিতে অনুবাদকারী বিজ্ঞ লেখক বিভিন্ন ধর্মের জগাখিচুড়ি অবস্থা নিয়ে যা আলোচনা করেছেন তাতে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে। তিনি কিছু সঠিক কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু সামান্য কিছুমাত্র বলতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া ইতিহাসকাররা জাহেলী যুগের জাতি ধর্মের যে দুর্গতি সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তাতেও শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে।

যে ইমাম বা মহান নায়ক সব জাতি ধর্মকে একক জাতি ধর্মে রূপান্তরিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে চান, তার জন্যে পুরাতন রীতিনীতি ও বিধিবিধানের বাইরে নতুন কিছু বিধি-বিধানের প্রয়োজন রয়েছে।

১। জাতিগুলোকে তিনি সঠিক রীতি-নীতির দিকে ডাকবেন, তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন। অতঃপর তিনি

তাদের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অবশেষে তিনি দুনিয়াবাসীর সাথে জিহাদ করে সেই মতাদর্শ দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেবেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থাৎ তোমাদের উত্তম জাতি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে গোটা মানবজাতির স্বার্থে। তাদের তোমরা কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করবে ও অকল্যাণ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

আল্লাহ্ পাকের এ উত্তম উম্মত বাছাইয়ের উদ্দেশ্য হলো এই যে, একা সে নায়ক অসংখ্য জাতির বিরুদ্ধে লড়তে পারেন না। এ ধরনের নায়কের জন্যে অপরিহার্য হচ্ছে শরীআতের এমন বিধি বিধান যা আরব আজমের সব দেশের জন্যেই স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ধর্মের রূপ নেবে। শরীআতে সে বিধানগুলো সে সব জাতির সার্বিক বিবেক ও জীবন ধারার অনুকূল হয়ে দেখা দেবে। তাতে অবশ্য অন্যান্য জাতির তুলনায় নিজ জাতির দিকে বেশি নজর রাখা হবে। তারপর সারা দুনিয়ার লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে সে সব বিধান পালনের জন্যে। কারণ এটা হতে পারে না যে, সে কাজটি সকল জাতির দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হবে। সেরূপ করা হলে এ শরীআত পুরোপুরি ব্যর্থতার মুখ দেখবে। তাই এটাও হতে পারে না যে, সেটা সব যুগের ইমামদের জন্য রেখে দেয়া হবে। এও হতে পারে না যে, প্রত্যেক জাতির জ্ঞান বুদ্ধি ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেয়া হবে। কারণ, ব্যক্তি বিশেষের জন্যে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও রীতিনীতি আয়ত্তে আনা অসম্ভব ব্যাপার। এক শরীআত বর্ণনা করতে গিয়েই অধিকাংশ বর্ণনাকারী অপারগ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এত শরীআত কি করে বর্ণনা করে ঠিক রাখা যায়?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, যে কোনো শরীআত ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে বেশ কিছুকাল লেগে যায়। এটা জানা কথা, কোনো নবীরই জীবনকাল তত দীর্ঘ হয় না। আমাদের সামনে যে শরীআত রয়েছে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। শুরুতে খুব কম সংখ্যক ইহুদি ও খ্রিষ্টান ঈমান এনেছে। তারপর আস্তে আস্তে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। অবশেষে তাদের থেকেই অধিকাংশ ঈমানদার সৃষ্টি হলো।

বস্তুত অধিকতর সহজ ও উত্তম পন্থা এটাই যে, শরীআত, দণ্ডবিধি ও জীবন বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই জাতির অভ্যেস ও স্বভাব সামনে রাখা হবে যে জাতির ভেতর নবী প্রেরিত হন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির জন্যেও যেন তা কঠোর ও কষ্টকর না হয় সেদিকেও নজর থাকা প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ, পরবর্তীকালে ঈমান গ্রহণকারী জাতিগুলোর জন্যে তা আদৌ কষ্টকর হবে না তেমনটা নয়।

পূর্ববর্তীদের জন্যে এ শরীআত পালন এ কারণে সহজ হয় যে, তারা তাদের অভ্যেস ও স্বভাবের নিজেরাই সাক্ষী আর তারই আলোকে এ শরীআত এসেছে। পরবর্তীদের জন্যে তা পালন সহজ হতে পারে খোলাফায়ে রাশেদীন ও আইম্মায়ে কেরামের জীবন চরিত আলোচনা ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে। মূলত প্রাচীন ও নবীন সব যুগেই মানুষের স্বভাব এটাই দেখা যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সভ্য এলাকা ও জাতি হিসেবে যাদের পরিচিতি ছিল তারা দুটো বিশাল সাম্রাজ্যে দু'সম্রাটের অধীনে বিভক্ত ছিল।

(১) কিসরা বা পারস্য সাম্রাজ্য। ইরান, ইরাক, ইয়ামান, খোরাসান ও তার আশপাশের এলাকাগুলো এর অধীনে ছিল। এমনকি আফগানিস্তান এবং হিন্দুস্তানও তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মিত কর দিত।

(২) কায়সার বা রোমক সাম্রাজ্য। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, ইতালি ও তার সংশ্লিষ্ট এলাকা নিয়ে এ সাম্রাজ্য গঠিত হয়। তা ছাড়া মিসর, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ এর বশ্যতা স্বীকার করে কর দিত।

এ দুটো বিশাল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা ও তাদের এলাকাগুলো জয় করে নেয়া মূলত গোটা বিশ্ব জয় করে নেয়ার শামিল ছিল। তাদের বিলাস জীবনের প্রভাব তাদের গোটা সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। তাদের সে অভ্যেস বদলে দেয়া আর তা থেকে তাদের বিরত রাখা প্রকারান্তরে গোটা পৃথিবীর দেশগুলোকে সতর্ক করে দেয়া বৈ নয়। অবশ্য পরবর্তীকালে তাদের অবস্থা ভিন্ন রূপ নিয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) যখন অনারবদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে হরমুযানের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন সে সেরূপ ইঙ্গিতই দান করেছিল। তথাপি সার্বিক ধ্যান ধারণায় সুবিন্যস্ত এলাকার লোক কোনোরূপ আপোসের ওপর গুরুত্ব দেয়নি। এ কারণে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন ঃ "তুর্কিরা যতদিন তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকবে, তোমরাও

তাদের থেকে আলাদা থাকবে। পক্ষান্তরে যতদিন আবিসিনিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না নামবে, ততদিন তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।"

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা চাইলেন জাতির অব্যবস্থা দূর করতে আর তার জন্যে তিনি এমন একটি দল গড়ে তুললেন যাদের কাজ হলো পুণ্যকে প্রতিষ্ঠা করা, পাপকে নির্মূল করা ও ভ্রান্ত রীতিনীতিগুলো বদলে ফেলা। এ ব্যাপারটি নির্ভর করছিল উক্ত সাম্রাজ্য দুটোর পতনের ওপর। কারণ, এ দুটোর অবস্থার সাথে মোকাবেলা করলেই সার্বিক অবস্থাটির প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে যায়। মূলত এ দুটো সাম্রাজ্যের অভ্যেস ও রীতিনীতির প্রভাবে অন্যান্য দেশগুলো আচ্ছন্ন ছিল কিংবা তার কাছাকাছি অবস্থায় ছিল।

সে মতে আল্লাহ তাআলা এ দুটো সাম্রাজ্য ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হলো, এরপর আর কোনো খসরু সিংহাসনে বসবে না এবং রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হলো, এরপর আর কোনো রোম সম্রাট ক্ষমতাসীন হবে না। সত্য অবতীর্ণ হয়েছে আর তার প্রভাবে পৃথিবীর বুকে বাতিলের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তাই আল্লাহ তাআলা প্রথমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে দিয়ে আরবের বুক থেকে বাতিলের অবসান ঘটালেন। অতঃপর আরবদের মাধ্যমে উক্ত দুটো সাম্রাজ্যের বুক থেকে বাতিল বিলুপ্ত করলেন। পরিশেষে সেই দুটো সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের দিয়ে অন্য সব দেশের বাতিল দূর করলেন। ওয়ালিল্লাহিল হুজ্জাতুল বালিগা।

৩। উক্ত পথপ্রদর্শক মহান নায়কের জন্যে এটাও একটি মূলনীতি যে, তিনি লোকদের ভেতর দ্বীনের তালীম ব্যাপক করার জন্য খেলাফত পদ্ধতি চালু করবেন। তারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর মিশন অব্যাহত রাখবেন। তারা হবেন পথ প্রদর্শক মহান নায়কের দেশের ও গোত্রের এবং যারা তাঁরই নীতি-আদর্শে লালিত ও অভ্যস্ত। চোখ স্বাভাবিকভাবে কালো হওয়া এক জিনিস আর সুরমা লাগিয়ে কালো বানানো আরেক জিনিস। আসল ও নকল এক হতে পারে না। মূল ইমামের সাথে খলীফাদের দ্বীনি ও নসবী একাত্মতার ফলে তাদের দায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা মিল্লাত প্রতিষ্ঠাতার দায়িত্বের মর্যাদার সমপর্যায়ে পৌঁছে থাকে। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেলেন ঃ খলীফারা হবেন কুরায়েশ বংশ থেকে।

তাছাড়া খলীফাদের দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্যে ওসিয়াত করা হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ "তোমরা এ দ্বীনের ওপর ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন তোমাদের নেতারা সঠিক ও সরল থাকবে।"

৪। তাঁর কাজ হবে এ দ্বীনকে অন্যান্য দ্বীনের ওপর বিজয়ী করবে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সবাইকে এ দ্বীনের অধীন হতে হবে। চাই তারা মর্যাদার সাথে আসুক কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে আসুক। সে মতে মানুষ তিন শ্রেণীর হয়ে যাবে।

(ক) জাহেরে ও বাতেনে পূর্ণমাত্রায় দ্বীনের অনুসারী হবে।

(খ) বিদ্রোহ করার ক্ষমতা না থাকায় বাধ্য হয়ে বাহ্যত দ্বীনের আনুগত্য করবে।

(গ) লাঞ্ছিত কাফের অবস্থায় দ্বীনি হুকুমাতের আনুগত্য মেনে নেবে। দ্বীনের ইমাম তাদের চতুষ্পদ জীবের মতো ক্ষেত খামারের ও বোঝা বহনের কাজে লাগাবেন এবং তাদের ওপর লাঞ্ছনার জিঞ্জির আরোপ করবেন।

সকল দ্বীনের ওপর একটি মাত্র দ্বীনের প্রাধান্য লাভের কয়েকটি কারণ দেখা যায়।

১। সব ধর্মের নিদর্শনাবলির ওপর নিজ ধর্মের নিদর্শনগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। ধর্মীয় নিদর্শনাবলি একটি প্রকাশ্য ব্যাপার যা প্রত্যেক ধর্মের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রূপে বিরাজ করে। ফলে যে ধর্মের কাজগুলো উত্তম বিবেচিত হয় তার প্রবর্তক সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। যেমন ইসলামের নিদর্শনাবলির ভেতর রয়েছে খতনা করা, মসজিদের মর্যাদা দান, আজান প্রবর্তন, জুমআর নামায চালু করা, জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ইত্যাদি।

২। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় যেন তারা তাদের ধর্মের ব্যাপারগুলো প্রকাশ্যে খোলা ময়দানে প্রচার করে না বেড়ায়।

৩। কিসাস ও দিয়াতের ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের একই মর্যাদা না পায়। তেমনি বিয়ে-শাদি ও রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্বে কাফের ও মুসলামান যেন সম অধিকার ও মর্যাদা না পায়। এ সব বিধি-নিষেধের ফলে যেন তারা ঈমান গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়।

৪। লোকদের পুণ্য কাজ করতে ও পাপ কাজ ছাড়তে বাধ্য করা হবে। অন্তরে যার যাই থাক না কেন বাহ্যত সে বিধানগুলো মেনে চলতে বাধ্যতামূলকভাবে অভ্যস্ত করতে হবে। শরীআতের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে কাউকে

স্বাধীনতা দেয়া যাবে না। শরীআতের রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান গোপন রাখতে হবে এবং শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমদের ভেতর তার চর্চা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কারণ, জনসাধারণ না তা জানে আর না তা জানার ক্ষমতা রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিধানগুলোর কল্যাণকারিতা তুলে ধরার বিধিবদ্ধ পদ্ধতি স্থির না হবে এবং তা উপলব্ধি করার যথেষ্ট লোক তৈরি না হয় ততক্ষণ উক্ত নীতিই চালু থাকবে। কারণ, তার আগে প্রকাশ করতে গেলে জ্ঞানের গভীরতার অভাবে জনসাধারণের ভেতর প্রচুর মতানৈক্য ও বিতর্ক দেখা দেবে। যদি শরীআতের কোনো ব্যাপারে তাদের অবকাশ দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, এ বাহ্যিক কাজটি তো আসল লক্ষ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো অন্তরের পরিবর্তন, তা হলে তাদের ভেতর জল্পনা কল্পনা বেড়ে যাবে এবং বাহ্যিক কাজ এড়াবার জন্যে একদল লোক যুক্তিতর্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ পাকের তা আদৌ কাম্য নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৫। এটাও একটা কথা যে, শুধু তরবারির জোরে দ্বীনকে বিজয়ী করতে গেলে মানুষের মনে খটকা থেকেই যাবে। তাতে এ সংশয় থেকে যায় যে, কোনো সুযোগে তারা কুফরের দিকে ফিরে যাবে। এ জন্যে জরুরি হলো যে, নেতা অখণ্ডনীয় মজবুত দলীল প্রমাণ দ্বারা লোকদের সামনে এ দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরবেন এবং জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের সর্বতোভাবে প্রভাবিত করবেন। সাথে সাথে অন্যান্য দ্বীন বিভিন্ন কারণে যে অনুসরণযোগ্য নয় তাও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রথমতঃ যেসব দ্বীনের বিধানগুলো কোনো নিষ্পাপ লোকের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ধর্মের বিধানগুলো একটি জাতির সার্বিক জীবন ব্যবস্থা হতে পারে না। তৃতীয়তঃ অন্যান্য ধর্মীয় বিধানে যথেষ্ট বিকৃতি এসে গেছে। ফলে মূল বিধান থেকে তা অনেক দূরে সরে গেছে।

পক্ষান্তরে লোকদের ভেতর এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা চাই যে, এ দ্বীনই সঠিক, সহজপ্রাপ্য ও নির্ভেজাল দ্বীন। এর বিধি বিধান সুস্পষ্ট এবং বিবেক বুদ্ধি এর যথার্থ তা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। এ দ্বীনের অস্পষ্ট বিষয়গুলোও দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এর পদ্ধতি ও রীতিনীতিগুলো মানবজাতির জন্যে সর্বাধিক কল্যাণকর। তা ছাড়া অতীতের আম্বিয়ায়ে কেরামের যে সব জীবনচরিত আজ পর্যন্ত বিদ্যমান তার সাথে এ দ্বীনের সামঞ্জস্য রয়েছে সর্বাধিক।

মোটকথা, এ সব কথা লোকদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা চাই। তা হলেই এ দ্বীনের এককত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারও কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না।

অধ্যায়-৭০

বিকৃতি থেকে দ্বীনের সংরক্ষণ

মানব জাতির শান্তি-শৃঙ্খলার শ্রেষ্ঠতম বিধান নিয়ে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে যে মহান ব্যক্তিত্ব অবতীর্ণ হয়ে অতীতের সব ধর্মমত বাতিল করে দেন, তাঁর জন্যে এটা অপরিহার্য যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন যাতে কোনোরূপ বিকৃতি না আসতে পারে। কারণ, তিনি বিভিন্নমুখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে চান। অনেক সময় লোকদের মনে ফেলে আসা ধর্মের কিছু কিছু ব্যাপারের প্রতি আসক্তি থেকে যায় কিংবা তাদের মনের খেয়াল খুশি অথবা স্বল্প বুদ্ধির কারণে ছোটখাটো সাধারণ ব্যাপারকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে বসে। ফলে তার ভেতরে তাদের দৃষ্টিতে বেশ কিছু কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে তারা দ্বীনের সুপ্রমাণিত কার্যাবলি উপেক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং যা দ্বীনের কাজ নয় তা তার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। পরিণামে দ্বীনের ভেতর বিকৃতি দেখা দেয়। আমাদের অতীতের দ্বীনগুলো এভাবেই বিকৃতির শিকার হয়েছে।

দ্বীনের বিকৃতি ও বিচ্যুতির সব রাস্তা বন্ধ করা কঠিন। কারণ, তা আগে ভাগেই নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। যেহেতু তার সব রূপ আগে থেকে জানা যায় না, তাই তা বন্ধ করা যায় না। তাই এ থেকে জরুরি হচ্ছে সামগ্রিকভাবে বিকৃতি সম্পর্কে সবাইকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া এবং যে সব মাসআলার ব্যাপারে বিকৃতির আশংকা থাকে, সেগুলোকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া। তারপর বলে দেয়া যে, এসব পথেই বনি আদমের ঔদাসিন্যের কারণে বিকৃতি প্রবেশ করে থাকে। মোটকথা বিকৃতি ঢোকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও পূর্ণরূপে বন্ধ করে এরূপ কিছু ব্যবস্থা চালু করতে হবে যা অন্যান্য বাতিল ধর্মানুসারীদের অতিপ্রিত অভ্যেস ও রীতিনীতির পরিপন্থী হয়। যেমন, নামাযের রীতিনীতি ও পদ্ধতি। বস্তুত তাদের অতি পরিচিত নামায বা উপাসনা পদ্ধতির সাথে এর আদৌ মিল নেই।

বিকৃতির অন্যতম কারণ হলো ধর্মনায়ক ও ধর্মানুসারীদের ঔদাসিন্যতা। তা এভাবে হয় যে, সাহাবা ও হাওয়ারীনদের পরবর্তী স্তরে এমন লোকও আসে যারা নামাযই পড়ে না। পক্ষান্তরে তারা বাসনা-কামনা চরিতার্থের জন্যে লাগাম হীনভাবে ছুটে বেড়ায়। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের গুরুত্ব তারা দেয় না। অর্থাৎ দ্বীন

শেখা, শেখানো ও আমল করা যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটাই তারা বুঝে না। তারা নেক কাজের নির্দেশ দেয় না, বদ কাজ থেকে ফিরিয়েও রাখে না। এ অবস্থায় সে সমাজে দ্বীনের পরিপন্থী রীতিনীতি চালু হয়ে যায়। এমনকি শরীআতের পরিপন্থী অভ্যেস ও মন মেজাজ সৃষ্টি হয়। এর পরবর্তী স্তরে এমন লোকও আসে যারা এর চাইতেও উদাসীন হয়। অবশেষে বেশির ভাগ দ্বীনের জ্ঞান তাদের বিলুপ্ত হয়। এক্ষেত্রে জাতির নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য লোকদের ঔদাসিন্য বেশি ক্ষতিকর হয়। এমনকি তাদের দ্বারাই বেশি বিকৃতি চালু হয়। এ কারণেই হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উম্মত বরবাদ হয়েছে। আজ দুনিয়াতে কেউই তাদের ধর্মমত সম্পর্কে কিছু জানে না। ঔদাসিন্য সৃষ্টির কয়েকটি কারণ থাকে।

এক : জাতির প্রতিষ্ঠাতা থেকে ধর্মের বিধি-বিধানগুলোর বর্ণনা অব্যাহত না রাখা এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা না থাকা, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সাবধান! কোনো এক ভোজনবিলাসী ব্যক্তি ঘোষণা করবে, শুধু কুরআনের ওপর দৃঢ় থাক। কুরআনে যা হালাল পাবে তাই খাবে আর যা হারাম দেখবে শুধু সেটাই বাদ দেবে। অথচ আল্লাহর রাসূল যেটাকে হারাম বলেছেন সেটাও আল্লাহর হারাম বলারই নামান্তর মাত্র।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক মানব জাতি থেকে দ্বীনের জ্ঞান ছিনিয়ে নেবেন না, দ্বীনি জ্ঞানের আলেমদের তুলে নেবেন। এমনকি অবশেষে একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবেন না। তখন জনগণ মূর্খদের নেতা বানাবেন। অতঃপর লোক তার কাছে মাসআলা জানতে চাইবে। অগত্যা সে বিদ্যা ছাড়াই ফতোয়া দেবে। ফলে সে যেমন গোমরাহ, লোকদেরও তেমনি গোমরাহ বানাবে।

ঔদাসিন্যের আরেকটি কারণ হয়, অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাও তার জন্যে দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন বাদশাহকে খুশি করে কার্যসিদ্ধির জন্যে আয়াতের মতলবী ব্যাখ্যা শুনানো হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ

بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا - أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَا

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের বিধান গোপন করে নগণ্য পয়সার বিনিময়ে তারা তা দিয়ে যা কিছু আহার উদরস্থ করে তা আগুন ছাড়া কিছুই নয়।

ঔদাসীন্যের আরেকটি কারণ হলো, পাপাচার ব্যাপক হতে থাকে, অথচ ওলামায়ে কেরাম বাধা দেয় না।

তাই আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ـ

অর্থাৎ অনন্তর তোমাদের পূর্ববর্তী যুগসমূহের মতো কেন হবে না, যখন সে সব যুগে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দিত, তখন অন্তত নগণ্য সংখ্যক জ্ঞানীগুণী তাতে বাধা দিত। আমি তাদের নাজাত দিয়েছি। পক্ষান্তরে যারা জালিমদের ধন সম্পদের লোভে তাদের অনুসারী হয়েছে তারা ছিল পাপাচারী।

বনী ইসরাঈলরা যখন নাফরমানীতে নিমজ্জিত হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তাদের আলেমরা শুরুতে বাধা দিয়েছিল। পরে তারা তাদের মজলিসে যেত, তাদের সাথে খানাপিনায় শরিক হতো। ফলে আল্লাহ তাদের পরস্পরকে সহায়করূপে একাকার করে দিলেন এবং হযরত দাউদ (আঃ) ও ঈসা ইবনে মরিয়াম (আঃ)-এর মুখে তাদের অভিশপ্ত করলেন। কারণ, তারা নাফরমান হয়েছিল এবং সীমা অতিক্রম করেছিল।

দ্বীনের ভেতর বিকৃতি আসার এও একটি কারণ যে, দ্বীনের বিধান সম্পর্কে অহেতুক গবেষণা করা। তা এভাবে ঘটে যে, শরীআত প্রণেতা কোনো কাজের নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন। উম্মতের কোনো এক ব্যক্তি তা শুনতে পেয়ে নিজের বুঝমতো এমন এক কাজ করল বা ছাড়ল যা নির্দিষ্ট কাজটির সাথে সাদৃশ্য রাখে কিংবা যে সব কারণে তার নির্দেশ বা নিষেধ এসেছে তার কিছু কারণ গবেষক লোকটির কাজেও বিদ্যমান। অথবা উক্ত গবেষক শরীআত প্রণেতার নির্দেশটিকে নির্দিষ্ট বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর কোনো একটির সংঘটন ও কার্যকরণের ভিত্তিতে স্থির করে নেয়। যখন কোনো নির্দেশ বর্ণনার পরস্পর বৈপরীত্যের কারণে তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, তখন সে সেটাকে অপরিহার্য করে নেয় ও ওয়াজিব ধরে নেয়। সে লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কৃত প্রতিটি কাজকে ইবাদত মনে করে। অথচ তার কিছু কাজ ছিল অভ্যেসগত। সে লোকের ধারণা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যেসগত কাজও শরীআতের নির্দেশ-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ঘোষণা করে বেড়ায় যে, আল্লাহ পাক এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা ওটা করতে নিষেধ করেছেন।

তেমনি একদল এরূপ বুঝে নিয়েছে যে, সেহ্‌রী খাওয়া শরীআত বিরোধী কাজ। কারণ, সেটা নফস দমনের পরিপন্থী কাজ। তারা এও বুঝে নিয়েছে, রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া হারাম। কারণ, তা সহবাসের কারণ ও উপকরণ হয়ে থাকে। তাদের মতে চুমু ও সহবাস দুটোই যৌনক্ষুধা চরিতার্থে সম পর্যায়ের; অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাড়াবাড়ির কুফল বলে দিয়েছেন এবং এ সবকেও তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে বিকৃতি বলে আখ্যায়িত করেন।

কড়াকড়িও ধর্মে বিকৃতি আসার অন্যতম কারণ। তা এভাবে ঘটে যে, ইবাদতের কাজে এমন অসহনীয় কষ্টকর পন্থা অনুসরণ করা যা শরীআত প্রণেতা বলেননি। যেমন বছর ঠিকা রোযা রাখা, অহরহ নামায পড়া, দুনিয়া ত্যাগ করা, বিয়ে না করা এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের মতো অনুসরণ করা ইত্যাদি। হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) যখন এরূপ কঠিন পরিশ্রমের ইবাদত শুরু করতে চাইলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, "দ্বীন নিয়ে যারা অহেতুক মাথা ঘামাবে, দ্বীন তাদের গ্রাস করবে।" যখন এ ধরনের কড়া ইবাদতগুজার ব্যক্তি কোনো সমাজের ওস্তাদ বা ইমাম হন, তখন লোকজন মনে করে এটাই শরীআতের নির্দেশ এবং এ পথেই শরীআতদাতার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। ইয়াহুদি ও নাসারা দরবেশরা এ ব্যাধিরই শিকার হয়েছিল।

দ্বীন তাহরীফের আরেকটি কারণ ইস্তেহসান। তার তত্ত্বকথা এই যে, কেউ হয়ত শরীআত প্রণেতাকে দেখতে পেল যে, তিনি শরীআত প্রদানের বেলায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করেছেন। ফলে শরীআতের পথ সুগম হয়েছে। আমিও শরীআতের এরূপ কলা-কৌশল ও কল্যাণধর্মীতা সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি। এখন সেই লোক শরীআত জারি করতে গিয়ে নিজেই আজকের পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে তাতে কিছু তারতম্য ঘটিয়ে চলল। যেমন ইহুদিরা দেখতে পেল, শরীআত প্রণেতা মানুষকে সংশোধনের জন্যে বিভিন্ন দণ্ডবিধি প্রদান করেছেন। এক্ষণে সে দেখতে পেল, পাথর মেরে হত্যা করার বিধান চালাতে গেলে উম্মতের ভেতর মতানৈক্য ও ঝগড়া ফাসাদ দেখা দেয়। তাই তারা ফতোয়া দিল, মুখে কালি মেখে কয়েক ঘা কোড়া লাগালেই চলবে। হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তাদের সু-স্পষ্ট তাহরীফ ও তাওরাতে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী এক মনগড়া বিধান।

ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম কিয়াস করছে ইবলিশ। এই কিয়াসের সাহায্যেই চাঁদ-সুরুজের পূজা করা হয়েছে।

হযরত আল হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

অর্থাৎ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।

অতঃপর তিনি বলেন, সর্বপ্রথম কিয়াস করেছে ইবলিস। হযরত শাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন– আল্লাহর কসম! তোমরা যদি কিয়াস চালাতে থাক তো হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে ফেলবে।

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : লোকদের মাঝে কুরআন এরূপ প্রসার লাভ করবে যে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই তা পাঠ করবে। তখন এক লোক বলবে, আমি এত কুরআন পড়লাম, অথচ লোকজন আমাকে মান্য করছে না, আল্লাহর কসম! এবারে আমি কুরআনের ওপর পুরোপুরি আমল করব। তা হলে হয়ত লোকজন আমাকে মান্য করবে। তারপর সে তাই করবে। তথাপি লোকজন তাকে মান্য করবে না। তখন সে বলবে, আমি বেশি বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করলাম, পুরোপুরি কুরআন আমল করলাম, তবুও লোকজন আমাকে মানছে না। এবারে আমি আমার ঘরে মসজিদ বানাব। তা হলে হয়ত সবাই আমাকে মানবে। অতঃপর সেই তাই করবে। তথাপি লোকজন তার অনুগত হবে না। তখন সে বলবে, আমি কুরআন তিলাওয়াত করলাম, তার ওপর আমল করলাম, এমনকি আমার বাড়িতে মসজিদ বানালাম, তথাপি লোকজন আমার অনুসারী হলো না। এবারে আমি এমন হাদীস বানিয়ে তাদের সামনে পেশ করব যা তারা আল্লাহর কুরআনে পাবে না, রাসূলের হাদীসেও পাবে না। তাহলে হয়ত লোকজন আমার অনুসারী হবে। হযরত মাআজ (রাঃ) বলেন : এভাবে সে মনগড়া হাদীস পেশ করবে; তার থেকে বেঁচে থেকো। কারণ, সে যা বর্ণনা করবে তা সুস্পষ্ট গোমরাহী।

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আলেমের পদস্খলন, মুনাফিকদের আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি, গোমরাহ নেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের ভুল নির্দেশনা ও ভ্রান্ত পরিচালনা ইসলামকে ধ্বংস করবে।

এ সবগুলো বর্ণনায় বক্তব্য একটি। তা হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কিয়াস সুস্পষ্ট গোমরাহী।

তেমনি ইজমার অন্ধ অনুসরণও তাহরীফের কারণ হয়ে থাকে। তার তত্ত্বকথা হলো এই, কোনো এক যুগের দ্বীনের ধারক ও বাহকদের অধিকাংশ কোনো একটি মাসআলায় একমত হয়ে গেল। সর্বসাধারণ ভাবল, অধিকাংশের ইজমা হকের ওপরই হয়। এটা আসলে ঠিক নয়। তাদের দেখা উচিত, যে মাসআলায় তারা একমত হয়েছে কুরআন-সুন্নায় তার সপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলীল রয়েছে কি-না। সুতরাং এ সব ইজমা সেই ইজমা নয় যার ওপর উম্মত একমত হয়েছে এবং যার প্রমাণ কুরআন-সুন্নায় বিদ্যমান। মূলত কুরআন ও সুন্নাহর কোনো একটিতে যার সুস্পষ্ট সমর্থন মিলে না সেরূপ ইজমা নাজায়েয।

এ ধরনের ভ্রান্ত ইজমার অনুসরণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ـ

অর্থাৎ যখন লোকদের বলা হলো তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখেছি তার ওপরই বিশ্বাসী হব।

ইহুদিরা হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত এজন্যে অস্বীকার করেছে যে, তাদের পূর্বসূরিরা তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেয়েছেন, তাদের ভেতর নবী হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায়নি। নাসারাবাদের নিকট নবী হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। অথচ সে সব শর্ত তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শর্তের পরিপন্থী। তাদের কাছে পূর্বসূরিদের ইজমাই বড় দলীল।

তাহরীফের আরেকটি কারণ হচ্ছে নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্য কারো অন্ধ আনুগত্য করা। একমাত্র নবীই নিষ্পাপ। তিনি ছাড়া আর কারো অন্ধ আনুগত্য চলে না। এর সার কথা হলো এই, উম্মতের আলেমদের কেউ একটি মাসআলা

ইজতেহাদ করে চালিয়ে দিলেন। তার অনুসারীরা ভাবল, এত বড় আলেম যা বলছেন তা নির্ভুল। এমনকি তার বিরুদ্ধে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পেলেও তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। এ ধরনের তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের পক্ষে উম্মতের কখনো মতৈক্য ছিল না। কারণ, উম্মত তো সে সব মুজতাহিদের তাকলীদের ওপর একমত হয়েছে যাদের ইজতেহাদের দলীল কুরআন-সুন্নায় বিদ্যমান। উম্মত এ ব্যাপারেও একমত যে, মুজতাহিদের ইজতিহাদ কোথাও ঠিক হয়, কোথাও ভুল হয়। তাই এটা সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইজতেহাদী কোনো মাসআলার বিপক্ষে যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস পাওয়া যায় তা হলে তা বর্জন করতে হবে এবং হাদীস অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ তারা তাদের আলেম ও পীরদের আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।

এ আয়াত প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মূলত তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর-আলেমদের ইবাদত করত না। তবে পীর-আলেমরা যেটাকে হালাল বলত সেটাকেই তারা হালাল ভাবত আর যেটাকে হারাম বলত সেটাকেই হারাম ভাবত।

তাহরীফের আরেকটি কারণ হলো এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের এরূপ সংমিশ্রণ যার ফলে এমনকি দুটোর ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় না। ব্যাপারটি এভাবে ঘটে যে, মানুষ কোনো এক ধর্মে থাকে। স্বভাবতই সে ধর্মের বিধিবিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা মজ্জাগত হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে নতুন ধর্মমত গ্রহণ করে তখন তার ভেতরে পুরনো ধর্মের কিছুটা আকর্ষণ থেকে যায় বিধায় গৃহীত ধর্মের ভেতর তার বৈধতা খুঁজে থাকে। ফলে কোনো মওজু বা দুর্বল বর্ণনাও যদি তার সপক্ষে দেখতে পায়, সেটাকেই আশ্রয় করে তার পুরনো অভ্যেসকে বৈধ ভেবে চলে, এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"বনী ইসরাঈলদের কাজ শুরুতে ঠিক ছিল। অবশেষে তাদের ভেতর বিভিন্ন গোত্র ও কয়েদীদের সংমিশ্রণ ঘটল। অতঃপর মিশ্রিত জাতির বংশধররা খেয়ালখুশিমত ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে লাগল। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হলো ও অন্যান্যদের পথভ্রষ্ট করল।"

আমাদের দ্বীনের ভেতরেও বনী ইসলাঈরদের বিদ্যা, জাহেলী যুগের ওয়ায়েজিনদের ওয়াজ, গ্রিক দর্শন ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রভাব ও তাদের ঐতিহ্য এবং রোমকদের জ্যোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ও রাশিশাস্ত্র ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটেছে। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাওরাত পাঠ করা হলো, তখন তিনি এ কারণেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) একই কারণে হযরত দানিয়েল (আঃ)-এর কিতাব সন্ধানকারীকে প্রহার করেছিলেন।

অধ্যায়-৭১

দ্বীনে মুহাম্মদী ও ইয়াহুদি-নাসারার দ্বীনে পার্থক্য সৃষ্টির কারণ সমূহ

জানা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির কাছে তাঁর রাসূল পাঠান তখন সেই রাসূল তাঁর মাতৃভাষায় দ্বীন কায়েম করেন এবং তাতে তিনি কোনোরূপ অস্পষ্টতা বা ত্রুটি রেখে যান না। পরবর্তী স্তরে তাঁর থেকে বর্ণনার ধারা চলতে থাকে এবং তাঁর উম্মতদের ভেতর তাঁর সহচর ও সহযোগীরা সেভাবেই দ্বীন উপস্থাপন করেন সেভাবে তা করা উচিত। এভাবে একটি পর্যায় পর্যন্ত দ্বীনের ধারক ও বাহকরা দ্বীনের ব্যাপারগুলো যথাযথভাবে চালাতে থাকেন। তারপর এমন একদল অবাঞ্ছিত লোক আসে যারা দ্বীনের ভেতর বিকৃতি ও বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। তখন আর সত্য দ্বীন নির্ভেজাল থাকে মা, বরং তাতে অসত্যের সংমিশ্রণ ঘটে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"আল্লাহ পাক যে জাতির ভেতরে কোনো নবী পাঠান তাদের ভেতর থেকে তার একদল সহায়ক ও সহচর হয়ে থাকেন। যারা তার সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হন এবং তার সব বিধি বিধান অনুসরণ করেন। পরবর্তী স্তরে গিয়ে এমন কিছু অবাঞ্ছিত লোক আসে যারা বলে এক রকম, করে অন্য রকম এবং যে কাজ তাদের বলা হয়নি তাই করে।"

বাতিল কয়েক শ্রেণীকে বিভক্ত ঃ

১। প্রকাশ্য শিরক ও সরাসরি বিকৃতি। তারা এ কাজের জন্যে সর্বাবস্থায় পাকড়াও হবে।

২। অপ্রকাশ্য শিরক ও অদৃশ্য বিকৃতি। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাদের তখন জবাবদিহি করবেন যখন তাদের কাছে নবী পাঠিয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি ও

প্রমাণ পূর্ণ করবেন এবং তাদের সামনে হক ও বাতিল সুস্পষ্ট করে দেবেন। ফলে যেন যারা নিস্তার পেতে চায় তারা দলীল সহকারে নিস্তার পেতে পারে এবং যারা হালাক হতে চায় তারাও দলীল সহকারে ধ্বংস হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা যখন তাদের ভেতর নবী পাঠান, তখন তাদের যত সব বিকৃতি ও বিচ্যুতি তা ঠিকঠাক করে মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যদি তাদের ভেতর পূর্বের কোনো শরীআত্ত থেকে থাকে তা হলে তার যে সব বিধানে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটেনি এবং ইবাদত ও সমাজ জীবনের যে সব রীতিনীতি সঠিক পাওয়া যায় সেগুলো তিনি বহাল রেখে তার গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে দেন ও সে সবের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। পক্ষান্তরে তার ভেতর যা কিছু বিচ্যুতি ও বিকৃতি এসেছে তা বিলুপ্ত করেন এবং বলে দেন, এগুলোর দ্বীনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

অতঃপর যে সব বিধান পারিপার্শ্বিকতার কারণে তখনকার জন্যে কল্যাণকর বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে মানব প্রকৃতির পরিবর্তনের কারণে সেগুলো পরিবর্তি হয়। কারণ, বিধানের আসল উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন। স্থান, কাল, পাত্রের পরিবর্তনে বিধানের কল্যাণকারিতায় পরিবর্তন সাধিত হয়। এ কারণেই বিধানের সাথে পারিপার্শ্বিকতারও উল্লেখ থাকে। কখনো কোনো অবস্থা সৃষ্টির জন্যে কিছু কিছু ব্যাপার কারণ হয়ে থাকে। পরবর্তীতে দেখা যায় অন্য কোনো কারণে সে অবস্থা দেখা দিয়েছে। যেমন, সর্দি গর্মির সংমিশ্রণে জ্বর সৃষ্টি হয়। আবার দেখা যায়, অন্য সময় অন্য কোনো কারণে জ্বর দেখা দেয়। ডাক্তার আগে কারণ নির্ণয় করে জ্বরের প্রতিষেধক প্রদান করেন। ফলে দেখা যায়, একই জ্বরের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রদত্ত হয়। তাছাড়া যে সব বিধানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরিষদে মতৈক্য রয়েছে এবং লোকদের ভেতর যে কাজগুলো অভ্যেসগত ও সুদৃঢ় হয়েছে ও তাদের অন্তরের গভীরে দানা বেঁধেছে, সেগুলো আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়।

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে যত আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছেন, তাঁরা বিধান কিছু কিছু বাড়িয়েছেন, কিন্তু কমাননি মোটেও। তাছাড়া খুব কমই পরিবর্তন করতেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর দ্বীনের সাথে কুরবানি ও খাতনা সহ কয়েকটি বিষয়ের সংযোগ ঘটিয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের সাথে কয়েকটি বিষয় সংযোগ করেছেন। যেমন উটের গোশত হারাম করা, ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা ও শনিবারকে সপ্তাহের সম্মানিত দিন বলে ঘোষণা

করা। তবে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধান বাড়িয়েছেন, কমিয়েছেন এবং বদলিয়েছেনও। কোনো সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যখন শরীআতের বিধানের গভীরে অনুসন্ধান চালাবে তা হলে সেই বাড়ানো, কমানো ও পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ দেখতে পাবে।

১। ইয়াহুদি ধর্ম তাদের যাজকদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তারা পূর্বোল্লেখিত পন্থায় তাতে তাহরীফ বা বিকৃতি ঘটিয়েছে। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদার্পণ করলেন, তখন তিনি প্রত্যেকটি বিধানকে বিকৃতিমুক্ত করে যথার্থ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে ইয়াহুদি ধর্ম মানুষের সামনে ছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন এ কারণেই তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেল। তাই ইয়াহুদিরা বলছিল, এ নতুন দ্বীনে এটা বাড়ানো হয়েছে, ওটা কমানো হয়েছে আর এগুলো বদল করা হয়েছে।

২। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হিসেবে আবির্ভাব দ্বৈত আবির্ভাবের শামিল। তিনি প্রাথমিকভাবে বনী ইসমাঈলের কাছে প্রেরিত হন।

তাই স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ ـ

অর্থাৎ তিনিই উম্মীদের কাছে তাদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ তুমি যেন সেই জাতিকে সতর্ক কর যাদের বাপদাদাকে কেউ সতর্ক করেনি বলে তারা উদাসীন রয়েছে।

এই প্রাথমিক প্রেরণের লক্ষ্য যেহেতু বনী ইসমাঈল, তাই বনী ইসমাঈলের কাছে যে বিকৃত দ্বীনে ইবরাহিমী ছিল তা সামনে রেখে তাদের অভ্যেস, ইবাদত ও জীবন পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্য নিয়েই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীআত প্রণীত হয়েছে। যারা এ পরিবেশ ও পরিভাষার সাথে পরিচিত নয় তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের অবতরণ নয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ কুরআন আরবিতে নাযিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পাও।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ -

অর্থাৎ যদি আমি অনারবের ভাষায় কুরআনকে রূপ দিতাম তাহলে তারা বলত কেন আলাদা আলাদা ভাষায় আয়াতগুলো বিশ্লেষিত হলো না। আরবদের জন্যে অনারবের ভাষা?

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ -

অর্থাৎ আমি এমন কোনো নবী পাঠাইনি যে তার জাতির ভাষায় গ্রন্থ পায়নি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরণের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো সমগ্র বিশ্ববাসী। সে বিধানগুলো হলো মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান ও কলা কৌশল সম্বলিত। তার কারণ হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কতিপয় জাতির ওপর অভিসম্পাত নাযিল হয় এবং তাদের সাম্রাজ্য পারস্য ও রোম ধ্বংসের ফয়সালা হয়। এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার চতুর্থ স্তর পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ জারি হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও বিজয়কে উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের কারণ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সম্রাটদের কোষাগারের চাবিগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে সোপর্দ করা হয়। বস্তুত তাঁর এ সাফল্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাওরাতের বিধান ছাড়া অন্যান্য বিধান তাঁকে দেয়া হলো। যেমন– খেরাজ, জিযিয়া, কাফেরদের সাথে জেহাদ ও বিধান বিকৃতির কারণসমূহ থেকে মুক্ত থাকা।

৩। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চরম এক শূন্যতার যুগে পাঠানো হয়। তখন সব সত্যধর্মই বিলুপ্ত হয়েছিল। সেগুলোয় দেখা দিয়েছিল চূড়ান্ত বিকৃতি। মানুষের ভেতর তখন জাতি ও গোত্রগত হিংসা ও বাড়াবাড়ি ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। এ কারণেই মানুষ তাদের বিকৃত দ্বীন ও জাহেলী কুসংস্কার বর্জন করতে পারছিল না। তাই জিহাদের মাধ্যমে শক্তভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী বিরোধ বিসম্বাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

অধ্যায়-৭২

আয়াতের বিলোপ সাধন ও পরিবর্তনে কারণসমূহ

মানসুখ তথা কোনো আয়াতের বিলোপ সাধন ও তার পরিবর্তে অন্য আয়াত প্রদান সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَانَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِثْلِهَا ـ

অর্থাৎ আমি যে আয়াত মানসুখ করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, আমি তার চেয়ে ভালো কিংবা তদানুরূপ প্রদান করি।

এটা সুস্পষ্ট যে, মানসুখ দু'ধরনের ঃ

১। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংস্কৃতি ও সভ্যতা কিংবা ইবাদত পদ্ধতি দৃষ্টিতে রেখে সেগুলো শরীআত মোতাবেক সংস্কার সাধন করেন। এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজতেহাদ মাত্র। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইজতেহাদের ওপর কায়েম রাখেন না। বরং উদ্ভূত সমস্যাটির আসল সমাধান বলে দেন। সেটাই মূলত আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত। হয় এ সিদ্ধান্তটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে প্রকাশ করা হয় কিংবা তদনুসারে কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল করা হয়। অথবা তাঁর ইজতিহাদকে অন্যদিকে পরিবর্তন করে তার ওপর তাঁকে সুদৃঢ় করে দেন।

প্রথমটির উদাহরণ হলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দান। অতঃপর কুরআনের আয়াত নাযিল হলো এবং সে নির্দেশ বাতিল হলো।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুদ্র মশক ছাড়া অন্য কোনো পাত্রে নাবীজ তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর সব পাত্রেই নাবীজ তৈরির অনুমতি দেন এবং বলেন– নেশা পান করার কোনো পাত্র না হলেই হলো। তার কারণ হলো এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, নেশা একটি অদৃশ্য ব্যাপার, তখন তিনি তার জন্যে একটি প্রকাশ্য কারণ দাঁড় করালেন। মানে, এমন পাত্রে নাবীজ তৈরি করতে হবে যাতে নেশা সৃষ্টি না হতে পারে। যেমন– মাটি, কাঠ কিংবা লাউয়ের পাত্রে নাবীজ তৈরি করতে গেলে সাথে সাথে তাতে নেশা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র মশকে নাবীজ তৈরি করলে তিন দিন পর্যন্ত তাতে নেশা সৃষ্টি হয় না। অতঃপর হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে নির্দেশ পরিবর্তন করলেন এবং পাত্রের কারণে নেশা সৃষ্টি হওয়াকে কারণ নির্ধারণ করলেন। নেশা সৃষ্টির লক্ষণ হলো উত্তেজনা দেখা দেয়া ও মুখে ফেনা সৃষ্টি হওয়া। নেশা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কারণসমূহের যে কোনো একটিকে কিংবা নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুর যে কোনো একটি গুণকে উত্তম হিসেবে নির্ধারণ করা বাইরের কোনো পশুকে উৎস হিসেবে নির্ণয় করা থেকে উত্তম।

দ্বিতীয় বিবেচ্য হিসেবে এও বলা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, জাতি নেশার প্রতি খুবই আসক্ত, তখন এ আশংকা ছিল যে, তাদের যদি শুধু নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু খেতে নিষেধ করা হয় তা হলে অন্য পথে যে বস্তুতে নেশার সংযোগ ঘটে তারা সেই পথে গিয়ে বলবে যে, আমরা তো ভেবেছিলাম এতে নেশা সৃষ্টি হবে না। যেহেতু তাদের জানা নেই, কোন কোন পাত্রে নাবীজ তৈরি করলে নেশার সংযোগ ঘটে, তাই তারা সব ধরনের পাত্রেই নাবীজ তৈরি করে সমস্যা সৃষ্টি করত। অতঃপর যখন তারা ইসলামে সুদৃঢ় হয়ে গেল, এবং যে কোনো ভাবে সৃষ্ট নেশা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো ও সে ধরনের পাত্র ব্যবহার তারা বর্জন করল, তখনই শুধু নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুটি নিষিদ্ধ করা হলো।

বিবেচনার এই দিকটি থেকে এ উদাহরণটি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, উৎসসমূহের পার্থক্যের কারণে বিধানের তারতম্য ঘটে। এ ধরনের 'নসখ' সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"আমার কালাম দ্বারা আল্লাহর কালাম মানসুখ হয় না, আল্লাহর কালাম আমার কালামকে মানসুখ করে এবং আল্লাহর কোনো এক কালাম তাঁর অন্য এক কালামকে মানসুখ করে।

মানসুখের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো এই যে, কোনো এক বস্তু কোনো এক কল্যাণ বা অকল্যাণের উৎস বা কারণ হয়ে দেখা দেয়। সে কারণে এক ধরনের হুকুম জারি করা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন সেই উৎস বা কারণ অন্তর্হিত হয়। ফলে হুকুমের পরিবর্তন ঘটে। তার উদাহরণ হলো এই যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন এবং মুহাজির মুসলমান ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের ভেতর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে

মদীনার আনসারদের সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কায়েম করে দিলেন। কুরআন পাকে শুরুতে সেই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই মীরাছের বিধান অবতীর্ণ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, 'হে মুসলিম! তোমরা যদি এ বিধান অনুসরণ না কর তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ বিরাজ করবে। তারপর যখন ইসলামের সুদিন আসল ও মুহাজিরদের আত্মীয় স্বজনরা এসে তাদের সাথে মিলিত হয়, তখন মীরাছের বিধান তার মূল অবস্থায় ফিরে এল।

তাছাড়া যে নবুওয়াতের পর খেলাফাতের ধারা বিদ্যমান থাকে না, তখন একটি বস্তুর প্রয়োজন ও কল্যাণ দেখা দেয় না। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেকার কিংবা তাঁর হিজরতের আগের অবস্থা। ঠিক বস্তুটিই সে নবুওতের পরে যখন খেলাফতের ধারা চালু হয়, তখন কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়। তার উদাহরণ হলো এই, আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্বেকার উম্মতদের জন্যে গণীমত হালাল করেন নি, কিন্তু আমাদের জন্যে হালাল করেছেন। হাদীসে তার দুটি কারণ বর্ণিত হয়েছে।

১। আল্লাহ পাক আমাদের দৈন্য ও দুর্বলতা লক্ষ্য করে আমাদের জন্যে গণীমত হালাল করেছেন।

২। আল্লাহ পাক আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব নবীর ওপর এবং আমাদেরকে সব উম্মতের ওপর মর্যাদা দান করেছেন। সে কারণেই শুধু আমাদের জন্যে গণীমত হালাল করেছেন।

উপরোক্ত কারণ দুটোর বিশ্লেষণে এই দাঁড়ায় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেকার সব নবী (আঃ)-ই নিজ নিজ জাতির নিকট প্রেরিত হতেন। তাঁদের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়। তাই তাদের মাঝে দু-এক বছরে হয়ত একবার জেহাদ করতে হতো। তার ওপর সে সব জাতি ছিল সচ্ছল ও শক্তিশালী। জেহাদের লোক কিংবা তার উপকরণের কোনো অভাব তাদের ছিল না। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের এক সঙ্গেই চলত। তাই তাদের গণীমতের প্রয়োজনও ছিল না। মূলত আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তখন এটাই ছিল যে, তাদের জ্ঞানের ভেতর কোনো পার্থিব লালসার মিশ্রণ না ঘটুক। ফলে যেন তাদের কাজের তারা পূর্ণ বিনিময় লাভ করতে পারে।

পক্ষান্তরে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, এবং গোটা পৃথিবীর লোকও অসংখ্য, পরন্তু বহুজাতির বিচিত্রমুখী মানুষের সাথে জিহাদের প্রয়োজনও অনেক বেশি, অথচ,

মুসলমানদের সংখ্যাগত ও আর্থিক দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট, একই সঙ্গে কৃষি ও ব্যবসা চালানোও ছিল তখন অসম্ভব, তাই তাদের গনীমাত নেয়ার অনুমতি দেয়া হলো।

আরেক কথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতদের দায়িত্ব হলো সারা দুনিয়ার মানুষদের ইসলামের পথে আহ্বান করা। ফলে এমন সব জাতি ও গোত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল যাদের ভেতর খালেস নিয়তের লোক কমই ছিল। তাদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ফাসেক দ্বারাও এ দ্বীনের সাহায্য করেন।

হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, ফাসিকরা শুধু পার্থিব স্বার্থে জিহাদে অংশ নেয়, আর জিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত ব্যাপক হওয়ায় সবাই তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, ইসলামের শত্রুদের প্রতি আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিও অত্যধিক।

তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ إِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি আরব ও আজমের সকল নাফরমানের প্রতি নারাজ হলেন।

এ ব্যাপক অসন্তুষ্টির কারণেই তিনি এটা অপরিহার্য করলেন, তাদের জান মালের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাক। পরন্তু তিনি এটাও অপরিহার্য করলেন যে, তাদের সম্পদের ওপর অপরের দখলদারী দিয়ে তাদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করা হোক। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের নাকে রূপালি চিহ্ন সম্বলিত উটনী হারাম শরীফে এ জন্যে কুরবানি করতে পাঠালেন যে, কাফেরদের অন্তরে যেন তীব্র অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়। তেমনি তিনি তাদের খেজুরগুলো কেটে জ্বালিয়ে দিতে বললেন যেন কাফেরদের মর্মজ্বালা দেখা দেয়। এসব কারণেই কুরআন পাকে এ উম্মতের জন্যে গনীমাতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে।

নাসেখ মানসুখের অপর একটি উদাহরণ হলো এই, ইসলামের শুরুতে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। কারণ, তখন মুসলমানদের খেলাফত ছিল না, ফৌজ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা ছিল না। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, মুসলমানরা এসে সংঘবদ্ধ হলো ও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জিত হলো, তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ নির্দেশ দিলেন ঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ـ

অর্থাৎ যারা নির্যাতিত তাদের জন্যে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া গেল এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মজলুমদের সাহায্য করার সবিশেষ ক্ষমতা রাখেন।

এ ধরনের উদাহরণ সংশ্লিষ্ট নাসেখ মানসুখ সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ـ

অর্থাৎ আমি যে আয়াত মানসুখ করি কিংবা বিস্মৃত করি, আমি তার চেয়ে উত্তম কিংবা তদনুরূপ আয়াতটি প্রদান করি।

আয়াতের 'তার চেয়ে উত্তম' কথাটি দ্বারা নবুওয়তের সাথে খেলাফতের সংযোগ ঘটায় যেসব বিধানের পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলো বুঝানো হয়েছে এবং তদনুরূপ কথাটি উৎস ও পটভূমি পরিবর্তনের ফলে যেসব বিধানে পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৭৩

জাহেলী যুগের অবস্থা ও রাসূল (সাঃ)-এর সংস্কার

আপনি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীআতকে বুঝতে চান তাহলে সবার আগে সেই সব অশিক্ষিত লোকদের অবস্থা অনুসন্ধান করুন যাদের ভেতর তিনি প্রেরিত হন। তারাই তাঁর শরীআতের ভিত্তি। তারপর তাদের সেই অবস্থার সংস্কার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করুন যা ছিল উক্ত শরীআতের লক্ষ্যবস্তু; মানে শরীআতের প্রয়োগ ও প্রনয়ন, তার সহজীকরণ ব্যবস্থা ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পর্যবেক্ষণ করলেই ব্যাপার সুস্পষ্ট হবে।

এটাই স্পষ্ট কথা, ইসমাঈলী দ্বীনে হানীফ অনুসরণের দাবিদারদের ভেতরই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন। উদ্দেশ্য হলো, সেই দ্বীনে হানীফের বিকৃতি দূর করা ও তার আসল ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনা।

তাই আল্লাহ বলেন ঃ

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ -

অর্থাৎ এ মিল্লাত তোমাদের পিতা ইবরাহীমের। অবস্থা যখন এই, তখন অপরিহার্য হচ্ছে, এ দ্বীনের মূলনীতিগুলো সর্বজন স্বীকৃত ও তার পদ্ধতি সুনির্ধারিত হবে। তা এ জন্যে যে, যখন কোনো নবী এমন কোনো জাতির কাছে প্রেরিত হয় যাদের ভেতর সঠিক রীতিনীতি চালু থাকে, তখন তা পরিবর্তন করা অর্থহীন হয়। বরং সেগুলো চালু রাখাই জরুরি হয়ে যায়। কারণ সেগুলো তাদের মন-মগজ কবুল করে নিয়েছে। ফলে তা উত্তমভাবেই তাদের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

বনী ইসমাঈলদের ভেতর তাদের পিতা ইসমাঈল (আঃ)-এর রীতিনীতি ওয়ারিশী সূত্রেই চালু ছিল। এমনকি আমর ইবনে লুহার সময় পর্যন্ত সেই শরীআত যথাযথ ছিল। উক্ত ব্যক্তি এসে তার কতিপয় ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাতে বিকৃতি সৃষ্টি করল। সে নিজে ভ্রান্ত ছিল ও জাতিকে বিভ্রান্ত করল। সে ব্যক্তিই প্রতিমা পূজা চালু করল। সে লোকই ষাঁড় ছাড়া ও বাহীরা পদ্ধতির কুসংস্কার চালু করল। ফলে তখন দ্বীন বিকৃত হলো এবং সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ঘটল। অবশেষে তারা অজ্ঞতা ও শিরক কুফরীর অন্ধকারে ডুবে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের মাঝে পাঠালেন। উদ্দেশ্য হলো, তাদের বিকৃতি ও বিচ্যুতির সংশোধন ও সত্য দ্বীনকে সঠিক অবস্থায় পুনর্জীবন দান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শরীআতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তাদের ভেতর ইসমাঈল (আঃ)-এর শরীআতের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, অন্য কথায় আল্লাহর দ্বীনের যা কিছু নিদর্শন বাকি ছিল, তা তিনি বহাল রাখলেন। পক্ষান্তরে যত সব বিকৃতি-বিচ্যুতি, শিরক, কুফর, ফিতনা, ফাসাদ ইত্যাদি তাতে সৃষ্টি হয়েছিল তা সবই খতম করলেন। সেগুলো যে মিথ্যা ও বাতিল তা প্রমাণিত করে সীল মেরে দিলেন। উপাসনা ইত্যাদির ভেতর যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল তার যথাযথ মর্যাদা ও রীতিনীতি শেখানো হলো। ফলে সেক্ষেত্রের কুসংস্কারও দূর হলো। অসামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কারের বদলে ভালো রীতিনীতি চালু করা হলো। নবীশূন্য যুগগুলোয় যেসব আসল কাজ হারিয়ে গিয়েছিল সেগুলো পুনর্বহাল করা হলো। এভাবে আল্লাহর দ্বীন পূর্ণত্ব পেল এবং তা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও জাহেলরা এ কথা মেনে চলছিল যে, মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে নবী প্রেরিত হন। তারা ভালো কাজে পুরস্কার ও মন্দ কাজে শাস্তি লাভের ব্যাপারটিও মানত। তারা পুণ্যের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাসেও বিশ্বাসী ছিল। তাছাড়া সমাজবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন স্তরের কল্যাণ–অকল্যাণের বিধি নিষেধের ব্যাপার সম্পর্কেও তারা সচেতন ছিল। জাতীয় তাহজীব তামাদ্দুন নিয়েও তাদের চিন্তাভাবনা ছিল। আমি যে বলে এসেছি, তাদের সুস্পষ্ট দুটো ফেরকা বিদ্যমান ছিল। ওপরের আলোচনাটুকু তার পরিপন্থী নয়। সেই ফেকা দুটো এই ঃ

১। পাপাচারী ও ভ্রান্ত বিশ্বাসী। পাপাচারীরা পাশবিক কাজ ও আচরণে লিপ্ত থাকত। দ্বীন অনুসরণে তাদের ঔদাসিন্য ও অবহেলা ছিল এবং দুর্বলতার কারণে তারা নফসের তাড়নায় পাপাচারে লিপ্ত থাকত। তারা দ্বীনের কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করলেও সেটা যে অন্যায় তা তারা মানত।

পক্ষান্তরে, ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের বোধ-শোধই কম ছিল। তারা কোনো কিছু তলিয়ে দেখার ক্ষমতাই রাখত না। অথচ যে কোনো দ্বীনের ধারক ও বাহকের জন্যে তা অপরিহার্য। তারা না কারো অনুগামী হতো আর না কোনো দ্বীন প্রবর্তকের আগমন বার্তা তারা মেনে নিত। তারা এসব ব্যাপারে নিজ সংশয় নিয়ে ডুবে থাকত। সাথে সাথে তারা ধর্মানুসারীদের ভয় করত। সমাজ তাদের খারাপ ভাবে। তাদের ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে। সমাজের লোক মনে করত, তারা ধর্মাচরণ মুক্ত লোক। তাই সবাই তাদের খারাপ ভাবত ও অপছন্দ করত। সুতরাং তারা কোনো নবীর আগমন বার্তা অস্বীকার করলে তাতে ক্ষতির তেমন কিছু ছিল না।

২। জাহেল ও গাফেল শ্রেণী। তারা দ্বীনের দিকে মাথা তুলে তাকিয়েও দেখে না। তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথাও নেই। কুরায়েশ ও তাদের আশপাশের গোত্রগুলোয় এ শ্রেণীর লোক যথেষ্ট ছিল। কারণ, দীর্ঘকাল তাদের কাছে কোনো নবী আসেননি।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ -

অর্থাৎ তুমি যেন তাদের সতর্ক কর যাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসেনি। অবশ্য তারা এরূপ জাহেল ও উদাসীন নয় যে, সত্য দ্বীনের ডাক এলে

তা তাদের বোধগম্য হবে না এবং তাদের দায়ী করা যাবে না ও তাদের অমূলক অজুহাত শুদ্ধ করা যাবে না।

জাহেলী যুগের লোকদের এ মৌলিক বিশ্বাসটি ছিল যে, আসমান জমীন ও তার ভেতর যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহ তাআলা একাকী সৃষ্টি করেছেন।

তেমনি সৃষ্টি জগতের যত বড় বড় ব্যাপার ও তার পূর্ণ ব্যবস্থাপনাও শুধু তাঁরই দ্বারা সম্পন্ন হয়। এ সবের ভেতর তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর হুকুম কেউ অমান্য করতে পারবে না। তাছাড়া তাঁর ফায়সালাও কেউ বদলাতে পারে না। অবশ্য তাঁর সে ফায়সালা যদি চূড়ান্ত ফায়সালা হয়।

তাই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ -

অর্থাৎ তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ।

তেমনি অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ -

অর্থাৎ বরং তোমরা তাঁকেই তো ডাকবে।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ -

অর্থাৎ শুধুমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্যকেও যারা ডাকল তারা পথহারা হলো।

অবশ্য যিন্দিক বা ভ্রান্ত বিশ্বাসীরা বলত, ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের মধ্য থেকে কতিপয় বিশিষ্ট ফেরেশতা ও আত্মা বড় বড় ব্যাপারগুলো ছাড়া বিশ্ববাসীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন উপাসনাকারীদের অবস্থা শুধরে দেয়া। বিশেষত তারা উপাসকদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির ও ধন-সম্পদের যে কোনো সমস্যা দূর করে থাকে।

তারা সেসব ফেরেশতা ও আত্মাদের বাদশাহর আমত্যবর্গের সাথে তুলনা দিত। সভাসদদের ভিতর যার বেশি সম্পর্ক বাদশাহর সাথে থাকে, সে প্রজাবর্গের ওপর তত বেশি দায়িত্ব লাভ করে। আল্লাহর দরবারের ব্যাপারও সেরূপ। তাদের এ ভ্রান্তির উৎস হলো শরীআতের এ বক্তব্য যে, সাধারণ কার্যাবলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ফেরেশতাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাদের

প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হয়। অথচ পার্থিব একটা ব্যাপার থেকে অপার্থিব একটি ব্যাপার কেয়াস করা চলে না। এ ভ্রান্তি থেকেই উপরোক্ত বিভ্রান্তি দেখা দিল।

জাহেলদের একটা নীতি এও ছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলার জন্যে যে সব কাজ অশোভন ও অনুপযোগী তা থেকে তাঁকে তারা মুক্ত ও পবিত্র ভাবত। তেমনি তাঁর নামাবলির ক্ষেত্রে ইলাহদের সংযোগকে তারা অবৈধ ভাবত। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসী হবার ফল এই দাঁড়াল যে, তারা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা সন্তান ভাবত। পরন্তু তাদের ধারণা, তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের খবরাখবর সংগ্রহ করেন। তারা রাজা-বাদশাহদের গুপ্তচর নিয়োগ ও তাদের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহের উপর কেয়াস করে এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয়েছে।

জাহিলদের ভেতর এ ধারণাও বিরাজ করত যে, আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু সৃষ্টি করার আগেই তার দ্বারা ঘটিতব্য সব কিছু নির্ধারণ করে থাকেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, জাহেলী যুগের লোকদের বক্তব্য ও কাব্যে তকদীর বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। এ কারণেই শরীআত সে বিশ্বাসকে আরও মজবুত করে দিয়েছে।

জাহেলী যুগের লোকের এও এক বিশ্বাস ছিল যে, উর্ধজগতে এমন এক নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে যেখান থেকে পর্যায়ক্রমে ঘটনাবলির বিকাশ ঘটতে থাকে। সেখানে ফেরেশতা ওলি-আল্লাহ ও বুযুর্গদের দোআর বিশেষ প্রভাব দেখা দেয়। অবশ্য সে প্রভাবের স্বরূপ তাদের জানা ছিল না। তাই তাদের ধারণা এটাই সৃষ্টি হলো যে, বাদশাহর সভাসদের সুপারিশের যেরূপ ফল দেখা দেয়, এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটে থাকে।

জাহেলী যুগের লোকদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্যে ভালো ও মন্দ কাজের সীমানা নির্ধারণ করে বলে দিয়েছেন, এগুলো বৈধ ও এগুলো অবৈধ। এ কারণে তিনি পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। ভালো কাজে ভালো ফল ও মন্দ কাজে মন্দ ফল পাওয়া যাবে। তারা এও জানত যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর নির্দেশে তারা দুনিয়ার কার্যাবলি তদারকী করেন। তারা কখনো আল্লাহর নাফরমানী করেন না এবং তাদের যা নির্দেশ দেয়া হয় তা পালন করে থাকেন। খানাপিনা, পেশাব-পায়খানা, কিংবা বিয়ে-শাদীর কোনো ব্যাপারই তাদের

প্রয়োজন হয় না। এমনি যে সব ফেরেশতারা কখনো কখনো বুজুর্গানে দ্বীনের সামনে আত্মপ্রকাশ করে সুসংবাদ শুনান– আল্লাহ তাআলা কখনো বা নিজ অনুগ্রহে বান্দাদের ভেতর থেকে কাউকে নবী বানিয়ে বান্দাদের কাছে পাঠান, তার কাছে ওহী-পাঠান, এবং তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। নবীর আনুগত্য বান্দাদের জন্যে ফরজ করা হয়। তাঁর আনুগত্য ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তাঁর থেকে কেউ পালিযে বাঁচতে পারে না। জাহেলী যুগের লোকের এ বিশ্বাসও ছিল যে, সর্বোচ্চ পরিষদ ও আরশবাহী ফেরেশতার অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের ভেতর এ নিয়ে বেশ আলোচনাও হতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইয়া ইবনে আবু সামেতের দুটো চরণের সত্যতাকে মেনে নিয়েছেন। তা হলো এই ঃ

رجل وثور تحت رجل يمينه

وانسر للاخرئ وليث مرصد ـ

অর্থাৎ মানুষ ও ষাঁড় তার ডান পায়ের নিচে অবস্থিত। শকুন তার এক পা ও বাঘ অপর পা পাহারা দিচ্ছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবিতায় এ চরণ দুটো শুনে বললেন, সে সত্য বলেছে। তারপর উক্ত কবির এ চরণ দুটো পড়ে শুনানো হলো ঃ

والشمس تطلع كل ليلة تأبى فما تطلع لنافي رسلها

حمراء يصبح لونها ينورد الا معزبة والاتجلد

অর্থাৎ প্রতি রাতের পর সূর্যোদয় ঘটে। লাল ও গোলাপি রং ধরে ভোরের আগমন ঘটে। অবশ্য তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে উদিত হয় না বরং শাস্তি পেয়ে ঘা খেয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– উমাইয়া সত্য বলেছে।

এ কথার ব্যাখ্যা হলো এই যে, জাহেরী যুগের লোকের এ ধারণা ছিল যে, চার ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহনকারী। তাদের একজনের সূরাত মানুষের। সে মানুষের জন্যে সুপারিশ করে। অপর জনের সূরাত ষাঁড়ের। সে চতুষ্পদ জীবের জন্যে সুপারিশ করে। তৃতীয়জন শকুন রূপধারী সে পাখ-পাখালীর জন্যে

সুপারিশ করে। চতুর্থজন বাঘরূপ ধারী। সে হিংস্র জীবের জন্যে সুপারিশ করে। শরীআতও এর কাছাকাছি ধারণা দিয়েছে। অবশ্য তারা তাদের ওউল নাম দিয়েছেন। তার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় পার্বত্য মেষ। তা এ কারণে যে, মেছালী দুনিয়ায় তাদের সেইরূপই দেখা যায়। এ সব ধারণা তাদের জাহেলী যুগেই বিদ্যমান ছিল। তবে তাদের ভ্রান্তি এটাই ছিল যে, তারা পার্থিব ব্যাপার দিয়ে অপার্থিব ব্যাপারের ধারণা গ্রহণ করত। বিদ্যাগত বস্তুর সাথে তারা কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্যাপারটি গুলিয়ে ফেলত।

যদি আমার উপরোক্ত আলোচনায় আপনাদের কোনো সংশয় দেখা দেয় তাহলে কুরআনে বর্ণিত ঘটনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখেন। তাদের কাছে সত্যজ্ঞান যতটুকু অবশিষ্ট ছিল সেগুলো দিয়েই আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে দলীল পেশ করেছেন। পরন্তু সেগুলোর ভেতর যা কিছু গোলমেলে জিনিসের সংযোগ ঘটেছিল সে সব তিনি দূর করে দিয়েছেন। বিশেষত সে সব লোক যখন কুরআন নাযিলের ব্যাপারটি অস্বীকার করছিল তখন তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন– মূসা যে কিতাব নিয়ে এল, বল, তা কে নাযিল করেছে?

তেমনি তারা যখন প্রশ্ন তুলল, এ কেমন নবী, যে খায়-দায় আর হাট বাজারে যায়? আল্লাহ পাক তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জবাবে বলতে বললেন– আমি তো কোনো নতুন নবী নই।

এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। তাতে জানা যায়, যদিও মুশরিকরা সরল পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, তথাপি তাদের ভিতর যেটুকু সত্যজ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই তাদের সামনে দলীল পেশ করা হতো। তাদের মনীষীদের বক্তব্য লক্ষ্য কর। কিস ইবনে যায়েদা ও যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়েলের বক্তব্য এবং আমর ইবনে লোহার কবিতা পর্যালোচনা কর। তাহলে দেখতে পাবে, আমি যা বলেছি তাতে তার প্রমাণ রয়েছে। তাতে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাবে, তাদের বুযুর্গ ও মনীষীরা পরকাল ও তার সংরক্ষক ফেরেশতার ওপর বিশ্বাসী ছিল এবং তারা একত্ববাদও মানত। যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়েল তার কবিতায় লিখেন ঃ

عبادك يخطئون وانت رب - بكفيك المنايا والحتوم

অর্থাৎ তোমার বান্দা গোনাহগার এবং তুমি প্রতিপালক প্রভু। মৃতরা ও মৃতদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তো তোমারই কব্জায় রয়েছে।

অন্যত্র তিনি লিখেন ঃ

ارب واحدام الف رب ـ ادين اذا تقسمت الامور تركت

اللات والعزى جميعا ـ كذالك يفعل الرجل البصير

অর্থাৎ এক প্রভু মানবে, না হাজার প্রভু? দীনের কাজ যদি বিভিন্ন হাতে বিভক্ত থাকে তা হলে তা দ্বীন থাকে? আমি লাত ও ওজ্জা সব ছেড়েছি। বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এটাই করে থাকে। উমাইয়া ইবনে আবি সিলতের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'তার কবিতা ঈমান এনেছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানদার হয়নি।'

এসব কিছুই তারা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ওয়ারিস হিসেবে পেয়েছিল। পরন্তু তার সাথে আহলে কিতাবদের সংশ্রবজাত কিছু ধ্যান-ধারণা সংযুক্ত হয়েছে। তারা একথা খুব ভালোভাবেই জানত, মানুষের পূর্ণতা আসে তার প্রতিপালকের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণে এবং সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত থাকায়। পবিত্রতা অর্জন, স্ত্রী সংগমে গোসল জরুরি হওয়া সর্বদা তাদের ইবাদতপূর্ণ কাজ ছিল। তেমনি খাতনা করা সহ সর্বধরনের স্বাভাবিক মানবীয় রীতিকে তারা ইবাদততুল্য ভাবত।

তাওরাতে আছে, আল্লাহ তাআলা খাতনাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্যে একটি নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মাজুসী , ইয়াহুদি ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে ওযূ করত। আরবের ধর্মবেত্তা মনীষীদের ভেতরও এক ধরনের ওযূ চালু ছিল। এমনকি বিশেষ ধরনের নামায বা উপাসনা পদ্ধতি ছিল। হযরত আবুজর (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হওয়ার তিন বছর আগে থেকেই নামায পড়তেন। তেমনি কিস ইবনে যায়দা আয়াদীও নামায পড়তেন। ইয়াহুদি, মাজুসী ও আরবদের ভেতর নামাযের মতোই আনুগত্য প্রকাশের কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট ছিল। বিশেষত সিজদা, প্রার্থনা ও জপনা অবশিষ্ট ছিল। তাদের ভেতর যাকাত, মেহমানদারী, মুসাফির আপ্যায়ন, দীন-দরিদ্রের দান-খয়রাত, মিসকীন-ইয়াতীমদের সাহায্য সহায়তা, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেয়া, হকদারদের হক আদায় ইত্যাদি প্রথা চালু ছিল। সেগুলো তাদের কাছে প্রশংসনীয় কাজ ছিল এবং তা করাকে পুণ্যবান ও কামেল লোকের লক্ষণ বলে ভাবত।

হযরত খাদিজা (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেন, মেহমানদারী করেন, গরিব পরিবারকে সাহায্য করেন এবং হকদারদের হক আদায় করেন।

তাদের ভেতর প্রত্যূষকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার পদ্ধতিও চালু ছিল। কুরায়েশরা জাহেলী যুগে আশুরার রোযা রাখত ও মসজিদে ইতেকাফ করত। হযরত উমর (রাঃ) জাহেলী যুগে ইতেকাফের মানত করেছিলেন। সেমতে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিমত চেয়েছিলেন। আস ইবনে ওয়ায়েল মৃত্যুকালে ওসিয়াত করে গেছেন, আমার মৃত্যুর পর-এতজন ক্রীতদাসকে যেন আজাদ করা হয়।

মোটকথা, জাহেলী যুগের লোকেরা বিবিধরূপ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত। তাদের বায়তুল্লায় হজ্ব ও আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সম্মানিত মাসগুলোকে মর্যাদা দানের ব্যাপার তো সবারই জানা কথা। তারা দোয়া-কালাম আর তাবীজ-তুমারেও অভ্যস্ত ছিল। অবশ্য তাদের এ সবের ভেতর শিরক ঢুকেছিল। তাদের ভেতর জীব-জানোয়ারের গলায় ছুরি চালিয়ে জবেহ করা ও উটের গর্দানে তীর মেরে জবেহ করার পদ্ধতিও চালু ছিল। তারা ফাঁস লাগিয়ে পশু জবাই করত না এবং পেট ফেড়ে উট জবাই করত না। তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যেটুকু দ্বীন তখনো অবশিষ্ট ছিল তা পালন করত। তারা জ্যোতিষ বিদ্যা মানত না। প্রকাশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে তারা ব্যাপৃত থাকত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুদক্ষ কায়-কারবারের তারা ধার ধরত না। ভবিষ্যৎ জানার জন্যে তারা সত্য স্বপ্ন ও নবীদের সুসংবাদের ওপর নির্ভর করত। তবে তাদের ভেতর তীর মেরে বা এ ধরনের অন্যকিছু করে কোনো কাজের শুভাশুভ নির্ণয়ের পদ্ধতি চালু ছিল। অবশ্য তারা জানত যে, এ সবের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের ভেতর হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ছবি দেখতে পেলেন এবং এও দেখলেন যে, তাদের হাতে তীর রয়েছে তখন তিনি বললেন, এরা জানে যে, তাঁরা কখনো তীর মেরে ভাগ্য নির্ণয় করতেন না।

বনী ইসমাঈল আমর ইবনে লুহার পূর্ব পর্যন্ত ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বীনের ওপর পুরোপুরি বহাল ছিল। আমর ইবনে লুহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের প্রায় সাতাশ বছর আগে জন্মলাভ করে। তাদের ভেতর খানাপিনা, লেবাস, পোশাক, মেহমানদারী, ওলিমা, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, শোক পালন, ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারে স্থায়ী পদ্ধতি চালু ছিল। তা কেউ লঙ্ঘন করলে নিন্দনীয় হতো।

তারা মুহাররামাত তথা মা, বোন, কন্যা ও তাদের সন্তানদের বিয়ে করা হারাম ভাবত। জুলুম-অত্যাচারের জন্যে নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যেমন কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি। ব্যভিচার ও চুরির জন্যেও শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তাদের ভেতর রোমান ও পারসিয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতির জ্ঞানও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা পাপাচারী হয়ে গিয়েছিল। একে অপরকে আটক করা ও লুটপাট করার মতো নিপীড়নমূলক কাজ চালু হয়েছিল। ব্যভিচার, অবৈধ বিয়ে ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। তারা নামায ও জিকির-আজকার বর্জন করেছিল। অতঃপর এ কাজ দুটো পুরোপুরিই ছেড়ে দিল।

অবশেষে তাদের ভেতর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন। তাদের অবস্থা তখন অনুরূপ ছিল। তিনি তার জাতির কাছে যা কিছু ছিল সব পর্যবেক্ষণ করলেন। দ্বীনের যেটুকু যথাযথ পেলেন তা ঠিক রাখলেন। সেগুলোর ওপর বহাল থাকার জন্যে তাদের তাগাদা দিলেন। তিনি সেগুলোর উপায়-উপকরণ, শর্ত ও অবয়ব নিয়ম- অনিয়ম, অপরিহার্যতা ও অবকাশ, ওয়াক্ত ও কাযা ইত্যাদি শিখিয়ে দিয়ে তাদের ইবাদতগুলো বিধিবদ্ধ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তেমনি নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারণের ফলে তা বর্জনের পাপের স্তর ও বিন্যাস করেছিলেন। দণ্ডবিধি জারি করলেন ও কাফফারা জরিমানার পদ্ধতি ও পরিমাণ বলে দিলেন। আশা ও আশংকার দিকগুলো বর্ণনা করে দ্বীন পালন করা তাদের জন্যে সহজ করে দিলেন। পাপের পথ বন্ধ করে পুণ্যের পথ উন্মুক্ত করার জন্যে উৎসাহ ব্যঞ্জক বর্ণনা শুনিয়ে তাদের দ্বীন অনুসরণের প্রেরণা সৃষ্টি করলেন। সেগুলো তাদের কাছে তাদেরই পূর্বের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে এমনভাবে পেশ করলেন যা গ্রহণ করা তাদের জন্যে সহজ হয়। তারা যেহেতু দ্বীনে হানীফের দাবিদার ছিল, তাই সেই দ্বীনে হানীফের সংস্কার ও উন্নয়নের যথার্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালালেন। তার ভেতরে যে সব বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঢুকেছিল তিনি সেগুলোর সংস্কার সাধন করলেন। এভাবে তিনি সেই মিল্লাতে হানীফকেই সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার সাধনায় নিয়োজিত হলেন। তাদের ভেতর থেকে সব কুসংস্কার ও পাপাচার দূর করে তিনি তাদের শ্রেষ্ঠতম সভ্য

জাতিতে পরিণত করলেন। এমনকি তাদের তিনি এক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা খেলাফত কায়েম করে দিলেন। তার মাধ্যমে তিনি অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজ সহচরদের নিয়ে জেহাদ শুরু করলেন। এভাবে অবশেষে আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। যদিও তা মেনে নেয়া কাফেরদের জন্য কষ্টকর হলো। কোনো কোনো হাদীসের আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে সহজ ও সুস্পষ্ট দ্বীনে হানীফ দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

হাদীস ঃ بُعِثْتُ بِالْمِلَّةِ السَّمْحَةِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْضَاءِ

'সামহা' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তাতে কষ্টকর কোনো ইবাদত নেই। মানে পাদ্রিরা সেরূপ কষ্টকর ইবাদত বানিয়ে নিয়েছে, মূল দ্বীনে তা নেই। পরন্তু তাতে প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অবকাশ ও বিকল্প রয়েছে। ফলে দুর্বল, সক্ষম, ব্যবসায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত সবাই সহজে সে দ্বীন অনুসরণ করতে পারে।

'হানিফিয়া' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত। তার কাজ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলি প্রতিষ্ঠিত করা ও শিরকের নমুনাগুলো নিশ্চিহ্ন করা। তেমনি তার মধ্যকার বিকৃতি, বিচ্যুতি এবং কুসংস্কার বিলুপ্ত করা।

'বায়রা' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে, সে দ্বীনের প্রকৃতি, কলা-কৌশল ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা ও অবকাশ যার রয়েছে সে নিঃসন্দেহে তা মেনে নেবে। তবে শর্ত এই যে, তার বিবেক সুস্থ থাকতে হবে এবং তার ভেতর কোনো গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা থাকবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৭৪

হাদীস থেকে শরয়ী বিধান উদ্ভাবন পদ্ধতি

উলূমে নববীর শ্রেণীভেদ ঃ একথা সুস্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত।

একঃ রিসালাতের প্রচার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ। সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

অর্থাৎ আর রাসূল তোমাদের যা কিছু প্রদান করে তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু বারণ করে তা থেকে বিরত থাক। উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর ভেতর পারলৌকিক

জ্ঞান ও ঐশী বিস্ময়কর কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত। সব জ্ঞান কেবল ওহীর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। শরীআত, ইবাদত পদ্ধতি অতীত ইবাদতের পদ্ধতির সাথে তার সামঞ্জস্য বিধান ও সভ্যতা সংস্কৃতির রীতিনীতিগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। এ সবের কিছু ব্যাপার ওহীর মাধ্যমে পাওয়া গেছে এবং কিছু ব্যাপার ইজতেহাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজতেহাদ ওহীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন। তাঁর জন্যে এটাও জরুরি নয় যে, তিনি কোনো ঐশীবাণীকে ভিত্তি করে ইজতেহাদ করবেন। কিছু লোক সেটাই ভেবে থাকেন। বরং সাধারণত এটাই হয় যে, খোদাতাআলা তাঁকে শরীআতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শরীআতের মৌল বিধানাবলি ও তার প্রয়োগের সহজ পদ্ধতি জানিয়ে দেন এবং তিনি তারই আলোকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যাপারের বিশ্লেষণ প্রদান ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে থাকেন।

উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর ভেতর সাধারণ প্রায়োগিক কৌশল ও পরিস্থিতি পরিবেশ বিবেচনাও শামিল রয়েছে। অবস্থাভেদে যে কোনো সময় ব্যবস্থা নেয়া যাবে, কোনো সময় সীমা তাতে নেই। যেমন শিষ্টাচার ও অশিষ্টাচার। সাধারণত তা ইজতেহাদের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হয়। আল্লাহ পাক যেহেতু তাঁকে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দান করেছেন, তাই তিনি মাথা খাটিয়ে কোন ব্যাপার কখন শিষ্টচার আর কখন কোন ব্যাপার অশিষ্টাচার বলে বিবেচিত হবে তা তিনি উদ্ভাবন করে বলে দিয়েছেন এবং তার জন্যে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন।

সে সব ব্যাপারের ভেতর আমলের ফজিলাত ও আলেমদের মর্যাদাও অন্তর্ভুক্ত। আমর ধারণা মতে তার কিছু এসেছে ওহীর মাধ্যমে ও কিছু এসেছে ইজতেহাদের মাধ্যমে। এসব কানুনের আলোচনা আগে করে এসেছি। এ শ্রেণীরই আমি বিশ্লেষণ প্রদান ও সবিস্তার আলোচনার ইচ্ছা রাখি।

দুইঃ এ শ্রেণীর ব্যাপারগুলোর সাথে রিসালাতের প্রচার প্রসারের কোনো সম্পর্ক নেই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِيْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ -

"নিঃসন্দেহে আমি একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেই, তা গ্রহণ কর। আর যখন আমি নিজের তরফ থেকে তোমাদের কোনো কথা বলি, তখন তা একজন মানুষ হিসেবেই বলি।

খেজুরের ফলন বৃদ্ধির জন্যে পুরুষ গাছ ও নারী গাছ জুড়ে দেয়ার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরামর্শ সম্পর্কে বলেন ঃ সেটা ছিল আমার ব্যক্তিগত ধারণামাত্র। তোমাদের সে ধারণা অনুসরণ জরুরি নয়। তবে আল্লাহর তরফ থেকে যখন কিছু বলি তখন তা মেনে চল। কারণ, আল্লাহর ব্যাপারে আমি কখনো ভুল বলি না।"

এ শ্রেণীর কার্যাবলির ভেতর চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্যতম। এ ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ "যে কালো ঘোড়ার কপাল সাদা তা অবশ্যই রাখবে।" তাঁর এ নির্দেশের সনদ বা দলীল হলো অভিজ্ঞতা।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত হিসেবে নয় বরং অভ্যেস বশত যা করতেন তাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাও আবার তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেন না, মাঝে মাঝে ঘটনাচক্রে করে থাকেন।

এ শ্রেণীর ব্যাপারগুলোর ভেতর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী ও পাড়াপড়শীর সাথে যে সব আলাপ আলোচনা করতেন সেগুলো অন্তর্ভুক্ত। যেমন উম্মে যুরআর হাদীস ও খুজাফার হাদীস। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) এ কথাই বলেন। যখন তার কাছে কতিপয় লোক এসে বলতে লাগল, আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শুনান। তখন তিনি বললেন ঃ আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পড়শী ছিলাম। যখন তাঁর ওপর কোনো ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি আমাকে ডাকতেন। আমি এসে তাঁকে ওহীটি লিখে দিতাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যেস ছিল, যখন আমরা পার্থিব কোনো ব্যাপার আলোচনা করতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সে আলোচনায় যোগ দিতেন। যখন আমরা পারলৌকিক ব্যাপারে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সে ব্যাপারেই কথা বলতেন। যখন আমরা খানাপিনার আলোচনা উঠাতাম, তিনিও তাতে অংশ নিতেন। আমি তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর সবগুলোই বর্ণনা করব।

এ শ্রেণীর ভেতরে সে ব্যাপারও রয়েছে যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাময়িক কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে ফলপ্রসূ উপায় ভেবে

করেছেন। তার উদাহরণ হচ্ছে এই– "যেমন কোনো বাদশাহ তার সৈন্য সারিবদ্ধ করলেন। তার জন্যে তিনি কোনো চিহ্ন বা নিশানা নির্ধারণ করলেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাই বললেন– 'তাওয়াফে আমাদের রমল করার কি দরকার? আমরা তো এটা তাদের দেখাতাম, আল্লাহ যাদের ধ্বংস করেছেন।' তাই তিনি ভয় করতেন যে, এটা করা আবার সেরূপ অবস্থা সৃষ্টির কারণ না হয় যখন আবার এটা জরুরি হয়ে যায়।

মূলত বেশ কিছু বিধান এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'যে ব্যক্তি (জেহাদে) কাউকে হত্যা করল, সে তার আসবাবপত্রের মালিক বিধায় সেই তা নেবে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সালিসি মীমাংসা করতেন তাও এ শ্রেণীভুক্ত। তাতে তিনি সাক্ষী ও শপথের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ "উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখে অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখে না।"

অধ্যায়-৭৫

মুসলেহাত ও শরীআতের পার্থক্য

জেনে নিন, শরীআত প্রণেতা আমাদের দু ধরনের শিক্ষাগত কল্যাণ দান করেছেন যার বিধি-বিধান ও মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। তার ভেতর একটি শ্রেণী হলো সেই শিক্ষা যা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশোভিত করে। মানে, তা হচ্ছে ফ্যাসাদ নির্ণয় ও তা সংশোধনের শিক্ষা। আর তার এভাবে বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে যাতে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জনের চরিত্র সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে নিন্দনীয় স্বভাব দূর করা চাই।

মূলত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিয়মনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে শরীআত প্রণেতা কোনো ধরাবাধা হুকুম-আহকাম বিন্যস্ত করে যাননি। তিনি কোনো অস্পষ্ট কিংবা সন্দিগ্ধ ব্যাপার চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটনের কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নির্ধারিত করেননি। বরং প্রশংসনীয় কাজগুলো করতে বলেছেন ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি এ সম্পর্কে যা কিছু বলে গেছেন তার তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যাপারটি নিজ অনুসারীর ওপর ন্যস্ত করে গেছেন। কোনটি করা হবে আর কোনটি করা হবে না তার

চিহ্নিতকরণ কাজটি পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল করে গেছেন। যেমন তিনি বিজ্ঞতা ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তা ছাড়া নম্রতা, প্রীতি ও মধ্যপন্থা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষণে বিজ্ঞতার সীমারেখা কি এবং কিরূপ বিজ্ঞতা প্রশংসনীয় আর কোন ক্ষেত্রে তার কি ধরনের প্রয়োগের জন্যে বিজ্ঞরা জবাবদিহি হবেন তা সবিস্তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রেই মুসলেহাত তথা কল্যাণের পথ অনুসৃত হয়।

শরীআত আমাদের যে মুসলেহাত বা কল্যাণকর পন্থার জন্যে উৎসাহ জুগিয়েছে এবং অকল্যাণকর পথ থেকে বিরত রেখেছে তা নিচের তিনটি মূলনীতির যেকোনো একটির সাথে সংশ্লিষ্ট।

১। আখেরাতের কল্যাণদায়ক স্বভাবের মাধ্যমে আত্মাকে পরিমার্জিত করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ অর্জনের যাবতীয় স্বভাবের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশীলিত করা।

২। সত্য বাণীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা, শরীআতকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে কায়েম করা এবং তা প্রচার ও প্রসারের জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করা।

৩। জনগণের অবস্থার বিন্যাস ঘটানো, তাদের কাজ-কারবার ঠিকঠাক রাখা ও তাদের রীতিনীতি সংশোধিত ও সুশোভিত করা।

কল্যাণ ও অকল্যাণ উপরোক্ত তিনটি মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার তাৎপর্য এই যে, যেকোনো ব্যাপার তা হ্যাঁবাচক হোক বা না বাচক হোক, সে তিনটির কোনো না কোনোটির অন্তর্ভুক্ত। মানে, সে ব্যাপারটি কল্যাণকর স্বভাবের হবে অথবা অকল্যাণ স্বভাবের হবে। কিংবা সে দুটোর যে কোনো একটির অপরিহার্য অঙ্গ হবে। অথবা তার যে কোনো একটির পক্ষে বা বিপক্ষের কারণ হবে।

মূলত কল্যাণধর্মী কাজের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি জড়িত থাকে। তেমনি অকল্যাণকর কাজের সাথে থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। হোক সে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের আগের কিংবা পরের। ব্যাপার একই। যদি সে দু'ধরনের স্বভাব ও কাজের সাথে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি জড়িত না থাকত, তা হলে রাসূল পাঠানোই প্রয়োজন হতো না। তাই দেখা যায়, রাসূলগণ এসেই কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভালো-মন্দের বিধি-বিধান ও সীমারেখা প্রণয়ন করেছেন।

বস্তুত, প্রাথমিক পর্যায়েই লোকদের সেসব ব্যাপারে দায়ভার প্রদান ও তার জন্যে জবাবদিহি করা আল্লাহ পাকের কৃপাদৃষ্টির পরিপন্থী ছিল। অবশ্য

কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপার, আত্মশুদ্ধি কিংবা বিকৃতি, জনগণের অবস্থার তথা লেন-দেন ও আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ বা অনিয়ন্ত্রণ নবীদের আগমনের পূর্বেও মানব সমাজে প্রভাব ফেলত।

তাই খোদার মেহেরবানীর এটাই দাবি হয়ে দাঁড়ায় যে, লোকদের এসব ক্ষেত্রে জরুরি ব্যাপারগুলো বলে দিয়ে তাদের কাঁধে তা প্রতিপালনের দায়–দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া আর সেটা তখনই হতে পারে যখন সেগুলোর সীমারেখা ও বিধি-বিধান নির্ধারিত হয়। তাই আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পরোক্ষভাবে সেই রূপরেখা ও বিধি-নিষেধ চালু করার ইচ্ছা করলেন। বস্তুত এ ব্যাপারটি যুক্তিযুক্তও বটে।

সেগুলোর ভেতর এমন কিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে যা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। আবার বেশ কিছু এমন ব্যাপারও রয়েছে, যা কেবল প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন যে সব লোকের অন্তরে নবীদের নূর বর্ষিত হয় তারাই বুঝতে পায়। শরীআত তাদের সতর্ক করার সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে গেছে। তারা ইঙ্গিতমাত্রেই ব্যাপার বুঝে গেছে। যে ব্যক্তি আমাদের পূর্বালোচিত নীতি কটি ভালোভাবে আয়ত্ত করেছে, তার সে সবের কোনোটির ব্যাপারেই দ্বিধা থাকবে না।

ইলমে নববীর দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে শরীআত, হদূদ ও ফরায়েজের ইলম। মানে, শরীআত যে বিধি-বিধান ও সীমারেখা বর্ণনা করেছে তা জানা। বস্তুত মুসলেহাতের জন্যে কিছু স্থান, নীতি-নিয়ম ও জ্ঞাত নিদর্শনাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলোর ভিত্তিতেই হুকুম দেয়া হবে। আর সেগুলো পালনের দায়িত্বই লোকদের উপর বর্তাবে। সেগুলোর অবয়ব, শর্তাবলি ও নিয়মনীতি নির্ধারণের ওপরই পাপ-পুণ্যের স্তর বিন্যস্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রেণীর একটি সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে। সকলের জন্যে তা অবশ্য অনুসরণীয়। অপর একটি সীমা এরূপ নির্ধারিত হয়েছে যা অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব। তেমনি পুণ্যেরও একটি সংখ্যা ওয়াজিব করা হয়েছে ও অপর একটি সংখ্যা মুস্তাহাব করা হয়েছে।

বস্তুত, দায়-দায়িত্ব বর্তানোর ব্যাপারটি যেরূপ উপরোক্ত পটভূমি ও কার্য কারণের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি উক্ত নিদর্শনাবলিই বিধি-বিধানের ভিত্তি। উক্ত শ্রেণীর লক্ষ্যবস্তু মূলত মিল্লাতের রাজনৈতিক আইন-কানুন প্রণয়ন। বলা বাহুল্য, মুসলেহাতের প্রতিটি আনুমানিক বা ইজতেহাদী ব্যবস্থাপনা জনগণের জন্যে অবশ্য পালনীয় নয়; বরং সেই ইজতেহাদী বিধান তাদের জন্যে অপরিহার্য যার কাজটি উপলব্ধিযোগ্য ও বিধিবদ্ধ কিংবা যার গুণাগুণ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। প্রতিটি সাধারণ ও বিশিষ্টজন যেন সে সম্পর্কে অবহিত থাকে।

অনেক সময় ওয়াজিব ও হারাম হওয়ার সাময়িক কারণ দেখা দেয়। যে কারণ, সর্বোচ্চ পরিষদে তা ওয়াজিব বা হারাম বলে লিপিবদ্ধ হয়। যেমন কারো প্রশ্ন তোলা এবং জনগণের সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া কিংবা তা থেকে মুখ ফেরানো। এগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য কোনো অর্থ হয় না। মানে, যদিও শরীআত ও তার বিধানের সীমারেখা আমরা জানি, কিন্তু তার সর্বোচ্চ পরিষদে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং পবিত্র মজলিসে তার নকশা চিত্রিত হওয়া শুধু শরীআতের দলীল দ্বারাই আমরা জানতে পাই। কারণ এটা এমন ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত যা বুঝার উপায়ই হচ্ছে আল্লাহ পাকের জানিয়ে দেয়া। তার উদাহরণ হচ্ছে বরফ। আমরা জানি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে বরফ জমে। কিন্তু আমরা জানিনা অমুক পাত্রের পানি জমল কিনা। কারণ, তা স্বচক্ষে না দেখে কিংবা কেউ দেখে এসে না বলে দিলে তা বলা যায় না।

এ কেয়াসের ভিত্তিতেই আমরা জানতে পাই, যাকাতের একটা নেসাব হওয়া জরুরি। আমরা এও জানি, দু'শ দিরহাম ও পাঁচ ওসাক শস্য বা ফল একটি যথোপযুক্ত পরিমাণ। কারণ, এ উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদ ধনী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। জাতির কাছেও এ দুটো দ্রব্য ব্যবহৃত ও বিধিসম্মত। অথচ আমরা জানিনা আল্লাহ তাআলাও আমাদের জন্যে এ নেসাবই নির্ধারণ ও অপরিহার্য করেছেন কিনা? তিনি এর ভিত্তিতেই তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বিবেচনা করবেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই। সে ব্যাপারটি আমরা শুধু শরয়ী দলীলের মাধ্যমেই জানতে পারি। এভাবের আরও কয়েকটি ব্যাপার রয়েছে যা ওহী বা হাদীস ছাড়া আমরা জানতে পারি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলমানদের ভেতর সব চাইতে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি ....ইত্যাদি। অন্যত্র তিনি বলেন, আমার ভয় হয়, এটা আবার তোমাদের উপর ফরজ না হয়ে যায়।

বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারগুলোয় কেয়াস চলে না। তা ছাড়া এ ব্যাপারেও তারা একমত যে, কিয়াসের মূল কথা হচ্ছে, কোনো মিশ্র কারণের ভিত্তিতেই মূলের হুকুমটি শাখা-প্রশাখায় স্থানান্তরিত করা। তার অর্থ এ নয় যে, কোনো মুসলেহাতের চিন্তাকে তার কারণ বানানো হবে কিংবা কোনো উপযোগী বস্তু পেলেই সেটাকে উদ্দিষ্ট অংশ বা শর্ত বানানো হবে। এ ব্যাপারেও তারা একমত যে, কেয়াস কোনো মুসলেহাতকে বিবেচনায় আনে না। বরং এমন কারণ বিবেচনায় রাখে যার ওপর বিধানটি নির্ভরশীল হয়। এ কারণেই রুগ্ন ও অন্য কোনো কারণে অপারগ মুকীমের নামাযের প্রশ্নে মুসাফিরের প্রাপ্ত সুযোগের ওপর কেয়াস করা

চলে না। কারণ তার প্রতিবন্ধকতার জন্যে তাকে সময় দেয়া মুসলেহাতের দাবি হতে পারে বটে, সেটা কসর পড়া বা রোযা ভঙ্গ করার কারণ হতে পারে না। সে দুটোর জন্যে সফরই একমাত্র কারণ।

এ সব প্রশ্নে মোটামুটিভাবে আলেমদের কোনো মতভেদ নেই। অবশ্য এ সবের শাখা-প্রশাখায় গিয়ে কোথাও হয়ত মতভেদ দেখা দিয়েছে। তার কারণ এই যে, মুসলেহাত কখনো কার্য-কারণের অনুরূপ হয়ে ধরা দেয়। কিছু ফিকাহবিদ যখন কিয়াস নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করলেন তো হতভম্ব হয়ে পথচ্যুত হলেন। তারা কোনো একটি পরিমাণের মানদণ্ড হাতে নিলেন। কিন্তু তার সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুর বিনিময়কে ভ্রান্ত ভাবলেন। তেমনি কিছু কিছু বস্তুর ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটায় অন্য বস্তু তার স্থলাভিষিক্ত করলেন।

তার উদাহরণ হলো এই, তারা তুলার পরিমাণ নির্ধারণ করেন পাঁচ গাঠুরী। নৌকারোহীর মাথা ঘুরায়। এই মাথা ঘুরানোকে কারণ স্থির করে তারা বসে নামায পড়া বৈধ বলেন। পানির পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকার জন্য তারা দশের ভেতর দশের মানদণ্ড কায়েম করলেন। শরীআত যখনই কোনো ব্যাপারে মুসলেহাতকে বিবেচনায় এনেছে, আমরা অন্য ব্যাপারেও মুসলেহাত দেখতে পেয়ে ভেবেছি, আল্লাহর সন্তুষ্টি এই মুসলেহাতের সাথে রয়েছে, শরীআত নির্দেশিত বিশেষ ব্যাপারটির সাথে নয়। অথচ শরীআত নির্দেশিত পরিমিতি ও মানদণ্ডের সাথেই আল্লাহর সন্তুষ্টির সম্পর্ক।

উক্ত বক্তব্যের বিশ্লেষণ হলো এই, যে ব্যক্তি কোনো ওয়াক্তের নামায ছেড়ে দিলে সে গুনাহগার হবে। হোক সে সেই সময় জিকির-আজকার বা অন্যান্য ইবাদতে ব্যস্ত থাক। তেমনি যে ব্যক্তি ফরজ যাকাত আদায় না করে ভালো ভালো নেক কাজে তার সব সম্পদ উজাড় করল, সেও গুনাহগার হবে। তেমনি যে ব্যক্তি এরূপ গোপনে রেশমি কাপড় ব্যবহার করল যা গরিব লোকদের মন ভাঙার কারণ হয়নি, না পার্থিব সম্পদ জমানোর জন্যে তা অন্যকে উৎসাহিত করেছে, আর না সে পোশাক সে বিলাসিতার জন্যে ব্যবহার করেছে, তথাপি সে গুনাহগার হবে। তেমনি যে ব্যক্তি ওষুধের নিয়ত করে শরাব পান করল এবং তাতে তার মাতলামীও দেখা দিল না, এমনকি তার নামাযও তরক হলো না, তথাপি সে গুনাহগার হবে। কারণ, আল্লাহর অনুমোদন ও অননুমোদন বস্তুর সাথে জড়িত, কারণগুলোর সাথে নয়। যদিও মূল উদ্দেশ্য থাকে লোকদের ফ্যাসাদ থেকে মুক্ত রাখা ও কল্যাণের পথে উৎসাহিত করা, কিন্তু আল্লাহ পাক

জানেন, উম্মতের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বস্তু বিশেষকেই ওয়াজিব বা হারাম করা সময়ের দাবি। সে মতে অনুমোদন ও অননুমোদনের ব্যাপারটি বস্তুগুলোর সাথেই সংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং সর্বোচ্চ পরিষদে সেটাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি উঁচু মানের পশমি পোশাক পরিধান করে যা রেশমি বস্ত্রের চেয়েও উন্নত ও দামি তাতে গুনাহ নেই। তবে যদি তা দেখে অভাবী ও দরিদ্রের মনঃকষ্ট দেখা দেয় কিংবা অন্যালোক তা করার জন্যে উৎসাহিত হয় অথবা বিলাসিতাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সেই সব কারণে তার গুনাহ হবে, অন্যথায় নয়।

আপনি যেখানেই সাহাবায়ে কেরামকে কিংবা তাবেঈনদের পরিমাপকে ভিত্তি নির্ধারণ করতে দেখবেন, সেখানে তাদের লক্ষ্য হলো মুসলেহাত বর্ণনা করা ও তার জন্যে উৎসাহিত করা। অথবা তার অকল্যাণ বর্ণনা করে তা থেকে সতর্ক করা। সেটা তারা নিছক একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। সেটা তাদের লক্ষবস্তু নয়, লক্ষ্য বস্তু হলো যার পরিমাপ বলা হলো সেই বস্তুটি। বাহ্য দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ুক বা নাই পড়ুক।

তবে শরীআত যেখানে পরিমাপ নির্ধারণ করে তার বিনিময় গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে, যেমন 'বিন্তে মাখাস'কে পূর্ণদেহী জন্তুর সাথে আন্দাজ করে বিনিময় নির্ধারণের সমর্থন জানিয়েছে, সেটাও তো পরিমাপকে মানদণ্ড বা ভিত্তি বানানোর শামিল। সেক্ষেত্রেও কথা হচ্ছে, অনুমান-আন্দাজ কখনো যথাযথ ও পূর্ণ হয় না এবং তাতেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমন কিছুর সাথে আন্দাজ করা হয় যার সাথে অনেক কিছুই সংশ্লিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ বিন্তে মাখাসকেই ধরুন। একটি বিন্তে মাখাস অপর একটি বিন্তে মাখাস থেকে উত্তম। তাই একটির ভিত্তিতে বিধান দেয়া যায় না। কখনো মূল্যের সাথে আন্দাজ লাগানো সামগ্রিকভাবে কোনো জ্ঞাত সীমারেখার সাথে হতে পারে। যেমন হাত কাটার জন্যে চোরাই মালের নেসাবের আন্দাজ ঠিক করা হয় তিন দিরহাম বা এক-চতুর্থাংশ দীনার মূল্যের ভিত্তিতে।

মনে রাখা দরকার যে, কোনো কিছু ওয়াজিব হওয়া বা হারাম হওয়া মূলত পরিমাপ নির্ধারণের দুটি শ্রেণী। তার কারণ, কখনো কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণের কয়েকটি রূপ হতে পারে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব হওয়া বা হারাম হওয়ার নির্দিষ্ট একটি রূপ রয়েছে। কারণ এ দুটো বিধিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কিংবা তার অবস্থা পূর্বেকার দ্বীনগুলোয়ও জানা যায়। অথবা সে ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ বিদ্যমান। এ কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তারাবীহর নামাযের ব্যাপারে এ ওজর পেশ করলেন যে, আমার ভয় হয়, তোমাদের ওপর এ নামায ফরজ না করা হয়। তেমনি তিনি বলেছেন– যদি আমি আমার উম্মাতের জন্যে কষ্টকর না ভাবতাম তা হলে প্রত্যেক নামাযের আগে তাদের মিসওয়াক করতে বলতাম।

ঘটনা যখন এই, তখন যে ব্যাপারে সরাসরি কুরআন-হাদীসের দলীল নেই তার সাথে যে ব্যাপারের বিধানের সমর্থনে দলীল রয়েছে তার কোনো কেয়াস চলে না। অবশ্য মুস্তাহাব বা মাকরূহর ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে। তবে শরীআত প্রণেতা যে মুস্তহাব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন ও তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং লোকদের জন্যে সেটাকে সুন্নাতরূপে নির্ধারণ করেছেন, তার অবস্থা ওয়াজিবের পর্যায়েরই। পক্ষান্তরে তিনি যে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজকে শুধু কল্যাণকর ভেবে নিজে করেছেন, কিন্তু তার গুরুত্ব তুলে ধরেননি এবং অপরের জন্যে তা সুন্নাতও করে যাননি, তার অবস্থা শরীআতের পূর্ণাবস্থার মতোই হবে। সেক্ষেত্রে ছাওয়াব শুধু সে কাজের সৃষ্ট কল্যাণের জন্যে মিলবে, কাজটির জন্যে নয়। মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজের বিশ্লেষণও অনুরূপ হবে।

উপরোক্ত পর্যালোচনাসমূহ যখন সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন আপনাদের সামনে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেয়াস নিয়ে বড়াই করা হচ্ছে এবং যা নিয়ে মুহাদ্দেসীনদের পর্যন্ত করুণার পাত্র ভাবা হচ্ছে, তার অধিকাংশই তাদের জন্যে যে বিপদ হয়ে দেখা দেবে তার খবরও তাদের নেই।

অধ্যায়-৭৬

উম্মতে মুহাম্মদীর শরীআত অর্জনের পন্থা

মনে রাখতে হবে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শরীআত লাভের দুটো পদ্ধতি রয়েছে।

১। একটি পদ্ধতি হলো তাঁর প্রকাশ্য বক্তব্য থেকে শরীআত আহরণ করা। তার জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী উদ্ধৃত করা জরুরি। হোক সে রেওয়ায়েত মুতাওয়াতের কিংবা গায়রে মুতাওয়াতের। মুতাওয়াতের বর্ণনার একটি শ্রেণী হলো যার শব্দার্থগুলোও সবাই একইভাবে বর্ণনা করেছেন।

যেমন, কুরআনের বাণী ও কতিপয় হাদীস। এ শ্রেণীর একটি হাদীস এই ঃ

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ -

অর্থাৎ শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে দেখা করবে।

মুতাওয়াতের বর্ণনার অপর শ্রেণী হলো যার শব্দে তারতম্য হলেও সবাই একটি তাৎপর্যের বর্ণনা প্রদান করেছেন। যেমন তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্ব, ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ। এ সবের অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রেই ইসলামী ফেরকাগুলোর কোনো মতানৈক্য নেই।

গায়রে মুতাওয়াতের রেওয়ায়েতের ভেতর সর্বোচ্চ মর্যাদা হলো মুস্তাফীজ রেওয়ায়েতের। যে বর্ণনাটি তিন কিংবা তৎ-অধিক সাহাবী থেকে পাওয়া গেছে সেটাই হচ্ছে মুস্তাফীজ বর্ণনা। পর্যায়ক্রমে পঞ্চম স্তর পর্যন্ত এর বর্ণনাকারী বেড়েই চলেছে। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা অনেক। ফেকাহ্ শাস্ত্রের অনেক বড় বড় মাসআলার ভিত্তি হলো এ সব হাদীস।

এর পরে স্থান হলো সে সব হাদীসের যেগুলোকে হাদীসের হাফেজ ও হাদীস বিশারদ আলেমরা সহীহ্ ও হাসান বলেছেন। অতঃপর সে সব হাদীসের স্থান যেগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মানে, একদল মুহাদ্দিস বিশুদ্ধ বলেছেন ও অন্যদল বিশুদ্ধ বলেননি। এ শ্রেণীর হাদীসগুলোর যে সবের পর্যাপ্ত সাক্ষ্য কিংবা অধিকাংশ আলেমের সমর্থন অথবা বক্তব্যের সুস্পষ্টতার কারণে শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, সেগুলোর ওপর আমল করা ওয়াজিব।

২। শরীআতের বিধান আহরণের দ্বিতীয় পন্থ হলো দালালাতে হাদীস। তা হচ্ছে এই, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে বা করতে দেখলেন। তা থেকে তারা কোনো কাজকে ওয়াজিব বা অন্য কিছু বলে উদ্ভাবন করলেন। তারপর লোকদের জানিয়ে দিলেন অমুক কাজ ওয়াজিব ও অমুক কাজ জায়েয ইত্যাদি। পরবর্তী স্তরে তাবেঈনরা তা থেকেই বিধি-বিধানের বিন্যাস ঘটান। তৃতীয় স্তরে তাবে তাবেঈনদের হাতে তা ফতোয়া ও বিচার বিধিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এ পদ্ধতিতে শরীআতের বিধানাবলি যারা আহরণ করেছেন তারা হলেন হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)। হযরত উমর (রাঃ)-এর অভ্যেস এটাই ছিল যে, তিনি যে কোনো ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময় করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটি তার কাছে স্পষ্ট না হতো ততক্ষণ তা অব্যাহত রাখতেন। যখন তিনি সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতেন তখন তা চালু করতেন। এ কারণেই তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া পৃথিবীর সর্বত্র নির্দ্বিধায় সমাদৃত ও অনুসৃত হচ্ছে। তাঁর ইন্তেকালের খবর পেয়ে ইবরাহীম (রহঃ) বললেন, ইলমের নয়-দশমাংশ বিদায় নিল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন আমরা হযরত উমর (রাঃ)-এর মাসআলাকে শুনি তখন আরাম পাই। হযরত আলী (রাঃ) সাধারণত পরামর্শ করতেন না। তাঁর বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত ও ফতোয় কুফায় প্রদত্ত হয়। অবশ্য তা খুব কম লোকই গ্রহণ করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুফায় ছিলেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া সে এলাকায় চালু ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের পরে ইজতেহাদ শুরু করেন। ফলে বেশ কিছু মাসআলায় তিনি পূর্ববর্তীদের সাথে একমত হননি। মক্কাবাসীদের একদল তাঁর অনুবর্তী হন। তবে অধিকাংশ মুসলমান তাঁর ব্যক্তিগত মতকে গুরুত্ব দেননি।

উপরোক্ত চারজন ছাড়া অন্যান্য সাহাবারাও দালালাতে হাদীস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তারা তা থেকে মাসআলা আহরণের শর্ত, রুকন, রীতি ও পদ্ধতির পার্থক্য জানতেন না। তারা পরস্পর বিরোধী বর্ণনা ও দলীল আদিল্লার ব্যাপারে কিছু বলতে ও করতে কমই সাহসী হতেন। হযরত ইবনে উমর, হযরত আয়েশা, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরে রয়েছেন।

তাবেঈনদের ভেতর এ পদ্ধতিতে শরীআতের বিধান আহরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন মদীনার সাত ফকীহ্। বিশেষত মদীনায় ইবনে মুসাইয়াব, মক্কায় আতা ইবনে আবু রুবাহ, কুফায় ইবরাহীম নাখঈ, শুরায়েহ, সা'বী ও বসরায় হাসান (রহঃ) অবস্থান করতেন।

বলা বাহুল্য, শরীআতের বিধিবিধান উদ্ভাবনের যে দুটো পদ্ধতি বলা হলো তার ভেতরকার যে ব্যবধান বিদ্যমান তা ঘুচাবার উপায় হলো পরস্পর সম্পূরক হওয়া। এর কোনো পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বরং একটি অপরটির সহায়ক।

পয়লা পদ্ধতি অর্থাৎ সরাসরি কুরআন-হাদীসের আয়াত ও বাণী থেকে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে এ ক্ষতির আশংকা থাকে যে, তার যে তাৎপর্য নেয়া হয় তা যথাযথ নাও হতে পারে। পটভূমির প্রেক্ষাপটে তাৎপর্য ভিন্নতর হতে পারে। দ্বিতীয় শংকা এই যে, বিশেষ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত বক্তব্যকে সকল ক্ষেত্রের জন্যে সামগ্রিক বিধান হিসেবেই বর্ণনাকারী গ্রহণ করে থাকেন। তৃতীয় ক্ষতির আশংকা এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একটি পছন্দনীয় কাজ যাতে সবাই করে তার জন্যে জোর দিয়ে হয়ত কোনো বক্তব্য রাখলেন। অথচ বর্ণনাকারী সেটাকে ওয়াজিব ভাবলেন ও তা বর্জনকে হারাম বলে দিলেন। অথচ ব্যাপারটি কার্যত তা নয়। বস্তুত, সে লোক ফকীহ্ এবং

ঘটনার সময় উপস্থিত থাকেন, তিনিই কেবল ঘটনার সব কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে মূল অবস্থাটি অনুধাবন করে থাকেন। যেমন মুযাবআতের ক্ষেত্রে ফল পাকার আগে আগাম বেচা-কেনা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যকে হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন : নিষেধ করাটা ছিল নিছক পরামর্শ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ ইজতেহাদী পদ্ধতিতেও এ ক্ষতির আশংকা থাকে যে, তার ভেতর কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান উদ্ভাবনে সাহাবা ও তাবেঈনদের অনুমান আন্দাজেরও সংযোগ ঘটে। অথচ এটা জরুরি নয় যে, সব অবস্থাতেই ইজতেহাদ করতে হবে। অনেক সময় এমন হয় যে, ইজতেহাদকারীর কাছে প্রয়োজনীয় হাদীসটি পৌছেনি অথবা তা পৌছলেও গ্রহণযোগ্যভাবে পৌছেনি। তাই তিনি সে হাদীসটি কাজে লাগাননি। অথচ দেখা গেল, তারপর অন্য কোনো সাহাবীর বর্ণনায় ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল। যেমন, ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে, তায়াম্মুমের ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তব্য।

অনেক সময় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যে কোনো একটি কল্যাণপ্রদ নীতির ওপর একমত হয়েছেন। সেখানে আকলী দলীলের ওপরেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ -

অর্থাৎ আমার পরে তোমাদের ওপর আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি ওয়াজিব করা হলো।

অথচ শরীআতের মূলনীতিতে এ ধরনের মতৈক্যের উল্লেখ নেই। মূলত যে ব্যক্তির বর্ণনা ও তার ব্যবহৃত শব্দাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে, তার জন্যে পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকা সহজ।

ব্যাপার যখন এই, তখন ফিকাহ শাস্ত্র নিয়ে ধ্যান-গবেষণাকারীদের জন্যে অপরিহার্য হচ্ছে বিধান উদ্ভাবনের উভয় পদ্ধতিকে তৃপ্তি সহকারে পুরোপুরি কাজে লাগানো। সে জন্যে তাদের উভয় মজহাবের ব্যাপারে পুরোপুরি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

জাতির সর্বোত্তম বিধান সেগুলো যার ওপর অধিকাংশ বর্ণনকারী ও ইলমের ধারক ও বাহকরা মতৈক্যে পৌছেছেন এবং সে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৭৭

হাদীস গ্রন্থের স্তরবিন্যাস

মনে রাখা দরকার, শরীআত ও তার বিধান জানার জন্যে আমাদের একটি মাধ্যম, আর তা হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্তা ও বাণী। তবে অভিজ্ঞতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শিতা ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু জনকল্যাণমূলক জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্তা পৌঁছাবার একটাই মাধ্যম আর তা হচ্ছে খবরে মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদের বার্তা যা অমুক থেকে অমুক নিয়মে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। হোক তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সরাসরি কথা কিংবা কোনো সাহাবীর মাধ্যমে পাওয়া কথা। তাও আবার হওয়া চাই সাহাবা ও তাবেঈনদের একটি দলের থেকে পাওয়া বিশুদ্ধ বর্ণনা। তাও এভাবের বর্ণনা হতে হবে যে, শরীআত প্রবর্তকের ইঙ্গিত না পেয়ে তার নামে এরূপ দৃঢ়তার সাথে তারা বর্ণনা করতে পারতেন না। এ ধরনের বর্ণনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সামান্যরূপে গৃহীত হয়।

আমাদের যুগে সে সব বর্ণনা লাভের একমাত্র উপায় হলো হাদীস সংকলনসমূহ। কারণ, এখন আর এমন কোনো বর্ণনা অবশিষ্ট নেই যা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। তবে হাদীস সংকলনগুলোর কয়েকটি স্তর ও বিভিন্ন মর্যাদা বিন্যস্ত হয়েছে। তাই এ স্তর ও মর্যাদার পার্থক্যগুলো জানা দরকার। যেমন বিগত পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, হাদীসের সর্বোত্তম শ্রেণী হলো মুতাওয়াতের হাদীস। সমগ্র উম্মত তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে একমত। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত মুস্তাফীজ হাদীস। কারণ তাতে কোনো নির্ভরযোগ্য সংশয় অবশিষ্ট নেই। যুগের অধিকাংশ ফিকাহবিদ তা গ্রহণ ও বাস্তবানে একমত হয়েছেন। অথবা সে সব হাদীস বিশেষত হারামাইন শরীফের আলিমদের মাঝে সেগুলোর ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। যেহেতু প্রাথমিক যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজধানী ছিল হারামাইন এবং সব যুগের হাদীসের আলেমগণ সেখানে যাতায়াত করতেন, তাই সেখানকার হাদীসবেত্তা আলেমগণ কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে কিংবা সমর্থন করতে পারেন না। অথবা সে সব হাদীস যা এক

বিশাল এলাকায় মশহুর ও সুপরিচিত এবং সে এলাকার সব মুসলমান তা মেনে চলছে। আর তা বর্ণিত হয়েছে সাহাবা ও তাবেঈনদের বড় একদল থেকে।

তৃতীয় স্তরে রয়েছে সে সব হাদীস যার সনদ সহীহ কিংবা হাসান এবং হাদীস বিশারদ আলেমগণ তার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু সে হাদীস এরূপ মাতরুক নয় যে, কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি।

পক্ষান্তরে যে হাদীসের সনদ ও মতন অর্থাৎ সূত্র ও বাক্য মাওজু ও জঈফ হয় কিংবা মাকলুব বা মজহুল হয় বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয় কিংবা সে যুগের মরুস্তরের পূর্বসূরিগণ সে বর্ণনার বিরুদ্ধে একমত, এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণের কোনো উপায় নেই।

সহীহ বা শুদ্ধ সংকলনের অর্থ এই যে, গ্রন্থের সংকলক নিজকে সীমিত রেখেছেন শুধুমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস সংকলনের জন্যে। তিনি মাকলুব, শাজ ও জঈদ হাদীস সাংকলিত না করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। যদি তিনি সে ধরনের কোনো হাদীস তাঁর সংকলনে ঠাঁই দেন তো তার অবস্থাও সাথে সাথে বলে দেবেন। অবস্থা বর্ণনাসহ সেরূপ কোনো হাদীস উদ্বৃত করা অন্যায় নয়।

মশহুর হাদীস মানে উক্ত হাদীসগুলো সংকলিত হবার আগে ও পরে সব যুগেই হাদীসবেত্তাদের মুখে মুখে চলে আসছিল। হাদীসের ইমামগণ কিতাব সংকলনের আগেই বিভিন্ন সূত্রে সে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর সেগুলো নিজ নিজ মুসনাদ বা জামে সংকলনে সন্নিবেশিত করেছেন। পরিশেষে সে সব সংকলনের বর্ণনাগুলো হিফজ করার ব্যবস্থা করেছেন। তার ওপর যত প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তার বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তার হরকত ঠিক করা হয়েছে। তার সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এমনকি সে সব থেকে ফিকাহর মাসআলা বের করা হয়েছে। তার বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। এমনকি এ কাজ আজও অব্যাহতভাবে চলছে। অবশেষে ইল্লা মাশাআল্লাহ এমন কোনো সংশ্লিষ্ট দিক হাদীসের অবশিষ্ট নেই যা বিশ্লেষিত ও পর্যালোচিত হয়নি।

হাদীসের চুলছেঁড়া বিশ্লেষক ও সমলোচকগণ হাদীস সংকলকের সংকলনপূর্ব বর্ণনা ও পরবর্তী গ্রন্থনা উভয় ব্যাপারে পর্যালোচনা করে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সংকলনের নির্ভুলতার ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন। তারা সংকলকের মতামতের সাথেও মতৈক্য প্রকাশ করেছেন এবং তাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অধিকন্তু ফিকহার ইমামগণ সে সংকলন থেকে হাদীস নিয়ে শরীআতের

মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন; সেগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন ও আস্থা স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা সংকলকের ভক্ত হয়েছেন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

মোটকথা, যখন কোনো কিতাবে এ দুটো বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে তখন সেটি প্রথম স্তরের বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে যার ভেতরে এ দুটো বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তা অনির্ভরযোগ্য। পয়লা স্তরের কিতাবের ভেতর সর্বোচ্চ মর্যাদা সেই কিতাবের, যার ভেতর মুতাওয়াতার হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে। পরবর্তী মর্যাদায় রয়েছে অকাট্য বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব। অকাট্য বিশুদ্ধ সেগুলোকে বলা হয় যার দ্বারা হাদীস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় স্তরের হাদীস সংকলনে মুস্তাফীজ, কেতঈ বা জন্নী হাদীসের প্রায় সমমানের হাদীস রয়েছে। এভাবে হাদীস ও তার সংকলন গ্রন্থের মর্যাদার ক্রমহ্রাস ঘটবে।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, পয়লা স্তরে মাত্র তিনটি গ্রন্থ রয়েছে।

১। সহীহ বুখারী, ২। সহীহ মুসলিম ৩। মুআত্তা ইমাম মালিক। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতর কিতাব হলো মুআত্তা ইমাম মালিক। এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত যে, ইমাম মালেক ও তাঁর মতাবলম্বীদের মতানুসারে মুআত্তার সকল হাদীসই বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে, তাঁর বিরোধীদের মতানুসারেও তাতে এমন কোনো মুরসাল ও মুনকাতে হাদীস নেই যার সনদ ভিন্ন ধারার মাধ্যমে মুত্তাসিল হয়নি। এ দিক বিবেচনায়ও সংকলনটি সহীহ।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর যুগে বহু মুআত্তা সংকলিত হয়েছে। তাতে মুআত্তায়ে মালিক থেকে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে মুনকাতে হাদীসগুলোকে মুত্তাসিল বলা হয়েছে। যেমন ইবনে আবু জি'ব, ইবনে উআইনা, ছাওরী, শি'মারী প্রমুখের সংকলন। তাদের এবং ইমাম মালিকের (রহঃ) উস্তাদগণ এক।

আরেক কথা, ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে এক হাজারের বেশি লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। দূর দূরান্তর থেকে লোক ইমাম মালিকের (রহঃ) কাছে ইলম হাসিলের জন্যে উটে চড়ে আসতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বড় বড় ফকীহ রয়েছেন। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ), মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ), ইবনে ওহাব, ইবনে কাসেম প্রমুখ। তেমনি রয়েছেন বড় বড় মুহাদ্দিস ঃ যেমন ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ও আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ।

তাঁর অনুসারী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন হারুনুর রশীদ ও তাঁর ছেলে আমীন ও মামুনুর রশীদ। ইমাম মালিকের যুগেই তাঁর এ কিতাব অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। সমগ্র মুসলিম জাহানেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী যুগে উত্তরোত্তর তাঁর সুখ্যাতি বেড়েই চলল। কিতাবটির দিকে সবারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। বিভিন্ন শহরের ফকীহগণ বিশেষত বাগদাদের বাসিন্দারা এ কিতাবকে বিভিন্ন ব্যাপারে ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করল। হাদিসবেত্তারা এ গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে চললেন। তারা এর হাদীসের গুণাবলি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরলেন। তার মুতাবেআত ও শাওয়াহেদ বর্ণনা করলেন। গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা দিলেন। তার ব্যাপারের জটিলতা দূর করলেন। তা থেকে সৃষ্ট মাসআলা নিয়ে পর্যালোচনা চালালেন। তার বর্ণনাকারীদের পরিচিতি ও অনুসন্ধান এ পর্যায়ে পৌছলেন যে, তা নিয়ে আর কারো ভাবার অবকাশ থাকল না।

যদি সুস্পষ্ট সত্য বুঝতে চান তো মুআত্তার সাথে ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আছার ও ইমাম আবূ ইউসুফের কিতাবুল আমাল তুলনা করুন। অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন। আপনি কি কখনো দেখেছেন যে, কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহ সে কিতাব দুটোর দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেছেন?

তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত যে, সে দু'গ্রন্থে যে সব মুত্তাসিল ও মারফূ বর্ণনা রয়েছে তা সবই অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। আর সে বর্ণনাগুলো গ্রন্থকারদের পর্যন্ত মুতাওয়াতার বর্ণিত হয়েছে। যে লোকই এ দুটোকে সাধারণ কিছু ভাববে যে বিদআতী। সে ঈমাদারদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে পা বাড়িয়েছে।

যদি এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে চান তাহলে সে গ্রন্থদ্বয়ের সাথে ইবনে আবি সায়বার কিতাব, তাহাভীর কিতাব ও মুসনাদে খাওয়ারিযমীর তুলনা করুন। তাহলে সেক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন।

ইমান হাকেমের সংকলিত 'মুস্তাদরাক'–এ সেসব হাদীস সংকলিত হয়েছে যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক বিশুদ্ধ, অথচ তাঁরা তার উল্লেখ করেননি। আমি ইমাম হাকেমের মুস্তাদরাক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেলাম– এক বিবেচনায় তা সঠিক হলেও অন্য বিবেচনায় সঠিক নয়। কারণ, ইমাম হাকেম সে সব বর্ণনকারীর হাদীসই নিয়েছেন যাদের থেকে শায়খাইন নিয়েছেন। বিশুদ্ধতা ও অবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত তাঁদের শর্তও তাতে বিদ্যমান। তবে শায়খাইন তাদের সেসব হাদীসই নিয়েছেন যেসব বর্ণনা তাঁদের

উস্তাদরা বিশ্লেষণ করে এজমায় পৌঁছেছেন। যেমন ইমাম মুসলিম বলেছেন : 'আমি আমার সংকলনে সে সব বর্ণনারই সমাবেশ ঘটিয়েছি যার ওপর মুহাদ্দিসদের ইজমা হয়েছে।'

ইমাম হাকেম স্বতন্ত্রভাবে যে সব বড় বড় হাদীস বর্ণনা করেছেন তা নির্ভরযোগ্য। সেগুলো শায়খাইনের উস্তাদদের যুগে প্রকাশ পায়নি। হয়ত পরে তা খ্যাতি লাভ করেছে, অথবা তার বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মতভেদ ছিল। বস্তুত শায়খাইন তো তার উস্তাদ ছিলেন। তাঁরা বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে হাদীসগুলোর বক্তব্য বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। ফলে অবশেষে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যেত।

ইমাম হাকেম বেশির ভাগ সেসব নিয়ম পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেছেন যা তিনি মুহাদ্দিসদের হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক রচনা থেকে অর্জন করেছেন। যেমন তিনি বলেন : 'নির্ভরযোগ্যতায় আধিক্য গ্রহণযোগ্য'। মানে, যখন লোকদের ভেতর মুত্তাসিল, মুরসাল, মওকূফ ও মারফূ প্রভৃতি প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়, তখন যে বেশি স্মরণ রাখতে পেরেছেন তারটা প্রাধান্য পাবে, যে সেরূপ স্মরণ রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন তার ওপর। সত্য ঘটনা এটাই যে, সাধারণত হাফেজদের স্মৃতি বিভ্রাটের কারণেই মাওকূফ ও মুনকাতেকে মুত্তাসিল বানানোর ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এ কারণে যে, তাদের ভেতর হাদীসটিকে মারফূ বা মুত্তাসিল বানানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে এবং সেদিকেই তারা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। বস্তুত, শায়খাইন এমন বহু হাদীসকে স্বীকৃতি দেননি যেগুলো ইমাম হাকেম গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কাযী আয়ায তাঁর "মাশারিকুল আনওয়ার" গ্রন্থে উক্ত তিনটি সংকলনের জটিল ব্যাপারগুলো বিধিবদ্ধ করেছেন ও যা কিছু বিকৃতি-বিচ্যুতি ঘটেছে তা দূর করার ব্যবস্থা করেছেন।

দ্বিতীয় স্তরে সে সব সংকলন রয়েছে যার মান সহীহাইন বা মুআত্তার পর্যায়ে নয়। অবশ্য তার কাছাকাছি বলা যায়। সেগুলোর রচয়িতাদের নির্ভরযোগ্যতা, ন্যায়ানুগতা, স্মৃতিশক্তি ও হাদীস শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে। তাদের সংকলনে হাদীস নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত অনুসরণ করেছেন তাতেও কোনো দুর্বলতা নেই। পরবর্তী যুগের লোক তাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সব যুগের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ তাদের সংকলনের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। ফলে সর্বস্তরের লোকদের ভেতর তা খ্যাতি অর্জন করেছে। উলামায়ে কিরামও সে

সবের গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বর্ণনাকারীদের বিশ্লেষণ করেছেন, মাসআলা মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন ও সেগুলোকে জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজী ও মুসতাবান, নাসায়ী। এ সংকলনগুলো পয়লা স্তরের কাছাকাছি স্তরে রয়েছে। ইমাম রযীন, 'তাজরীদুস সিহাহ্' ও ইবনে আছীর 'জামেউল উসুল' গ্রন্থে সে সব সংকলনের হাদীসগুলো সন্নিবেশিত করেছেন।

মুসনাদে আহমদও এ স্তরের কাছাকাছি রয়েছে। কারণ, ইমাম আহমদ এ মূলনীতি গ্রহণ করেছেন যে, এ সংকলন দ্বারা সহীহ ও গায়রে সহীহ হাদীসের পার্থক্য জানা যাবে। বস্তুত তিনি বলেছেন– এ কিতাবে যে হাদীস ঠাঁই পায়নি তা গ্রহণ করো না।

তৃতীয় স্তরের হাদীসের কিতাব হলো সে সব মুসনাদ, জামে ও মুসান্নাফ রয়েছে যেগুলো বুখারী ও মুসলিম সহ সমসাময়িক কালে রচিত কিতাবসমূহের আগের যুগের কিংবা পরে রচিত হয়েছে। তার ভেতরে সহীহ, হাসান, জঈফ, মা'রূফ, গরীব, শাজ, মুনকার, ভুল, সঠিক, ছাবেত, মাকলূব– এ কথায় সব ধরনের হাদীস জমানো হয়েছে। আলেমদের ভেতর সেগুলো তেমন খ্যাতিও অর্জন করেনি। অবশ্য সেগুলোর সাধারণ পরিচিতি রয়েছে।

সেগুলোর ভেতরে যে সব হাদীস তারা স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত করেছেন, ফিকাহবিদরা সেগুলো বেশি ব্যবহার করেননি। মুহাদ্দেসগণও সেগুলোর সহীহ বা গায়রে সহীহ হওয়া নিয়ে তেমন আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে যাননি।

তার ভেতর এমন কিতাবও রয়েছে ভাষাবিদরা গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তা থেকে কোনো হাদীস নেননি। কোনো ফিকাহবিদও পূর্বসূরিদের মজহাবের সাথে তার সমন্বয় বা সংযোগ দেখতে যাননি। কোনো মুহাদ্দিসও তার কোনো জটিলতা ব্যাখ্যা করেননি। কোনো ইতিহাসকারও তার বর্ণনাকারীর পরিচিতি লেখা প্রয়োজন ভাবেননি। আমি যাদের কিতাব সম্পর্কে বলছি, তারা পূর্বযুগের হাদীসের ইমাম ছিলেন, পরবর্তী যুগের সূক্ষ্মদর্শী মুহাদ্দিসদের কথা বলিনি। বস্তুত সে কিতাবগুলো এভাবেই অখ্যাত ও অপরিচিত অবস্থায় ছিল। যেমন আবূ আলীর মুসনাদ, আবদুর রায্যাকের মুসান্নাফ, আবূ বকর ইবনে শায়বার মুসান্নাফ, আব্দ ইবনে হামীদের মুসনাদ, মুসনাদে তায়ালেসী, বায়হাকীর কিতাব, তাহাবীর কিতাব ও তাবরানীর কিতাব।

সে সব মুহাদ্দিসদের উদ্দেশ্যই ছিল যা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় তা সবই সংকলিত করা। সেগুলো ছাঁটকাট করা, বিন্যস্ত করা ও কালোপযোগী করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

চতুর্থ স্তরের কিতাব সেগুলো যার রচয়িতারা দীর্ঘকাল পর এ নিয়ত করলেন যে, পূর্ববর্তী দু'স্তরের কিতাবে যে সব হাদীস নেয়া হয়নি সেগুলো একত্রিত করবেন। সে সব হাদীস মূলত যত অখ্যাত ও অপরিচিত কিতাবে মওজুদ ছিল। তারা সে হাদীসগুলোর গুরুত্ব দিলেন। এ সব হাদীস এমন সব রাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যাদের হাদীস মুহাদ্দিসরা লিপিবদ্ধ করেননি। সে সব বর্ণনাকারীরা ছিলেন যত সব ওয়ায়েজ, আনুসঙ্গিক কথা বলার লোক ও দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন লোক। তারা মূলত সাহাবা ও তাবেঈনদের কথাকেই হাদীস বলেছেন, অথবা বনী ইসরাঈলদের প্রচারিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন কিংবা জ্ঞানী গুণী ও ওয়ায়েজদের কথাকেই ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় নবীর হাদীস বলে চালিয়েছেন। অথবা কুরআন ও সহীহ হাদীসের এক অস্বচ্ছ ধারণাকে একদল নেককার লোক মারফু হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কারণ, রিওয়ায়েতের তত্ত্বই তাদের জানা ছিল না। কিংবা কিতাব ও সুন্নাতের ইঙ্গিতবহ একটি তাৎপর্যকে বর্ণনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মুত্তাসিল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। অথবা সে বর্ণনাটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন হাদীসে ছিল। সেগুলো একত্রিত করে একটি স্বতন্ত্র হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

এ সব হাদীসের সংকলন হলো ইবনে হাব্বানের আসুআফা ও ইবনে আদীর আল কামিল। তেমনি খতীব, আবু নাঈস, জুযকানী, ইবনে আসাকের, ইবনে নাজ্জার দায়লামীর সংকলনে সেগুলোই ঠাঁই পেয়েছে। মুসনাদে খাওয়ারিজমীও প্রায় এই স্তরের কিতাব।

এ স্তরের কিতাবের সবচেয়ে উত্তম হাদীস হলো জঈফ ও মুহতামাল হাদীস এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হাদীস হলো মাউজু ও মাকলুব হাদীস এবং চরম পর্যায়ের মুনকার হাদীস। ইবনে জাওযীর 'আল মাওজুআত' এ স্তরের কিতাব।

এরপর পঞ্চম স্তরও রয়েছে। এ স্তরের হাদীসগুলো ফকীহ, সূফী, ইতিহাসকার প্রমুখের মুখে মুখে চালু হয়ে গেছে, অথচ আগের চার স্তরে তার কোনো ভিত্তি নেই। এ স্তরের হাদীসের ভেতর সে সব হাদীসও রয়েছে যা বেদ্বীন ভষাভাষীরা তৈরি করে চালু করেছে। তারা এমন সব শক্তিশালী সূত্রের বরাত দিয়ে তা চালু করেছে যাদের সমালোচনাও চলে না। তদুপরি এরূপ আল তারিফ

ভাষায় তা বানানো হয়েছে যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষার মতোই মনে হয়। তারা ইসলামের ভেতর মারাত্মক গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যখন বড় বড় হাদীস বেত্তা আলেম সেসব হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার মুতাবিআত ও শাওয়াহেদ পরখ করেছেন, তখনই তার আবরণ উন্মোচিত হয়েছে এবং হাকীকাত জাহের হয়েছে। অবশ্য মুহাদ্দিসগণ পয়লা দুই স্তরের হাদীসকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

তবে তৃতীয় স্তরের হাদীসের ওপর আমল করা ও তার স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে শুধু বড় বড় উঁচুদরের মুহাদ্দিসরাই পদক্ষেপ নিতে পারেন। কারণ, তারা রাবীদের পরিচিতি ও বর্ণনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছেন। অবশ্য এ স্তরের হাদীসগুলো থেকে অধিকাংশ মুতাবিআত ও শাওয়াহেদ সংগ্রহ করা হয়েছে। কারণ قد جعل الله لكل شئ قدرا অর্থাৎ আল্লাহ সব বস্তুর একটা পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন। তবে চতুর্থ স্তরের হাদীসগুলো সংকলিত করা, তা থেকে মাসআলা উদ্ভাবন ও তা নিয়ে গবেষণা চালানো উত্তরসূরিদের কাজ।

যদি সত্য কথা জানতে চান সেটা এই যে, রাফেজী, খারেজী ও বিদআতীরা এসব হাদীস থেকেই তাদের স্বপক্ষে দলীল ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে থাকে। এ কারণেই হাদীসবেত্তা উলামায়ে কেরাম এসব হাদীস থেকে দলীল প্রদান বৈধ ভাবেন না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৭৮

বাক্যের মর্মানুধাবনের অবস্থা

জানা দরকার, বক্তার মনের কথা ব্যক্ত করা ও শ্রোতার তা উপলব্ধি করার কয়েকটি স্তর রয়েছে। সেগুলো প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অবস্থার ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়। সর্বোন্নত অবস্থা সেটি যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ প্রমাণিত হয়। বাক্যটি একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারই প্রকাশ করবে এবং তাতে অন্য কিছু বোঝার কোনো অবকাশ থাকবে না।

পরবর্তী স্তরে রয়েছে সেই বাক্য যাতে পূর্বোক্ত তিনটি শর্ত-সীমার কোনোটিই বিদ্যমান নেই। মানে, নির্দেশটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। এ ব্যাপকতা বস্তুর নামোল্লেখ করেও হতে পারে কিংবা স্থলাভিষিক্ত দ্বারা পরিবর্তনের মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন– মানব জাতি, মুসলিম জাতি, নারী জাতি বা পুরুষ জাতি। যখন ইঙ্গিতবহ নাম ব্যবহৃত হয় এবং উদ্দিষ্ট বস্তু ব্যাপক হয়, তাও এ

শ্রেণীভুক্ত। তেমনি গুণবাচক বিশেষ্য যদি অনির্দিষ্ট গুণের অধিকারী হয় কিংবা অনির্দিষ্ট বস্তুর নিষিদ্ধতা আসে, তাও এ শ্রেণীভুক্ত। তা এ কারণে যে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকতার সাথেও নির্দিষ্টতার সংযোগ ঘটে যায়। অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য বুঝাবার জন্যে বাক্যটি না বলা হলেও সেই নির্দিষ্ট স্থানে উদ্দেশ্যটি আপনা থেকেই অনিবার্যভাবে ব্যক্ত হয়ে যায়। যেমন 'আমার কাছে বিত্ত যায়েদ এল' অথবা 'দরিদ্র যায়েদ এল'। এখানে বিত্ততা বা দরিদ্রতা যায়েদের সাথে অনিবার্যভাবে জুড়ে যাবে।

যে বাক্যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ রয়েছে তাও এ স্তরভুক্ত। শব্দটির যদিও মূল অর্থই ব্যবহৃত হয়, তথাপি তার পারিভাষিক অর্থও বেশ মশহূর।

অথবা এমন শব্দ যার অর্থ উদাহরণ ও শ্রেণীভুক্তকরণের মাধ্যমেই মশহুর হয়, অন্যথায় জানা যায় না। যেমন সফর। এ সফর মক্কা-মদীনায় হতে পারে, এ সফর প্রমোদ ভ্রমণ হতে পারে, এ সফর এমন কোনো প্রয়োজনীয় কারণে হতে পারে যা শেষ করে সেদিনই বাড়ি ফিরতে হবে। আবার কোনো সফর এমনও হয় যার সময় সীমা থাকে না।

কখনো ইঙ্গিতবহ বিশেষ্য দ্বারা দু'ব্যক্তির যে কোনো এক জনকে বুঝানো হয়, অথচ লক্ষণ দ্বারাও তা ধরা যায় না। এরূপ বিশেষ্যযুক্ত বাক্যও এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তেমনি একই অবস্থার সর্বনামও এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের যখন উদ্দিষ্ট বস্তু একই হয়, অথচ লক্ষণে তারতম্য সৃষ্টি হয়, তা হলেই এ শ্রেণীর বাক্য উদ্ভূত হয়।

তার পরবর্তী স্তরে রয়েছে সেই বাক্য যার অর্থ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যম ছাড়াই বুঝা যায়। এরূপ বড় বড় তিনটি পন্থা বিদ্যমান রয়েছে।

১। বাক্যের বক্তব্য বা তাৎপর্য ঃ তা হচ্ছে এই, বাক্য শোনামাত্র উহ্য তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু বুঝা যায়। মানে, যে উদ্দেশ্যে নির্দেশটি এল তার তাৎপর্য বাক্যের বক্তব্য থেকে জানা যায়। যেমন, "তাদের 'উফ' বলো না" বাক্য থেকে এ বক্তব্যই বেরিয়ে আসে যে, তাদের নির্যাতন করো না। মানে, তাদের কষ্ট দেয়া হারাম। আরেক উদাহরণ এই ঃ যে ব্যক্তি রোযার দিনে খেল তার উপর কাযা ওয়াজিব হলো। এখানে বুঝা যায় যে, খাওয়া বলে মূলত রোযা ভঙ্গ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কোনোভাবে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ওয়াজিব হবে। খাওয়া শব্দটি সহজবোধ্য বলেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২। বাক্যের চাহিদা বা দাবি ঃ তা হচ্ছে এরূপ যে, স্বভাবগত, জ্ঞানগত বা শরীআত মতে বাক্যের যে অর্থটি অপরিহার্য হয়। যেমন, আমি মুক্ত করেছি

কিংবা আমি বিক্রয় করেছি। এ বাক্যদ্বয় দাবি করে যে, মুক্তিদাতা বা বিক্রেতার মুক্ত ব্যক্তি বা বিক্রিত বস্তুর মালিকানা রয়েছে। যেমন বলা হলো, সে চলছে। এ চলা কাজটি দাবি করে যে, তার পা দুটো ঠিক আছে। তেমনি যদি বলা হয়, সে নামায পড়ছে, তা হলে তা দাবি করছে যে, তার ওজুও রয়েছে।

৩। **বাক্যের ইঙ্গিত ঃ** তা হচ্ছে এই যে, বাক্যের ভেতর যথোপযোগী বাক্যাংশ যোগ করে উদ্দেশ্য আদায় করা। বস্তুত আলংকারিকদের লক্ষ্য হয়, আসল উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত কিছু পেতে গিয়ে বাক্যের কাঠামোকে এরূপ উপযোগী করা যেন বাক্য থেকেই অতিরিক্ত অর্থটি বুঝা যায়। যেমন– কোনো বস্তুর ব্যাপারে বিশেষ গুণ বা শর্ত জুড়ে দেয়া যাতে বুঝা যায় যে, সেই গুণ বা শর্ত না পাওয়া গেলে নির্দেশটি অকার্যকর হবে। হ্যাঁ, তবে যদি এখানে প্রশ্নোত্তরের উদ্দেশ্য না থেকে থাকে, আর না বিভিন্ন বুদ্ধির লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপনের মতো বক্তব্য না হয়, আর নির্দেশের কল্যাণকারিতা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তা হলেই কেবল তখনই তা ঘটবে। ঠিক এরূপই ব্যতিক্রমধর্মীতা সীমাবদ্ধতা ও সংখ্যা নির্ধারণের তাৎপর্য গ্রহণের অবস্থা।

ইঙ্গিতবাহী বাক্যের বিবেচনার শর্ত এই যে, তার কারণে ভাষাভাষির জ্ঞাত অর্থের ভেতর সংকট সৃষ্টি হয়। যেমন কেউ বলল, আমার ওপর দশটির দেয়া অপরিহার্য শুধু একটি বস্তু ছাড়া, অবশ্য আমার ওপর একটা অপরিহার্য। জমহুর উলামার অভিমত, এ বাক্যটি পরস্পর বিরোধী। যে বাক্যের তাৎপর্য শুধু ন্যায়শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অনুশীলনে জানা যায় তা নির্ভরযোগ্য হয় না।

তারপরের স্তরে হলো সে সব বাক্য যা থেকে তার বিষয়বস্তুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। কোনো কিছুকে ব্যাপকতাবোধক বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন, দন্ত-নখর বিশিষ্ট জীবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাঘের মতোই অন্যান্য হিংস্র জীব হারাম হওয়া। সাযুজ্যপূর্ণ লক্ষণ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। তেমনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : গাধার ব্যাপারে আমার কাছে এ ব্যাপকার্থ বোধক আয়াত ছাড়া আর কিছুই নেই, আয়াতটি হচ্ছে ঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

"অনন্তর যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র ভালো কাজ করেন তা তিনি দেখেন এবং যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র খারাপ কাজ করেন তাও তিনি দেখেন।

এ আয়াত থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ দলীল নিলেন যে, 'অতএব তাঁর পথেই চল।'

২। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَظَنَّ دَاؤُدَ اَنَّمَا فِتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ -

অর্থাৎ দাউদের ধারণায় এল, নিঃসন্দেহে আমি তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি। তাই সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইল ও মাথা ঝাঁকিয়ে রুকু করল এবং নিকটবর্তী হলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের নবীর ওপর নির্দেশ ছিল যে, তাকে যেন অনুসরণ করেন।

দলীল নেয়ার ব্যাপারটি কখনো হ্যাঁবাচক আর কখনো না বাচক বাক্য দ্বারা হয়। যেমন, বিতর নামায যদি ওয়াজিব হতো তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে বসে তা আদায় করতেন না, অর্থাৎ তিনি সেটাই করেছেন।

৩। কখনো শর্তযুক্ত কিয়াস দ্বারা দলীল বের করা হয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا -

অর্থাৎ যদি আসমান ও যমিনে আল্লাহ ছাড়া আরও প্রভু থাকত তা হলে দুটোই ধ্বংস হতো।

কখনো কিয়াস করা হয় এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সাদৃশ্যের কোনো একটি যোগসূত্র বা কারণকে ভিত্তি করে। যেমন, গমের মতোই চানাতেও সুদ ধার্য হবে। এর অপর উদাহরণ হলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী ঃ

"যদি তোমার বাপের ওপর ঋণ থাকত, তা হলে তুমি তা আদায় করলে কি আদায় হতো? সাহাবী বললেন, হাঁ, হতো। তিনি তখন বললেন, তা হলে বাপের পক্ষে থেকে হজ্ব কর।" আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৭৯

কিতাব ও সুন্নাহ্ থেকে শরীআত বুঝার উপায়

জেনে নিন, যে সব শব্দ সন্তোষ কিংবা অসন্তোষের প্রমাণ দেয় তা হচ্ছে, ভালোবাসা, ঘৃণা, অভিশাপ, দয়া, নৈকট্য ও দূরত্ব। তেমনি যে সব শব্দে ক্রিয়া প্রিয় ও অপ্রিয় লোকের সাথে সম্পৃক্ত হয় সেগুলো। যেমন মুমিন, মুনাফেক, ফেরেশতা, শয়তান, জান্নাতী, জাহান্নামী। তেমনি যে সব শব্দে আদেশ বা নিষেধমূলক কাজের পরিণাম ব্যক্ত হয়। যেমন প্রশংসনীয় কার্যাবলি বা নিন্দনীয় কার্যাবলি। তেমনি সে সব ক্রিয়া যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করার কিংবা না করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম ও মাকরূহর ভেতর পার্থক্য থাকা চাই। তার সুস্পষ্ট পন্থা হলো এই যে, সে কাজটি যে করবে না তার অবস্থা কি হবে সেটা বর্ণনা করা। যেমন, যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, কেয়ামতের দিন তার সম্পদ তার সামনে সাপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে (হাদীস)। অন্যত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে তা করে না, তার কোনো ক্ষতি নেই।'

পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত শব্দাবলি এরূপও হয়, য়্যাজিবু অর্থাৎ ওয়াজিব, হালাল নয়। তা ছাড়া কোনো কিছুকে ইসলাম বা কুফরের অঙ্গ কিংবা কঠোরভাবে কোনো কাজ করা বা না করার নির্দেশ দেয়া হয় তা থেকেও বিধানের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তেমনি যদি বলা হয় এ কাজটা মানবতা পরিপন্থী এবং এটা অনুচিত কাজ, এতেও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তেমনি সাহবায়ে কেরাম ও তাবেঈন যদি কোনো বিধান বলে থাকেন। যেমন– উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, বিতর নামায ওয়াজিব নয়। তারপর উদ্দেশ্যের অবস্থা বিচার করে দেখতে হবে কাজটি ইবাদতে প্রদায়ক কিংবা পাপ পথের প্রতিবন্ধক কিনা? অথবা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং উত্তম শিষ্টাচারের কাজ কি না?

অতঃপর যদি কারণ, অঙ্গ ও শর্ত জানতে হয় তা হলে তার পরিষ্কার পন্থা হলো এই, সেটা কোনো বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেমন 'সকল নেশার দ্রব্য হারাম'। কিংবা 'সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায নেই' অথবা 'তোমাদের নামায ততক্ষণ কবুল হবে না যতক্ষণ ওজু না করবে।'

এরপর মর্য্যাদা হলো ইঙ্গিত, ইশারা দ্বারা প্রমাণিত হওয়া বিধান। যেমন কেউ বলল, 'আমি রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি গোলাম আজাদ কর। তেমনি কেয়াম, রুকূ ও সিজদাকে নামায নামে দেখা থেকে জানা গেল যে, সেগুলো নামাযের অঙ্গ।

তেমনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ওটা (মুজা) থাকতে দাও। আমি পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করেছি।' এতে জানা গেল, পবিত্রাবস্থায় মুজা পরা শর্ত।

তাছাড়া কারণ, শর্ত ও অঙ্গ জানার পদ্ধতি এটাও যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্তু পাওয়া গেলে হুকুম দেয়া হয়, না পাওয়া গেলে দেয়া হয় না। বস্তুর উপস্থিতিই তার কারণ, শর্ত ও অঙ্গের ধারণাকে মগজে বদ্ধমূল করে। যেমন কোনো ফার্সি ভাষাভাষী আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করল। তারপর লক্ষণ অনুসারে যথাস্থানে যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করল। ফলে তার মগজে আরবী ভাষার আভিধানিক অর্থ স্থায়ী হয়ে গেল। অথচ তার পারিভাষিক জ্ঞান অর্জিত হলো না। তাই শাব্দিক অর্থ অনুসারে বাক্য সাজানোই তার সার হলো। কারণ, তার তো শুধু প্রয়োগ বিধিই জানা আছে। তাই যখন আমরা শরীআত প্রণেতাকে দেখতে পাই যে, যখনই তিনি নামায় পড়েন, তখন রুকু সিজদা করেন ও পাক-পবিত্র হয়ে নেন এবং প্রতিবারেই তিনি এরূপ করেন, তখন আমাদের প্রত্যয় জন্মে যে, এটাই উদ্দিষ্ট বিষয়। সত্যি কথা তো এটাই যে, সাধারণত আসল বৈশিষ্ট্য জানার পদ্ধতি ও ভিত্তি এটাই।

যখন আমরা লোকদের দেখি, তারা কাঠ জোগাড় করে তা দিয়ে বসার আসন তৈরি করে ও সেটাকে তখত নাম দেয়। আমরা তা থেকে তার মৌলিক গুণাবলি বুঝে নেই। তারপর সাজসজ্জা সাদৃশ্য ও জনপরিচিতির ভিত্তিতে মূল উপাদান আবিষ্কার করি।

অবশ্য যার ওপর বিধিবিধান নির্ভরশীল সে সব উদ্দিষ্ট বস্তুর পরিচিতি অর্জন বড়ই সুসম জ্ঞানের ব্যাপার। সে জ্ঞানের সমুদ্রে সেই লোকই ডুব দিতে পারে, যার মেধা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ এবং তার বোধশক্তি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। সাহাবায়ে কেরামের ফকীহবৃন্দ পুণ্য ও পাপ কাজের মূলনীতি স্থির করেছেন সে সব মশহুর কার্যাবলির ভিত্তিতে যা ছিল সেকালের সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আরবের মুশরিক ও ইহুদি নাসারাও যুক্ত ছিল। সে কারণেই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে কার্যকারণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে বহাস করার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য

শরীআতের আইন-কানুন অবকাশ দান ও সহজীকরণের নিয়মনীতি এবং দ্বীনের বিধানাবলি তারা নির্দেশদান ও নিষিদ্ধ করা থেকে বুঝে নিয়েছিলেন। কিন্তু হেকীমের দীর্ঘ সাহচর্য ও তার ব্যবস্থাবলি নিরীক্ষণ করে যেভাবে কোনো লোক বিভিন্ন দাওয়াইর উদ্দেশ্যাবলি বুঝতে পায় এও তেমনি ব্যাপার বৈ নয়।

সাহাবায়ে কেরাম শরীয়তী আইন কানুন জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে আসীন ছিলেন। এক ব্যক্তি ফরয নামায পড়েই নফল নামায পড়ার উদ্যোগ নিলে উমর ফারুক (রাঃ) বললেন– এর ফলে তুমি আগের লোকের মতোই ধ্বংস হবে। এ কথা শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হে উমর! তোমার অভিমতকে আল্লাহ পাক যথার্থ বলেছেন। তেমনি জুমআর দিন গোসল করার কারণ বর্ণনা করেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। হযরত উমর (রাঃ) বলেন– আমার তিনটি কথা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সাথে মিলে গেছে। ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর বক্তব্যও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন তিনি বলেন– বিভিন্ন রোগে ফল-ফসল বিকৃত ও নষ্ট হলে --- ইত্যাদি। এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হলো হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ বক্তব্যটি ঃ নারীরা আজ যে ধরনের কাজ কারবার চালু করেছে, তা যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন তাহলে তাদের সেভাবেই মসজিদে আসতে বারণ করতেন যেভাবে বনী ইসরাঈলের নারীদের বারণ করা হয়েছিল।

শরীআতের মর্ম অনুধাবনের সেটাই সার্বিক পদ্ধতি যা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "তোমাদের জন্যে কিসাসের মধ্যেই জীবন রয়েছে হে জ্ঞানীবর্গ! তিনি আরও বলেন ঃ "আমি জানতে পেরেছি তোমরা গোপনে কিছু করছ-তাই আমি তোমাদের ক্ষমা করলাম ও ব্যাপারটি উপেক্ষা করলাম।" অন্যত্র তিনি বলেন; এখন তোমাদের বোঝা আল্লাহ হালকা করে দিলেন এবং তিনি জেনে গেছেন যে, তোমাদের ভেতর অলসতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন ঃ যদি তোমরা এরূপ না কর তাহলে বিশ্বে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ এক নারী ভুলে গেলে অন্য নারীটি স্মরণ করিয়ে দেবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'এ কারণে যে, সে জানেনা তার হাত রাত্রে কোথায় বিচরণ করেছে।' মানে তা কোন বস্তু স্পর্শ করেছে। তাঁর অন্য একটি বক্তব্য এই– (সকাল পর্যন্ত যে শুয়ে থাকে) শয়তান তার নাকের ভেতর রাত কাটায়।"

এর পরের মর্যাদা হলো ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যে অর্থ বুঝা যায় তার। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লা'নতের দুটো কারণ

থেকে বাঁচ।' অন্যত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অপবিত্রতার প্রতিবন্ধক হলো জাগ্রত দু'চোখ।

তার পরের মর্যাদা হলো ফকীহ সাহাবীদের বক্তব্যের। এর পরের মর্যাদা হলো হুকুমের কারণ এমনভাবে বের করা যা উদ্দিষ্ট বস্তুর দিকে ফিরে যায় এবং বস্তুটি মাসআলার উপমার সাথে খাপ খাইয়ে নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু দ্বীনের কোনো ব্যাপারে নিরর্থক কাজ কিছু নেই, তাই জরুরি হচ্ছে পরিমিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং সব কিছুর নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা। এটাও দেখা চাই যে, তার উপমা কেন নির্ধারিত হলো না? নির্বিশেষ ও বিশেষ নিয়ে পর্যালোচনা হওয়া চাই যে, কেন বিশেষ থেকে নির্বিশেষের অন্যান্যদের ছাটাই করা হলো? সে সবে কি উদ্দিষ্ট বস্তু অবর্তমান ছিল, না তার সাথে মোকাবেলার কারণে উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাধান্য পেল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৮০

পরস্পর বিরোধী হাদীসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি

আসল কথা তো এটাই যে, সব হাদীসের ওপরই আমল করা হবে। হ্যাঁ, যদি পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়াবার কারণে উভয় হাদীসের ওপর আমল করা দুঃসাধ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। মূলত হাদীসে কোনো মতভেদ নেই। শুধু আমাদের দৃষ্টিতে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যদি দুটো পরস্পর বিরোধী হাদীস সামনে আসে, যদি উভয় হাদীসেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ বর্ণিত হয়, যদি এক সাহাবী বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করেছেন এবং অপর সাহাবী বলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাজ করেছেন, তা হলে দুটোর ভেতরে কোনো বিরোধ নেই। সেক্ষেত্রে দুটো কাজই মোবাহ হবে। অবশ্য যদি সে কাজ দুটো ইবাদত না হয়ে অভ্যেসগত হয়। অন্যথায় একটি হবে মুস্তাহাব এবং অপরটি হবে জায়েয। তবে যদি একটিতে ইবাদতের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয় এবং অপরটিতে না হয় কিংবা দুটো কাজই ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হয়, তখন দুটোর একটি অপরটির জন্যে যথেষ্ট হবে। অবশ্য দুটোই যদি ইবাদত হয়।

সাহাবী হাফেজগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবেই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন বিতরের নামায এগারো রাকআত, নয় রাকআত, সাত রাকআত ইত্যাদির

বর্ণনা। তেমনি তাহাজ্জুদ নামাযে জোরে কিংবা আস্তে পড়া। এ পদ্ধতিতেই রাফিয়্যাদাইনের ব্যাপারটি ফয়সালা করা হবে। মানে, হাত কান পর্যন্ত উঠানো হোক কিংবা কাঁধ পর্যন্ত।

হযরত উমর (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাশাহহুদের ব্যাপারটির মীমাংসা এভাবেই করা চাই। এ পদ্ধতিতেই বিতরের নামায কি তিন রাকআত, না এক রাকআত ভিন্ন নামায সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া চাই। এভাবেই নামায শুরুর দোআ, সকাল সন্ধ্যার দোআ এবং সব রকমের কার্যকারণ ও কর্মসূচি নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অথবা যদি সে কাজ দুটো কোনো কষ্টকর ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ দাতা হয়। হয়ত পূর্বে সে কাজ অপরিহার্য করার কোনো কারণ ছিল। যেমন কাফফারা সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ। একটি বর্ণনামতে যুদ্ধের বিনিময় সম্পর্কিত ব্যাপার। অথবা সেক্ষেত্রে কোনো সুপ্ত কারণ ছিল যা এক সময় একটি কাজকে ওয়াজিব করেছে এবং অন্য সময় অপর কাজটি মুস্তাহাব করেছে। অথবা একটি কাজ এক সময় ওয়াজিব করেছে এবং অন্য সময়ে বর্জন করার অবকাশ দিয়েছে। তখন অপরিহার্য হবে সে কারণ অনুসন্ধান করা।

অথবা কাজ দুটোর একটি অপরিত্যাজ্য ও অপরটি বর্জনের অবকাশ রয়েছে। শর্ত হচ্ছে, প্রথমটিতে দৃঢ়তার লক্ষণ থাকবে ও দ্বিতীয়টিতে কষ্টকর দিকটি বিবেচিত হবে। যদি সেক্ষেত্রে মানসূখ হবার দলীল পাওয়া যায় তা হলে সেটাই সিদ্ধান্ত হবে। তবে যদি তার ভেতর একটিতে কাজের বর্ণনা ও দ্বিতীয় হাদীসে কাজের বর্জন আসে, সেক্ষেত্রে যদি কাজটির সুস্পষ্টতঃ ওয়াজিব বা হারাম হওয়ার প্রমাণ না মিলে কিংবা অপর বর্ণনাটিতে সুস্পষ্ট বর্জন না বুঝায়, তখন তাতে কয়েকটি কারণ হতে পারে। যদি একটি বর্ণনায় সুস্পষ্ট ওয়াজিব বা হারামের ব্যাপার থাকে তা হলে উভয় হাদীসই এই অর্থে ব্যবহৃত হবে যে, ব্যাপারটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে নির্দিষ্ট।

অথবা দুটোকেই মানসূখ করা হবে। তখন উভয়ের লক্ষণাদি অনুসন্ধান করে দেখা হবে। যদি দুটোই বক্তব্যমূলক হাদীস হয়, এবং একটির অর্থ সুস্পষ্ট হয় ও দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে একই অর্থ দাঁড়ায় আর ব্যাখ্যাও কাছাকাছি হয়, তা হলে সুস্পষ্ট অর্থবোধক হাদীসের ওপরই আমল হবে। তখন স্পষ্ট হাদীসটি অস্পষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা যদি দূরের হয় তাহলে ব্যাখ্যার অর্থ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তার সপক্ষে বড় কোনো

নিদর্শন মিলবে কিংবা কোনো ফকীহ সাহাবী থেকে তা বর্ণিত হবে। যেমন দোয়া কবুলের সময় সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর এ বক্তব্য যে, সেটা হলো সূর্যাস্তের প্রাক্কালে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন যে, সে সময়ে নামায বৈধ নয়। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'এক মুসলমান নামাযে রত অবস্থায় যে প্রার্থনা জানাবে তা পাবে।' জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন ঃ নামাযের জন্যে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিও নামাযরত ব্যক্তির সমান।

এটা তো হলো দূরের ব্যাখ্যার ব্যাপার। এ ব্যাখ্যা শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন কোনো ফকীহ সাহাবীর থেকে তা পাওয়া যাবে। দূরের ব্যাখ্যা সেটাই যা সুস্থ বিবেকের সামনে পেশ করলে তার সংগতিহীনতা ও প্রমাণহীনতার জন্যে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তারপর যদি তা প্রকাশ্য ইঙ্গিত, সুস্পষ্ট তাৎপর্য কিংবা সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী হয় তা হলে আদৌ বৈধ নয়।

কাছাকাছি ব্যাখ্যার অন্যতম হলো 'কসরে আম' বা সীমিত সাধারণ হুকুম। এ ধরনের নির্দেশে কিছু সংখ্যক লোককে শামিল করার রীতি থাকে এবং তা থেকে এমন স্থানে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয় যেখানে স্বভাবতই ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে। যেমন প্রশংসাকীর্তন কিংবা নিন্দাগাথা রচনা। সাধারণ অর্থবোধক শব্দের অন্যতম হলো সেই শব্দ যা নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য সাধনের পর যার জন্যে তা প্রযুক্ত হয় সে কাজে লাগানো হয়। সেটাকে সংশয়পূর্ণ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে জমিনে বৃষ্টির পানি ফসল দেয় তার ওশর (দশমাংশ) হবে।" অন্যত্র তিনি বলেনঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত নেই।

একটি ব্যাখ্যা এটাও যে, প্রত্যেক হাদীসকে বিশেষ এক উপযোগী অর্থে গ্রহণ করা হবে। একটি ব্যাখ্যা এই যে, দুটোকেই মাকরূহ পর্যায়ে রেখে সামগ্রিক বিবেচনায় বৈধতা বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হবে। অবশ্য যদি তা সম্ভব হয়। তখন কড়াকড়ি করাকে সতর্কীকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যদি পূর্বে কোনো অন্যায় ঘটে থাকে। তবে এ নির্দেশ– 'তোমাদের জন্যে মৃত জীব হারাম করা হলো, কিংবা তোমাদের জন্যে তোমাদের মাতাকে হারাম করা হলো' অর্থাৎ তাদের বিয়ে করা হারাম, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য 'নজর লাগা সত্য' অর্থাৎ নজরের প্রভাব হওয়া প্রমাণিত সত্য কিংবা রাসূল সত্য অর্থাৎ রাসূলের প্রেরিত হওয়া সত্য, অথবা 'আমার উম্মতের ভুল-চুক উপেক্ষিত

হবে' অর্থাৎ ভুলবশত কৃত পাপ মাফ করা হবে, কিংবা ওযূ ছাড়া নামায নেই বা ওলি ছাড়া বিয়ে নেই' অথবা 'সব আমলে ভিত্তি হলো নিয়ত' অর্থাৎ নিয়ত ছাড়া আমলের সেই প্রভাব সৃষ্টি হয় না যা শরীয়াত নির্ধারণ করেছে, কিংবা 'যখন নামাযে দাঁড়াও ধুয়ে নাও' অর্থাৎ যদি তুমি ওযূ করে না থাকো, করে নাও ইত্যাদি কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আরবের লোক এর প্রতিটি শব্দের যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত। তাই তারা এর যথাযথ অর্থই গ্রহণ করে, মূলত এসব তাদের অহরহ ব্যবহারের ভাষা। ফলে এর প্রকাশ্য অর্থের বাইরে কোনো অর্থ তারা বুঝে না।

তবে যদি দুটো কাজই কোনো মাসআলার জবাব হয় কিংবা কোনো ঘটনার ফয়সালা হয়, তখন যদি তার ভেতরে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো কারণ পাওয়া যায় তাহলে তদনুসারেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যেমন কোনো যুবক তাঁর কাছে রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দান সম্পর্কে জানতে চাইল তো তিনি তাকে নিষেধ করলেন। পক্ষান্তরে যখন এক বৃদ্ধ প্রশ্ন করল, তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

যদি এক হাদীসে কোনো প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিংবা প্রশ্নকারীর অনীহার কারণে নির্দেশ তামিল না করার ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া হয়, অথবা কেউ যদি ইচ্ছা করে সেটাকে কড়াকড়িভাবে পালন করে, অথচ অপর হাদীসে তা প্রমাণিত না হয়, তাহলে প্রথমটি রোখসত ও দ্বিতীয়টি আযীমাত হিসেবে গণ্য হবে।

যদি দুটো কাজই কোনো পরীক্ষা থেকে রেহাই দান কিংবা কোনো পাপের শাস্তি দান অথবা কোনো কসম ভাঙ্গার কাফফারা হয় তো উভয়টিকে সঠিক বলে গ্রহণ করা হবে। তবে নাসেখ-মানসুখ হবার সম্ভাবনাও থেকে যাবে। এ পদ্ধতির ভিত্তিতেই হায়েজগ্রস্ত নারীর ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। কখনো প্রতি দু ওয়াক্ত নামাযে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কখনো এ কথা বলা হয়েছে, স্বভাবত যতদিন হায়েজ থাকার কথা, ততদিনই হায়েজের দিন হিসেবে গণ্য হবে। কোথাও বলা হয়েছে বেশি রক্ত ঝরার দিনগুলোকে হায়েজের কাল ধরা হবে। এসব এ কারণে হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েজ গ্রস্তা নারীকে দুটো এখতিয়ারই দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে সে অভ্যেসগত দিনগুলো পুরো অপেক্ষা করতে পারে অথবা রক্তের রঙ বিলুপ্ত হওয়াকে হায়েজের কাল বলে গণ্য করতে পারে। কারণ দুটোই হায়েজের কাল নির্ণয়ের মানদণ্ড হতে পারে।

তেমনি যে ব্যক্তি জিম্মায় রোযা রেখে মারা গেল, তার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক বক্তব্যে তার তরফ থেকে রোযা রাখা ও অন্য বক্তব্যে খানা খাওয়াবার নির্দেশ রয়েছে। তেমনি যার নামাযে সন্দেহ থাকে তাকে তিনি দুটো পথ বাতলেছেন। ইচ্ছা হয় চিন্তাভাবনা করে রাকআতের সংখ্যা ঠিক করবে, অন্যথায় নিশ্চিত জানা রাকআত ধরে নামায পূর্ণ করবে। তেমনি তাঁর এক বক্তব্যে দেখা যায় বংশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি কখনো চেহারা ও আকৃতি অনুমান করে রায় দিয়েছেন, কখনো লটারির মাধ্যমে তা স্থির করেছেন।

যদি এসব বর্ণনায় নাসেখ-মানসুখ হবার সুস্পষ্ট দলীল থাকে তো সেটাই অনুসরণ করা হবে। এ ব্যাপারটি কখনো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য ও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়; যেমন, তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তা কর। কখনো তা এভাবে জানা যায় যে, হাদীস দুটোর সমন্বয় সাধন সম্ভব নয় এবং একটি হাদীস আগের ও অপরটি পরের। পরবর্তী হাদীসের বিধান চালু হয়েছে ও প্রথমটির বিধান উহ্য হয়েছে। ফলে ফকীহ সাহাবীরা বুঝে নিয়েছেন যে, দ্বিতীয় হাদীস পয়লা হাদীসকে মানসুখ করেছে অথবা হাদীস দুটোয় মতভেদ থাকায় ফকীহ সাহাবীদের কেউ বলে দিলেন, একটি অপরটির নাসেখ। অবশ্য এ নসখ দৃশ্যত ঠিক হলেও চূড়ান্ত ধরা যাবে না। ফকীহরা তা বললেও যদি দেখা যায় যে, তাদের শায়েখদের আমল তার বিপরীত তা হলে তাদের বলাটাই যথেষ্ট হবে না।

নসখের পরিণতিতে এক হুকুমের বদলে অন্য হুকুম কায়েম হয়। মূলত একটি হুকুম বিলুপ্ত হয়। তা এ জন্যে যে, সে বিধানের কারণ শেষ হয়ে গেছে। অথবা মূল উদ্দেশ্যের জন্যে তার কারণ হওয়ায় সম্ভাবনা শেষে হয়েছে। কিংবা তার কারণ হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। অথবা আল্লাহর তরফের ওহী এসে তা রদ করেছে কিংবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজতেহাদে একটির ওপর অপরটির প্রাধান্য পেয়েছে। এটা তখনই হয় যখন পয়লা হুকুমটি ইজতেহাদের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। যেমন মিরাজের হাদীসে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আমার বক্তব্যে কোনো রদবদল নেই।

যদি দুটো হাদীসের সমন্বয় সাধন কিংবা ব্যাখ্যার দ্বারাও দুটো রাখার কোনো সুযোগ না থাকে, এমনকি নসখ হওয়ারও কোনো প্রমাণ না থাকে, তখন বিরোধ থেকেই যায়। সেক্ষেত্রে যদি কোনোটিকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ দেখা দেয় তো সেটাকে প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় দুটোকেই বাদ দেবে।

বিরোধের ক্ষেত্রে একটিকে প্রাধান্য দেবার কয়েকটি কারণ থাকে–

১। সনদের ভিত্তিতে অধিক বর্ণনাকারী থাকায় প্রধান্য পায়। সেক্ষেত্রে বর্ণনাকারীকে ফকীহ্ হতে হয়, মুত্তাসিল ও মারফূ হাদীস হতে হয়। সে হাদীসের বর্ণনাকারীকে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। হয় সে প্রশ্নকারী হবে অথবা হাদীস সংশ্লিষ্ট কাজের কর্তা হবে।

২। এ কারণেও প্রাধান্য পায় যে, কোনো একটি হাদীসের বক্তব্যে ব্যাখ্যা ও তাকীদ থাকে।

৩। বিধান ও তার কারণের সুস্পষ্টতার জন্যে প্রাধান্য পায়। বিধানটি শরীআতের অন্যান্য বিধানের সাথে সংগতি রাখে এবং তার কারণও এরূপ জোরালো যে, বিধানের সাথে তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

৪। কখনো বাইরের কোনো ব্যাপারের কারণেও প্রাধান্য পায়। অবশ্য অধিকাংশ আলেম যদি তা মেনে নেন।

হাদীসসমূহ বাতিল হওয়াটা নিছক কাল্পনিক ব্যাপার যা কখনো ঘটে না। কোনো সাহাবীর এ কথা বলা যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন, অমুক কাজ নিষেধ করেছেন, এটা করা সুন্নাত, এ কাজ যে করল সে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাফরমানী করল, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন, আমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, এ কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেছেন, এ সবই হাদীস।

তা ছাড়া সাহাবীর এ কথা বলা যে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ, এ থেকে বাহ্যত হাদীসটির মারফূ হওয়া জানা যায়। তবে এ সংশয়ও থেকে যায় যে, সাহাবী কারণকে নির্দেশের ভিত্তি ধরে নিয়ে নিজে এজতেহাদ করেছেন। অথবা নিজেই বিধান নির্ধারিত করেছেন যে, এটা ওয়াজিব, এটা মুস্তাহাব, এটা ব্যাপকার্থক এবং এটা বিশেষার্থক।

কোনো সাহাবী যখন বলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতেন, তার অর্থ সে কাজ তিনি কয়েকবার করেছেন। সাহাবী যখন বলেনঃ তিনি অন্য কাজ করতেন, তার অর্থ এ নয় যে, আগের কাজটি করেননি। তবে কোনো সাহাবীর এ বক্তব্য– "আমি তাঁর সাহচার্য ছিলাম এবং তাঁকে এটা নিষেধ করতে দেখিনি, এবং আমরা তাঁর যুগে একাজ করতাম।' বাহ্যত এটা কোনো বিধানের দলীল বটে, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য নয়।

কখনো সূত্রে বিভিন্নতার কারণে হাদীসের শব্দে পার্থক্য দেখা দেয়। এ শাব্দিক পার্থক্য মূলত হাদীসটির বক্তব্য নিজের ভাষায় বর্ণনার কারণে ঘটে থাকে। তবে যদি কোনো হাদীস এমন হয় যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ভাষায় কোনো পার্থক্য না থাকে তাহলে বুঝা যাবে, সেটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষা। হয়ত শব্দ প্রয়োগে আগ-পিছ হতে পারে। অথবা 'এবং', 'অতঃপর' ইত্যকার শব্দ যোগ হতে পারে। তবে যদি বর্ণনাকারীদের ভাষায় সংশয়যোগ্য মতভেদ দেখা দেয়, এবং তারা ফেকাহ জ্ঞান, মুখস্ত শক্তি ও বর্ণনাধিক্যে কাছাকাছি ও সমমর্যাদার হন, তখন বাহ্যিক ভাষাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে হাদীসটি শুধু সেই অর্থেই ব্যবহৃত হবে যে অর্থে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তারা বাড়তি শব্দ বা টিকা বাদ দিয়ে মূল বক্তব্যটির গুরুত্ব দিতেন। যদি বর্ণনাকারীদের মান সমান না হয়, তাহলে নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা কিংবা বহুল বর্ণিত বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। অথবা তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বেশি জানা রয়েছে।

যদি জানা যায় যে, কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় কোনো বেশি কথা বর্ণিত হয়েছে, যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) 'দাঁড়ালেন' না বলে 'লাফিয়ে উঠলেন' অথবা তিনি 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করলেন' না বলে 'তিনি চামড়ার ওপর পানি বহালেন' কথাটি বলেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তার বর্ণনাটিই গ্রহণ করা হবে। তবে যদি বর্ণনাকারীদের ভেতর চরম মতভেদ দেখা দেয় এবং কোনোটিকে প্রাধান্য দেবার কোনো সূত্র না পাওয়া যায়, তা হলে যে বিশেষ ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেবে সেটা বাদ দেয়া হবে।

মুরছাল হাদীসের সাথে যদি কোনো লক্ষণ যোগ হয় যেমন কোনো সাহাবীর মাওকুফ হাদীসের সমর্থন পেয়ে তা শক্তি অর্জন করল, অথবা কোনো সাহাবীর জঈফ মুসনাদ হাদীস কিংবা অন্য কোনো সাহাবীর মুরছাল হাদীস দ্বারা শক্তি পায়, এবং উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী ভিন্ন হয় অথবা অধিকাংশ হাদীস বিশারদের বক্তব্য, অনুমান ও ইঙ্গিত দ্বারা তা সমর্থিত হয়, কিংবা এটা জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী শুধু ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসই মুরছাল রূপে বর্ণনা করেন, তখন সে হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেয়া বিশুদ্ধ হবে। অবশ্য হাদীসটি মুসনাদ হিসেবে কম মর্যাদা পাবে। তবে যদি উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে মুরসাল হাদীস দ্বারা সমর্থিত না হয় তা হলে তা দিয়ে দলীল দেয়া যাবে না।

তেমনি দুর্বল মুখস্ত শক্তির বর্ণনাকারী যদি কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, যদি তিনি অজ্ঞাত ও অভিযুক্ত ব্যক্তি না হন, তাহলে পছন্দনীয় কথা এটাই যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে। শর্ত এটাই যে, তার সমর্থনে কোনো লক্ষণ থাকতে হবে। যেমন তা কেয়াস সম্মত অথবা অধিকাংশ আলেম তা আমল করে থাকেন। যদি তা না হয় তা হলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

যখন কোনো ছেকাহ রাবী এককভাবে কিছু বাড়তি বর্ণনা করেন এবং তা এরূপ বর্ণনা, যে ব্যাপারে অন্যান্য রাবী চুপ থাকতে পারেন, তা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন মুরসাল হাদীসের সনদ বর্ণনা করা কিংবা সনদের ভেতরে কোনো রাবীর বাড়তি বর্ণনা, অথবা হাদীসের উৎস বর্ণনা করা কিংবা বর্ণনা ও তার ভেতরে দীর্ঘ বক্তব্যের কারণ বর্ণনা করা, অথবা বাক্যের তাৎপর্যে পরিবর্তন না এনে স্বতন্ত্র কোনো বাক্যাংশ যোগ করা ইত্যাদি। তবে যদি সে ব্যাপারে অন্যান্য রাবী নীরব না থাকতে পারেন, যেমন তাৎপর্য পরিবর্তনকারী বাড়তি কথা অথবা এরূপ দুর্লভ বস্তুর উল্লেখ করা যা স্বভাবত বর্জনীয় নয়, তাহলে এরূপ বাড়তি বর্ণনা অগ্রাহ্য হবে।

যখন কোনো সাহাবী কোনো হাদীসকে কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, আর সেক্ষেত্রে যদি ইজতেহাদের অবকাশ থাকে তাহলে সামগ্রিক বিবেচনায় এ প্রয়োগকে বাহ্যিক বলে ধরা হবে, যতক্ষণ না এর বিরুদ্ধে কোনো দলীল পাওয়া যায়। তবে যদি সেক্ষেত্রে ইজতেহাদের কোনো অবকাশ না থেকে থাকে, তা হলে এ প্রয়োগ জোরদার হবে। যেমন কোনো জ্ঞানী ও ভাষাবিদ অবস্থা ও বক্তব্যের লক্ষণ ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে কোনো ব্যাপার বুঝে নেন।

সাহাবা ও তাবেঈনদের ভেতরকার মতভেদের সমাধান হলো এই যে, যদি তাতে সমন্বয় সম্ভব হয়, তা হলে সেটাই উত্তম এবং ওপরে আলোচিত পদ্ধতিগুলোর যে কোনো এক পদ্ধতিতে তা হতে হবে। তা না হলে এ প্রশ্নে দুই বা ততোধিক অভিমত রয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা চাই যে, কোনটি অপেক্ষাকৃত সঠিক বিবেচিত হতে পারে।

সাহাবাদের মজহাবগুলোর উৎস জানা এক গুপ্ত জ্ঞানের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়াস চালালে কিছু না কিছু অংশ লাভ হবেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৮১

সাহাবা ও তাবেঈনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতভেদের কারণসমূহ

এটা সুস্পষ্ট কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুণ্য যুগে ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি। আজকের ফকীহরা যেভাবে বিভিন্ন মাসআলার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তা নিয়ে বিতর্ক করেন, তখন তেমনটা ছিল না। এখন তো চরম পরিশ্রম স্বীকার করে প্রত্যেক ব্যাপারের মূল কাঠামো, শর্তাবলি ও নিয়ম পদ্ধতি দলীল প্রমাণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোনো কোনো ব্যাপারে কি কি প্রশ্ন থাকতে পারে এবং তার কি কি সমাধান হতে পারে তা যুক্তি তর্ক ও দলীল প্রমাণ দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে। যার সীমারেখা চিহ্নিত হওয়ার দরকার তার সীমারেখা নির্ণীত হচ্ছে এবং যা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। তারা এ ধরনের বহুকাজ করে চলছেন।

অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এরূপ ছিল যে, তিনি ওজু করতেন ও সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। তারপর তিনি যেভাবে ওজু করেছেন তারা সেভাবে ওজু করতেন। এটা মূল কাঠামো ও এটা নিয়ম পদ্ধতি। এসব তাদের বাতলাতে হতো না। তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন ও সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। তারপর তিনি যেভাবে নামায পড়েছেন তারাও সেভাবে পড়তেন। তিনি হজ্ব করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তা দেখেছেন এবং তিনি হজ্বে যে যে কাজ যেভাবে করেছেন, তারাও সেভাবে সে সে কাজ করেছেন।

বস্তুত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ অভ্যেস এটাই ছিল এবং তিনি এটা বলতেন না যে, ওযুর ছয় ফরজ বা চার ফরজ। তা ছাড়া তিনি এ ধারণাও পোষণ করতেন না যে, কেউ ওজু করতে বসে এক নাগাড়ে তা শেষ করবে না, তাই তা না করলে ওজু হবে কি, হবে না তা বলতে হবে। হ্যাঁ, কদাচিত কোনো ব্যাপারে হয়ত তিনি কিছু বলতেন। সাহাবায়ে কেরামও এ সব ব্যাপারে খুব কমই জানতে চাইতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন- 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম থেকে উত্তম কোনো

জাতি দেখিনি। তারা তাঁর গোটা জীবনে মাত্র তেরোটি মাসআলা জানতে চেয়েছেন আর সেগুলো সবই কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে। তার ভেতর একটি হলো হারাম বা নিষিদ্ধ মাসগুলো সম্পর্কে। যেমন বলা হয়েছে– তোমার কাছে কি নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে জানতে চাইছে যে, তাতে লড়াই চলবে কিনা? তুমি বলে দাও, তাতে লড়াই করা মহা পাপ। অপরটি হলো তোমার কাছে কি হায়েজ সম্পর্কে জানতে চাইছে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন– "সাহাবায়ে কেরাম শুধু সেটাই জানতে চাইতেন, যা কল্যাণপ্রদ"। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন– 'যা ঘটেনি তা নিয়ে প্রশ্ন করোনা। আমি হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি তাদের অভিশাপ দিতেন, যারা এরূপ ব্যাপারে প্রশ্ন করত যা এখনো ঘটেনি।

কাসেম বলেন, 'তোমরা কি সে বিষয়ে প্রশ্ন করছ যে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করিনি? তোমরা কি এমন সব ব্যাপার অনুসন্ধান করছ যা আমরা কখনো করিনি? তোমরা এমন কিছু জানতে চাচ্ছ, যে ব্যাপারে আমারই জানা নেই যে তা কি বস্তু? যদি আমরা তা জানতাম তা হলে তা গোপন করা আমাদের জন্যে জায়েয হতো না।"

হযরত ইসহাক ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরামদের ভেতর আমি যাদের সাথে মিলিত হয়েছি তাদের সংখ্যা যারা আমার আগে চলে গেছেন তাদের চেয়ে বেশি ছিল। আমি তাদের চাইতে সহজ সরল চরিত্রের ও কম কড়াকড়ি করার লোক কাউকে দেখিনি।

হযরত উবাদা ইবনে সমরকান্দি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে সেই মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যার এক গোত্রের সাথে মৃত্যু ঘটেছে এবং তার কোনো অভিভাবক ছিল না। তিনি তখন বললেন– 'আমি এমন একটি জাতির দেখা পেয়েছি যারা তোমাদের মতো এরূপ কড়াকড়ি করতেন না এবং তোমরা সে ধরনের প্রশ্ন তোল তারা যেরূপ তুলতেন না।' এ সব আছার বর্ণনাকারীরা ভর্ৎসনা করে গেছেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে লোকেরা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। তিনি সে সব ব্যাপারে তাঁর অভিমত জানাতেন। বিভিন্ন মকদ্দমা ও সালিশি আসত। তিনি তার ফয়সালা দিতেন। তিনি লোকদের ভালো কাজ করতে দেখলে প্রশংসা করতেন এবং মন্দ কাজ করতে দেখলে নিষেধ

করতেন। তিনি কোনো প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, কোনো মকদ্দমার ফয়সালা দিয়েছেন কিংবা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন, এসব কিছুই ছিল ভর মজলিসের ব্যাপার।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগও এভাবে কেটেছে। তাদের যদি কোনো মাসআলা জানা না থাকত তা হলে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন কিনা? এভাবে একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) জোহরের নামাযের সমবেত মুসল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন– 'দাদি কত অংশ পাবে সে ব্যাপারে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনিনি। তোমরা কেউ কি শুনেছ? হযরত মুগীরা ইবনে শোবা বললেন– আমি শুনেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কি শুনেছ? মুগীরা বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদিকে ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি ছাড়া আর কেউ তা জানে? মুহাম্মদ ইবনে সালমা বললেন– মুগীরা সত্য বলেছেন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) দাদির জন্যে ষষ্ঠমাংশ নির্ধারণ করলেন।

এভাবে গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ)ও লোকদের কাছে প্রশ্ন করলেন এবং মুগীরা (রাঃ)-এর বর্ণনা শুনে তিনি তার ভিত্তিতে রায় দেন। তেমনি প্লেগ মহামারীর ক্ষেত্রে তিনি লোকদের কাছে করণীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের বর্ণনা অনুসারে পদক্ষেপ নেন। তদ্রূপ মাজুসীদের এক ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞেস করে আবদুর রহমান ইবনে আওফের বর্ণনা গ্রহণ করেন। তেমনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের অভিমতের সমর্থনে হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসারের বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারটি। তেমনি হযরত উমর (রাঃ)-এর দরজা থেকে হযরত আবু মূসা আসআরী (রাঃ)-এর ফিরে যাওয়া এবং সে ব্যাপারে উমর (রাঃ)-এর কোনো হাদীস জানতে চাওয়া ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক আবু মুসার হাদীসের সত্যতা ঘোষণা তারই উদাহরণ। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা সহীহদ্বয়ে ও সুনান সমূহে পরিজ্ঞাত ও বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এটাই রীতি ছিল। প্রত্যেক সাহাবীকে আল্লাহ পাক যতটুকু তওফীক দিয়েছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত, ফতোয়া, ফয়সালা দেখেছেন ও তা স্মরণে রেখেছেন ও বুঝে নিয়েছেন। তাছাড়া নানা লক্ষণ ও ইশারা ইঙ্গিত থেকেও তারা

মূল বক্তব্য বুঝে নিতেন। সাহাবায়ে কেরাম এ পদ্ধতিতেই কোনো হুকুমকে মোবাহ ও কোনো হাদীসকে মানসুখ বলে সাব্যস্ত করতেন।

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ড ছিল অন্তরে স্বস্তি, প্রত্যয় ও প্রশান্তি সৃষ্টি হওয়া। তারা নানাবিধ দলীল প্রমাণের টানা হেঁচড়ায় জড়িত হতেন না। যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, গ্রাম্য আরবরা কোনো কিছু খোলামেলাভাবে বলে দিলে বা ইশারা ইঙ্গিতে বললেই উদ্দিষ্ট ব্যাপারটি বুঝে ফেলে ও তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। অথচ তারা জানেও না যে, ব্যাপারটি ঘটার পেছনে কি সব কার্যকারণ রয়েছে। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ শেষ হলো এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগও একইভাবে পার হলো।

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেক সাহাবী কোনো না কোনো এলাকার অনুকরণীয় পথিকৃৎ হয়ে গেলেন। তাছাড়া ঘটনাবলিও অনেক বেড়ে চলল। ফলে মাসআলা মাসায়েলও অনেক জানতে চাওয়া হচ্ছিল। তখন প্রত্যেক সাহাবী নিজ নিজ স্মৃতি ও মেধা থেকে জ্ঞাত ও উদ্ভাবিত ফতোয়া দিতেন। যদি জ্ঞাত বা তদনুসারে উদ্ভাবিত জবাব যথেষ্ট না হতো, তাহলে নিজ জ্ঞান প্রয়োগ করে জবাব উদ্ভাবন করতেন। তখন তারা সেসব কারণ খুঁজতেন যেসব কারণকে ভিত্তি করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিতেন। বস্তুত যেখানে কারণ পাওয়া যেত সেখানে তারাও হুকুম জারি করতেন এবং সে হুকুমকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যের সাথে খাপ খাওয়াতে তিল মাত্র কসুর করতেন না। এরূপ ক্ষেত্রেই তাদের ভেতর কয়েক ধরনের মতভেদ দেখা দেয়।

১। এক সাহাবী কোনো এক ঘটনা বা মাসআলা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হুকুম শুনেছেন এবং অন্য সাহাবী তা শুনেননি। ফলে তিনি সে ব্যাপারে ইজতেহাদ করেছেন। তাই মতভেদ দেখা দিয়েছে। ইজতেহাদও কয়েক ধরনের হয়। যেমন একজনের ইজতেহাদ হাদীসের সাথে মিলে গেছে। নাসায়ী প্রথম বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক মহিলার স্বামী মারা গেছে এবং সে স্ত্রীর কোনো মোহরানা নির্ধারণ করে যায়নি, এখন কি হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু বলতে শুনিনি। তারপর থেকে এক মাস ধরে তার কাছে লোক এসে এসে এ ব্যাপারে তার অভিমত জানার

জন্যে পীড়াপীড়ি করত। অবশেষে তিনি ভেবে চিন্তে এ রায় দিলেন যে, স্ত্রীকে মোহরে মেছাল দিতে হবে, তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে এবং মীরাছের অংশ পাবে। তখন হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার দাঁড়িয়ে বললেন, তাদের এক মহিলার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফয়সালাই প্রদান করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তা শুনে এত খুশি হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এরূপ খুশি আর কখনো হননি।

২। দুই সাহাবীর ভেতর হাদীসের শ্রবণ নিয়ে মতান্তর দেখা দেয়। হাদীসদ্বয়ও দ্ব্যর্থবোধক এবং যেদিকে ধারণা প্রবল হয়, সেটাই গ্রহণ করা যায়। অবশেষে এক সাহাবী পরে শ্রুত অন্য হাদীস মেনে নেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মজহাব এটাই ছিল যে, ফরজ গোসলের অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে তার রোযা হবে না। অতঃপর যখন উম্মুল মুমেনীনদের কেউ কেউ তার বিপরীত হাদীস শোনালেন, তখন তিনি তার মত বদলালেন।

৩। কোনো সাহাবীর কাছে এমন হাদীস পৌছল যা তার প্রবল ধারণার অনুকূল নয়। ফলে তিনি ইজতেহাদ বর্জন না করে হাদীসকে ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করলেন। এর উদাহরণ হচ্ছে সেই বর্ণনাটি যা অসুলশাস্ত্রবিদগণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, ফাতেমা বিনতে কয়েস হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে সাক্ষ্য দিল যে, তাকে তিন তালাক দেয়া হয়েছে, অথচ সে জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থার কথা বলেননি। হযরত উমর (রাঃ) তার সাক্ষ্য এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি এক মহিলার সাক্ষ্যের ওপর আল্লাহর কিতাব ছাড়তে পারি না। আমি এটাও জানিনা যে, সে সত্য সাক্ষ্য দিল, না মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। তাই তালাকপ্রাপ্ত নারী ইদ্দত পর্যন্ত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) ফাতেমাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? অর্থাৎ সে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পাবে না, এ কথা বলে সরাসরি আল্লাহর কিতাবের বিরোধীতা করতে কি ভয় পেল না?

দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে সহীহদ্বয়ের একটি বর্ণনা। তাতে বলা হয়েছে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর মজহাব ছিল এই যে, ফরজ গোসলের অবস্থায় যদি পানি না পাওয়া যায় তা হলে তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। তখন তার সামনে হযরত আম্মার (রাঃ) এ হাদীস পেশ করলেন যে, তিনি এক সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। তখন তার ফরজ গোসলের ব্যাপার দেখা দিল। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনি মাটিতে গড়াগড়ি

গেলেন। তারপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এ ঘটনা বললেন, তখন তিনি তাকে বললেন– 'তোমার তো এতটুকু করাই যথেষ্ট ছিল যে, মাটিতে দু'হাত রেখে তা নিজ মুখমণ্ডলে ও দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে।' হযরত উমর (রাঃ) তা মেনে নিলেন না। একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন যা তার জানা ছিল, সে কারণে তিনি তার হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। অবশেষে উম্মতের দ্বিতীয় স্তরে এসে যখন বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়ে মাশহুর হাদীসের মর্যাদা পেল এবং প্রচ্ছন্ন প্রশ্নটি অবশিষ্ট থাকল না, তখন সবাই তার ওপর আমল করল।

৪। চতুর্থ অবস্থাটি হলো এই যে, সাহাবীটির কাছে হাদীসই পৌছেনি। তার উদাহরণ হচ্ছে ইমাম মুসলিমের উদ্ধৃত বর্ণনাটি। তাতে বলা হয়েছে, ইবনে উমর (রাঃ) নারীদের গোসলের সময় মাথার কাপড় খুলে নেবার নির্দেশ দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন তা শুনতে পেলেন, তখন ইবনে উমরের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ সে নারীদের গোসলের সময় মাথার কাপড় খুলে নেয়ার হুকুম দিচ্ছে? তাহলে সে তাদের মাথা মুণ্ডানোর নির্দেশ দেয় না কেন? আমি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। আমি তো তখন এতটুকুই করতাম যে, যথাবস্থায় মাথায় তিনবার পানি ঢেলে নিতাম।

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো এই যে, ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন ঃ হযরত হেন্দা (রাঃ) হায়েজ অবস্থায় নামায পড়তে হবে না বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা জানতে পারেননি বলে তিনি নামায পড়তে পারতেন না বলে কাঁদতেন।

৫। সাহাবাদের মতভেদের আরেকটি কারণ হলো এই যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাজ করতে দেখার পর কেউ সেটাকে মোবাহ কাজ বলে ভেবেছেন, কেউ ভেবেছেন ইবাদত। তার উদাহরণ হলো অসুল শাস্ত্রবিদদের আলোচ্য 'কামিয়ায়ে তাহসীব' অর্থাৎ হজ্বের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবতাহ প্রান্তরে অবস্থানের বর্ণনাটি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) সেটাকে ইবাদত বলে ভেবেছেন এবং সেটাকে হজ্বের অন্যতম সুন্নত বলে সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর মজহাব হলো এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাচক্রে সেখানে অবস্থান করেছিলেন, তাই তা সুন্নত নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে, জমহুরের মজহাব হলো তাওয়াফের সময় রমল করা সুন্নাত। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মজহাব হলো তা সুন্নাত নয়। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে তা করেছিলেন। বিশেষ কারণটি এই ছিল যে, মুশরিকরা বলেছিল, মদীনার উত্তাপ মুসলমানদের দুর্বল করে ফেলেছে, তাই বুক টান করে বাহাদুরের মতো হেলে দুলে রমল করে তার জবাব দেয়া হয়েছিল। সাহাবাদের ভেতর মতভেদের আরেকটি কারণ হলো এই যে, ধারণার ভেতরে তারতম্য সৃষ্টি হওয়া। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব করেছেন, তখন লোকজন তা দেখেছেন। অতঃপর কেউ ধারণা করেছেন যে, তিনি তামাত্তু হজ্ব করেছেন। কেউ আবার ভেবেছেন, তিনি কারেন হজ্ব করেছেন। কেউ কেউ ভেবেছেন, তিনি মুফরাদ হজ্ব করেছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে আবু দারদার বর্ণিত বিবরণটি। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম– 'হে আবু আব্বাস! আমি সাহাবায়ে কেরামের এ মতভেদ দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এহরাম বাঁধা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করছেন। তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারটি আমি সবচেয়ে ভালো জানি। সেটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হজ্বের ঘটনা এবং তা নিয়েই এ মতভেদ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হয়ে জুল হালিফায় এসে নামায পড়লেন এবং সেখানেই এহরাম বাঁধলেন। তারপর দু'রাকাত নামায পড়ে হজ্বের তালবিয়াহ পাঠ করলেন। লোকেরা তা শুনতে পেয়েছে। আমি তা ভালোভাবে স্মরণ রেখেছি। অতঃপর তিনি বাহনে চড়লেন। যখন তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে দাঁড়াল তখনো তিনি তালবিয়াহ পড়লেন। লোকেরাও তা শুনতে পেয়েছে। মতভেদের কারণ হলো এই যে, তাঁর কাছে লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একের পর এক দল আসত। ফলে উটনী খাড়া হবার পরের তালবিয়াহ যারা শুনল, তারা এটাকেই শুরু বলে ভাবল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলেন। যখন তিনি বায়দা উপত্যকার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছলেন তখন আবার তালবিয়াহ পাঠ করলেন। তাও লোকে শুনতে পেল। তখন তারাও ভাবল, তালবিয়াহ পাঠ এখান থেকে শুরু হলো। অথচ আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর নামাযের জায়গা জুল হালিফায় এহরাম বেঁধে সেখানে তালবিয়াহ শুরু করেন।

তারপর রওয়ানার সময় উটনীতে চড়ে এবং পথিমধ্যে বায়দা পাহাড়ের শীর্ষে উঠে তিনি তালবিয়াহ পাঠ করেন।

৬। সাহাবাদের মতভেদের আরেকটি কারণ হলো ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া। যেমন হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলে বেড়াতেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে উমরা করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন তা শুনলেন, বললেন ঃ সে ভুলে গেছে।

৭। স্মৃতি বিভ্রাটের কারণেও সাহাবাদের ভেতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন ইবনে উমর অথবা উমর (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তির উপর পরিবারবর্গের কান্নাকাটির জন্যেও আজাব হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) শুনে বললেন– হাদীসটি তার ঠিকমত জানা নেই। ঘটনা এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরলোকগত এক ইয়াহুদি রমণীর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, তার পরিবারের লোকজন তাকে স্মরণ করে বিলাপ করে চলছে। তখন তিনি বললেন ঃ কবরে তো সে শাস্তি ভোগ করছে আর এরা ঘরে বসে তার জন্য কাঁদছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর তা শুনে ভাবলেন যে, কান্নার কারণে শাস্তি হচ্ছে এবং তিনি প্রত্যেক মুর্দারের বেলায়ই এ বিধান প্রযোজ্য ভাবলেন।

৮। বিধানের কারণ সম্পর্কে মতভেদের কারণেও সাহাবাদের ভেতর মতভেদ দেখা দেয়। যেমন জানাযার জন্যে দাঁড়ানো। কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের সম্মানে দাঁড়াতে হবে। এটা মোমেন ও কাফের উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ বলেছেন, মৃত্যুকে ভয় করে দাঁড়াতে হবে। এটাও মোমেন ও কাফের উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন ঃ এক ইহুদি মহিলার জানাযার খাট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দিয়ে বয়ে নেয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি এটা পছন্দ করলেন না যে, ইয়াহুদির জানাযার খাটের নিচে তার মাথা থাক। মূলত এ ব্যাপারটি কাফেরের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট।

৯। মতভেদের অন্য এক কারণ হলো, দুটো ব্যাপারের সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতান্তর। তার উদাহরণ এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের বছরে মুতা বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর আওতাসের বছরেও অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর নিষিদ্ধ করে দেন। তাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) এভাবে সমন্বয় ঘটালেন যে, প্রয়োজনে বৈধ ছিল, অপ্রয়োজনে হারাম হয়েছে। এখনো হারামের বিধান রয়েছে। জমহুরের অভিমত

হলো এই, বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়ে শুধু মুবাহ করা হয়েছিল। এখন নিষেধাজ্ঞা এসে ক্ষেত্র বিশেষে মোবাহ করাও মানসুখ করেছে।

আরেক উদাহরণ এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। এখন একদল সাহাবীর মাজহাব হলো এই যে, এ বিধান ব্যাপকার্থে প্রযোজ্য এবং মানসুখ হয়নি। অথচ হযরত জাবের (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের এক বছর আগে তাকে কেবলামুখী হয়ে ইস্তেঞ্জা করতে দেখেছেন। তাই তার মজহাব হলো, পূর্বেকার নিষিদ্ধকরণ বাতিল হয়ে গেছে। তেমনি ইবনে উমর (রাঃ) দেখেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে পিঠ রেখে বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। তিনি এ কারণে অধিকাংশ সাহাবীর মাজহাব মেনে নেননি। অবশেষে ইমাম শাহবী সহ একদল এ দুটো মতের এভাবে সমন্বয় ঘটালেন যে, মুক্ত এলাকার বন-বাদাড়ে কেবলা বিবেচ্য হবে, কিন্তু বন্ধ পায়খানা, গাছ বা বাথরুমে তা বিবেচনার প্রয়োজন নেই। তবে অধিকাংশের মজহাব এটাই যে, নিষেধাজ্ঞা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তা তার জন্যে বিশেষ কারণে হয়ত খাস ঘটনা ছিল, তাই তাঁর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে না এবং তা কোনো অবস্থার সাথে নির্দিষ্টও হতে পারে না।

মোটকথা, এ সব কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের ভেতর ছোটখাটো মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাবেঈগণের যতটুকু তাওফীক হয়েছে সাহাবাদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও সাহাবাদের যে মাজহাব জানতে পেয়েছেন তা ভালোভাবে স্মৃতিস্থ করেছেন, তা বুঝে নিয়েছেন এবং সেগুলো সন্নিবেশ করেছেন। তারপর কোনোটির ওপর কোনোটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কোনো কোনো বক্তব্য ও অভিমত তাদের দৃষ্টিতে দুর্বল ও বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। এমনকি তা হয়ত কোনো বড় সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ফরজ গোসলের লোকের তায়াম্মুম করা সম্পর্কে ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত মাজহাবব যখন হযরত আম্মার (রাঃ) ও ইমরান ইবনে হেসীন প্রমুখের প্রাসঙ্গিক হাদীস মাশহুর হয়ে গেল, তখন তাদের মাজহাব অসার প্রমাণিত হলো।

এভাবে তাবেঈ আলেমদের প্রত্যেক আলেমের মাজহাব তার খেয়াল মোতাবেক দাঁড়িয়ে গেল। প্রত্যেক শহরে দ্বীনের একজন ইমাম দাঁড়িয়ে গেলেন।

যেমন মদীনায় হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ছিলেন। তাদের পরে ইমাম হলেন সেখানে ইমাম যুহরী, কাজি ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ ও রবীআ ইবনে আবদুর রহমান। মক্কার ইমাম ছিলেন আত্তা ইবনে আবি রিবাহ। কূফার ইমাম ছিলেন ইবরাহীম নাখঈ ও শাবী। বসরার ইমাম ছিলেন হাসান বসরী (রহঃ)। ইয়ামানের ইমাম ছিলেন তাউস ইবনে কায়সার। সিরিয়ার ইমাম ছিলেন মাকহুল (রহঃ)। আল্লাহ তাআলা অজস্র অন্তরকে তাদের জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। দলে দলে লোক তাদের কাছে ছুটে গেছেন। তারা তাদের থেকে হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ও ফতোয়া সংগ্রহ করেছেন এবং তাদের মাজহাব ও জ্ঞান গবেষণা জ্ঞাত হয়েছেন। তারা তাদের কাছে মাসআলা জানতে চাইতেন। ফলে তাদের ভেতর মাসআলার চর্চা চালু হলো। বিভিন্ন সমস্যা তাদের সামনে সমাধানের জন্যে পেশ করা হতো। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায় একত্র করলেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের তারা মূলনীতি বা অসূল নির্ধারণ করলেন যা তারা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন।

হযরত সাঈদ ও তাঁর সহচরদের অভিমত ছিল এই যে, ফিকাহ শাস্ত্রে মদীনার আলেমদের জ্ঞানই ছিল পাকাপোক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ফতোয়া ও মদীনার কাজিদের ফায়সালা তাদের ফিকাহর ভিত্তি ছিল। আল্লাহ পাক তাদের যা তাওফীক দিয়েছেন, তদনুসারে তারা তা সমবেত করেছেন। তারপর তা নিয়ে তারা গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আর তার ওপর সমগ্র মদীনার আলেমরা একমত হয়েছেন। তারা মজবুতভাবে তা গ্রহণ করেছেন। যে ব্যাপারে মতভেদ ছিল তা থেকে তারা শক্তিশালী ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটি গ্রহণ করেছেন।

মতের প্রাধান্য প্রাপ্তির কারণ বিভিন্ন ছিল। হয় তা অধিকাংশ আলেমের সমর্থনপুষ্ট, নয়ত তা কোনো জোরদার কেয়াসের অনুকূল ছিল অথবা কিতাব ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্যমতে তা উদ্ভাবিত হয়েছে। যখন তারা তাদের সংরক্ষিত জ্ঞান থেকে মাসআলার জবাব পাননি, তখন তারা পূর্ববর্তীদের অভিমত এবং ইশারা ইঙ্গিত নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক অধ্যায়ে তারা বহু মাসআলার সমাধান বের করেছেন।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ ও তাঁর সহচরদের অভিমত ছিল এই যে, ফিকাহর ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তাঁর সহচরদের অভিমতই সর্বাধিক

মজবুত। যেমন হযরত আরকামা (রহঃ) ইমাম মাসরূককে বললেন– আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে পাকা ফিকাহবিদ আর কেউ আছেন কি?

হযরত আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম আওযাঈকে বলেন, সালেম থেকে ইবরাহীম নাখঈ ফিকাহশাস্ত্রে অধিকতর মজবুত ছিলেন। আর যদি সাহাবী হিসেবে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী না হতেন তা হলে বলতাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে আলকামা ফিকাহ শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শী। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদই।

ইমাম আবু হানীফার ফিকাহর ভিত্তিই হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ফতোয়া, হযরত আলী (রাঃ)-এর ফয়সালা ও ফতোয়া, কাজি শুরাইর ফয়সালা এবং কুফার কাজিদের ফয়সালাসমূহ। তাঁকে আল্লাহ পাক যতখানি তওফীক দিয়েছেন তদনুসারে তিনি সেগুলো সমবেত করেছেন। তারপর তিনি সাহাবাদের আছার নিয়ে সেভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন যেভাবে মদীনার আলেমগণ করেছেন এবং তাঁদের অনুকরণেই তিনি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। এভাবেই প্রত্যেক অধ্যায়ের মাসআলা-মাসায়েল বিন্যস্ত হলো। এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব মদীনার ফকীহদের ভাষ্যকার হলেন।

তাঁর হযরত উমর (রাঃ)-এর ফয়সালা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস সর্বাধিক স্মৃতিস্থ ছিল। কূফার ফকীহদের মুখপাত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম নাখঈ। যখন এ দু'জন কোনো কথা বলতেন, এবং কারো সাথে সে কথার সম্পর্ক উল্লেখ না করতেন, তা হলেও দেখা যেত, তা পূর্বসূরিদের কারো সাথে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মিলে গেছে। উক্ত শহরদ্বয়ের ফকীহগণ সর্বসম্মতভাবে তাঁদের দুজনকে মেনে নিয়েছেন। তারা সেই দু'জনের কাছ থেকেই যা কিছু গ্রহণ করেছেন, বুঝে নিয়েছেন এবং তাদের থেকে অর্জিত ইলেমের ভিত্তিতেই তারা মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৮২

ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মজহাব সৃষ্টির কারণ

জেনে রাখুন, তাবেঈনের যুগ পার হলে আল্লাহ তাআলা ইলেম চর্চার জন্যে আরেকটি দল সৃষ্টি করলেন, কারণ এর মাধ্যমে তিনি তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন ঃ

"পরবর্তীকালে যারা আসবে তাদের প্রতিটি যুগেই একদল ন্যায়ানুগ লোক দ্বীনি ইলম অর্জন করবে।"

বস্তুত তাবেঈগণের যার সাথে যার সাক্ষাৎ হয়েছে তার কাছ থেকে পরবর্তী আলেমগণ অযু, গোসল, নামায, হজ্ব, বিয়ে, বেচা-কেনা এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যাপারের মাসায়েল শিখে নিয়েছেন। তাবেঈগণের কাছ থেকে তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস, বিভিন্ন শহরের কাজি ও মুফতীদের ফয়সালা ও ফতোয়া এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসায়েল জেনে নিয়েছেন। তারপর তার ওপর তারা ইজতিহাদ করে আরও মাসায়েল তৈরি করেছেন। ফলে তারাও জাতির ভেতরে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তারা যাবতীয় দ্বীনি কাজকর্মের ইমামরূপে গণ্য হলেন। তারাও শেষে তাদের পূর্বসূরি ওস্তাদদের মতো বাণীসমূহের ইশারা-ইঙ্গিত ও চাহিদা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালালেন। তারপর তা থেকে ফয়সালা বের করলেন, ফতোয়া দিলেন, বর্ণনা প্রদান করলেন ও শিক্ষা দিলেন।

এ স্তরের আলেমদের অনুসৃত পদ্ধতি একই ধরনের ছিল। তাঁদের পদ্ধতির সারকথা ছিল, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুসনাদ ও মুরসাল সব হাদীসই নিতেন এবং সাহাবা ও তাবেঈদের ফতোয়া ও অভিমতকে দলীল হিসেবে দাঁড় করাতেন। তা এ কারণে যে, সাহাবা ও তাবেঈদের বর্ণিত হাদীস মুরসাল বা মওকুফ হলেও তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচর ও নিকটবর্তী ন্যায়ানুগ দল বিধায় তা গ্রহণযোগ্য এবং এর দায়দায়িত্বও তাদেরই। তাঁরা হয়ত এ সব হাদীস কম মর্যাদার বিধায় মাওকুফ পর্যায়ে রেখেছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ করেননি। যেমন ইবরাহীম নাখঈ তাঁর কালে বলেছিলেন, যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাকেলা ও মুসাবেনা ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করার হাদীস উল্লেখ করলেন তখন লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, 'এ হাদীস ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আর কোনো হাদীস কি আপনার স্মরণে আছে?' তিনি জবাব দিলেন– হ্যাঁ, আছে, তবে তা আমি এভাবে বর্ণনা করব যে, আবদুল্লাহ এরূপ বর্ণনা করেছেন বা আলকামা এরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন শাবী থেকে যখন একটি হাদীস জেনে নেয়ার পর প্রশ্ন করা হলো, আপনার বর্ণিত হাদীসের সনদ কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে? তিনি জবাব দিলেন, না। কারণ আমি এটাই পসন্দ করি যে, আমার বর্ণনার সূত্র

উম্মতের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত থাক এবং আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত না যাক। কারণ, যদি এর ভেতর কিছুটা কমবেশ হয় তো তার দায় উম্মতের ঘাড়ে থাক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি, তার দায় তাঁর ওপরে না যাক।

তা ছাড়া এ স্তরের আলেমগণ সে সব থেকে এ কারণে দলীল পেশ করতেন যে, সাহাবা ও তাবেঈগণ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূল বাণীর ভিত্তিতেই দলীল দাঁড় করিয়েছেন এবং তাঁরা যদি ইজতেহাদও করে থাকেন তো যেহেতু তাঁরা আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করে পরবর্তীদের থেকে সর্বক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় রয়েছেন তাই তাও নির্ভরযোগ্য ও নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

সাহাবাদের ইলম অধিক সুরক্ষিত ছিল এবং সর্বব্যাপী ছিল। তাদের অভিমতের ওপর আমল নির্ধারিত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যদি তাদের ভিতর মতভেদ থাকলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তাছাড়া যদি তাদের কোনো অভিমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধী বলে বিবেচিত হয় তা হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তীদের এটা সর্বসম্মত রীতি ছিল যে, যখন কোনো মাসআলায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরস্পর বিপরীত হাদীস দেখা যেত, তখন তারা সে ব্যাপারে সাহাবাদের মতামতের মুখাপেক্ষী হতেন। তাঁরা হাদীসদ্বয়ের যদি কোনোটিকে মানসুখ বলতেন কিংবা কোনোটির বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তন ঘটাতেন অথবা কোনোটির ব্যাখ্যা করে সমন্বয় ঘটাতেন, তবে তারাও সেটাই গ্রহণ করতেন। তথাপি তারা কোনো হাদীস বর্জন করতেন না এবং তা না করার ব্যাপারে তারা একমত ছিলেন। কারণ, তারা সে ব্যাপারে সাহাবাদের অনুসৃত মানসুখের হুকুম, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনের রীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন।

এ কারণেই কুকুরের ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে ইমাম মালেক (রাঃ) বললেন, এটা হাদীস তো বটেই। কিন্তু আমি হাদীসটির ব্যাপারে কিছু জানিনা। ইবনে হাজেব তার 'মুখতাসারুল অসূল' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে আমি কোনো ফকীহকে এর ওপর আমল করতে দেখিনি।

যখন সাহাবা ও তাবেঈদের মাঝে কোনো ব্যাপারে মতভেদ দেখা গেছে, তখন আলেমদের কাজ হয় নিজ নিজ মাজহাবের ইমামদের অনুসরণ করা। কারণ, তারাই সেগুলোর সঠিক-বেঠিক যাচাই করে মাজহাব দাঁড় করিয়েছেন এবং তারাই সেটা জানতেন ভালো। তারা যাচাই বাছাইয়ের মূলনীতি ভালোভাবে

জানতেন ও বুঝতেন এবং তাদের অন্তর সাহাবা ও তাবেঈদের অবদান ও গভীর জ্ঞানের প্রভাবে উদ্ভাসিত ছিল। তারা হযরত উমর, হযরত উসমান, ইবনে উমর, হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) প্রমুখের মাজহাব এবং তাদের সহচর যেমন সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব প্রমুখের মাজহাব, হযরত উমর (রাঃ)-এর ফয়সালা ও হযরত আবু হোরায়রার হাদীসসমূহ অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তেমনি হযরত উরুয়া সালেম, আতা ইবনে ইয়াসার, কাসেম ওবায়দুল্লাহ, যুহরী, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ, যায়েদ ইবনে আসলাম ও রবিআর মাজহাবও তাদের নখদর্পণে ছিল। মদীনাবাসীদের নিকট এদের মাজহাব অন্যান্যের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য ছিল। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার অনেক ফজিলাত বর্ণনা করে গেছেন এবং এ শহরটি সব যুগেই ফকীহদের আস্তানা ও আলেমদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাই এখানকার ফকীহদের গুরুত্ব বেশি দেয়া হতো। এ কারণেই আপনারা দেখবেন যে, ইমাম মালেক মদীনার মাসলাকের সাথে সুদৃঢ়ভাবে জড়িত ছিলেন।

কূফাবাসীদের কাছে অধিকতর গ্রহণ ও আমলযোগ্য ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও তাঁর সহচরবৃন্দের মাজহাব। তেমনি হযরত আলী (রাঃ), শুরায়েহ ও শাবীর ফয়সালা এবং ইবরাহীম নাখঈর ফতোয়া তাদের কাছে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ছিল। মাসরূক যখন তাশরীকের মাসআলায় যায়েদ ইবনে ছাবেতের অভিমতের দিকে ঝুঁকে গেলেন, তখন আলকামা বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে কেউ কি বেশি নির্ভরযোগ্য হতে পারে? তিনি তার জবাবে বললেন, না। তবে আমি যায়েদ ইবনে ছাবেত ও মদীনাবাসীকে তাশরীক করতে দেখেছি।

কোনো এক শহরের লোক যদি কোনো ব্যাপারে একমত হয়ে যেত, তা হলে তার ওপরে মজবুতভাবে জমে যেত। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ভিত্তিতেই বলেছেন, যেসব সুন্নতের ব্যাপারে আমাদের মতভেদ নেই তা হলো এইগুলো। যদি কোনো মাসআলায় তাদের মতভেদ দেখা দিত, তা হলে যেটা শক্তিশালী ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হতো, সেটাই তারা গ্রহণ করতেন। শক্তিশালী ও প্রাধান্য প্রাপ্ত হবার কারণ ছিল এই যে, হয় তার বর্ণনাকারীণ সংখ্যা অধিক হতো, নয়ত তা মজবুত কেয়াস মোতাবেক হতো কিংবা তা কুরআন ও সুন্নাহর থেকে সরাসরি উদ্ভাবিত বিষয় হতো। এ সব ধরন সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন, আমি যা কিছু শুনতে পেয়েছি তার ভেতর উত্তম মত এটাই।

এ স্তরের আলেমরা যখন তাদের সংরক্ষিত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কোনো মাসআলার জবাব না পেতেন, তখন পূর্বসূরিদের বক্তব্যের ইশারা-ইঙ্গিত ও চাহিদা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে তার সমাধান বের করতেন। এ যুগের আলেমদের অন্তরে কিতাব সংকলন ও প্রণয়নের ঐশী ইঙ্গিত সক্রিয় হলো। ফলে মদীনায় ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু জিব কিতাব প্রণয়ন ও সংকলনে হাত দিলেন।

মক্কায় ইবনে জুরাইজ ও ইবনে উআইনা কিতাব প্রণয়ন করেন। কূফায় সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ও বসরায় রবী ইবনে সবীহ কিতাব প্রণয়ন করেন। এ সব কিছুই আমার আলোচিত পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তাই বাগদাদের খলীফা মানসুর যখন হজ্ব করতে এলেন, তখন ইমাম মালেককে বললেন ঃ

"আমার ইচ্ছা যে, আপনি যে কিতাব (মোয়াত্তা) লিখেছেন তার অনুলিপির এক এক কপি সব শহরে পাঠিয়ে দেই এবং সবাইকে নির্দেশ দেই যে, এ কিতাবে যা আছে তা মেনে চলবে এবং এর বাইরে কিছু খুঁজতে যাবে না। তিনি তা শুনে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! তা করবেন না। কারণ, লোকদের কাছে আগেই বিভিন্ন অভিমত ও মাজহাব পৌছে গেছে। তারা বিভিন্ন হাদীস শুনে তা বর্ণনা করে চলছে। সব এলাকার লোকই তাদের কাছে যা আগে পৌছেছে তা অনুসরণ করে চলছে। লোকদের ভেতর মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই প্রত্যেক শহরবাসী নিজেদের জন্যে যে মাজহাব গ্রহণ করেছে তা নিয়ে তাদের থাকতে দিন।

এ ঘটনাটিই খলীফা হারুনুর রশীদের সাথেও যুক্ত করা হলো। তাতে বলা হয়, খলীফা হারুন ইমাম মালেকের সাথে মতবিনিময় প্রসঙ্গে বলেন, মুআত্তা গ্রন্থটি কাবা ঘরে লটকে রাখা হবে এবং তাতে যা লেখা হয়েছে তা আমল করার জন্যে লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। ইমাম তখন বললেন, এটা করবেন না। কারণ, খুঁটিনাটি ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের ভেতরেও মতভেদ ছিল এবং তা এখন বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি প্রত্যেকটি মাজহাব চালু হয়ে গেছে। তা শুনে খলীফা বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে অধিকতর তাওফীক দিন।

এ ঘটনাটি ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) বর্ণনা করেন।

মদীনার আলেমদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সব হাদীস পৌছেছে তার সংকলনগুলোর ভেতর সূত্র বিচারে ইমাম মালেকের মুআত্তা

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তিনি উমর (রাঃ)-এর ফয়সালা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমত ও বক্তব্যসমূহ এবং তাদের সহচর সপ্ত ফকীহর ফতোয়া সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। অদ্রূপ বর্ণনা ও ফতোয়া সম্পর্কিত বিদ্যা ও শাস্ত্র ইমাম মালেক ও তাঁর মতো আলেমদের দ্বারাই গড়ে উঠেছে। যখন তাদের ওপর এ দায়িত্ব স্বভাবতই এসে গেল, তখন তারা হাদীসের পাঠদান ও ফতোয়া প্রদান শুরু করলেন এবং লোকদের কল্যাণ পৌঁছাতে থাকলেন। এভাবেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর বাস্তবায়ন ঘটল। উনি বলে গেছেন ঃ

"শীঘ্রই লোকেরা জ্ঞান অর্জনের জন্যে উটে চড়ে সফরে বের হবে। তবে মদীনার আলেমের চেয়ে বিজ্ঞ আলেম কোথাও পাবে না।"

ইবনে উআইনা ও আবদুর রাজ্জাক এ হাদীসটি তাঁর ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করেছেন এবং তাদের দুজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

ইমাম মালেকের সহচরবৃন্দ তাঁর বর্ণনা ও বক্তব্যসমূহ একত্রিত করেছেন। তারা সেগুলোর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করেছেন এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রচনা করেছেন। তা থেকে তারা মাসআলা বের করেছেন। তাঁর নির্ধারিত মূলনীতি ও দলীল-প্রমাণগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছেন। তাঁর শিষ্যরা পশ্চিমাঞ্চলে ও বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছেন। আল্লাহ পাক বহু মানুষকে তাদের দ্বারা কল্যাণ পৌঁছিয়েছেন। যদি আমাদের এ কথার সত্যতা যাচাই করতে চাও যা আমি তাঁর মাজহাবের মূলনীতি সম্পর্কে বললাম, তা হলে মুআত্তায়ে ইমাম মালেক খুলে দেখ। দেখতে পাবে, আমার বর্ণিত মূলনীতির প্রতিফলন তাতে বিদ্যমান।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইবরাহীম নাখঈ ও তাদের সমকালীন আলেমদের মাজহাবের অধিকতর অনুসারী ছিলেন। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি তাদের ব্যতিক্রম কিছু করেছেন। তাঁর মাজহাব অনুসারে তিনি মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবনের কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তা ছাড়া খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার পরিপূর্ণ নজর ছিল। যদি তুমি আমার এ-বক্তব্যের সারবত্তা জানতে চাও, তা হলে তুমি ইমাম মুহাম্মদের 'কিতাবুল আছার', 'জামে আবদুর রাজ্জাক' ও 'মুসান্নাফে আবু বকর ইবনে শায়বা' থেকে ইবরাহীম নাখঈ ও তাঁর সমকালীন আলেমদের বক্তব্যের সার কথা বের কর। তারপর তাঁর মাজহাবের সাথে তা মিলিয়ে দেখ। মুষ্টিমেয় জায়গা ছাড়া সর্বত্রই আমার কথার

প্রমাণ পাবে। তার ওপর মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম যা দেখা যায় তাও কূফার ফকীহদের মাজহাবের বাইরে নয়।

ইমাম আবু হানীফার বিখ্যাত শিষ্য হলেন কাজি আবু ইউসুফ (রহঃ)। খলীফা হারুন রশীদের যুগে তিনি কাজিউল কুযযাত বা প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ইমাম সাহেবের মাজহার ইরাক, বসরা ও এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণেই বিচার-আচার সেই অনুসারে হতো। ইমাম সাহেবের শিষ্যদের ভেতরে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী উত্তম মুসান্নেফ ছিলেন। তিনি ইলম ও দরসের পাবন্দ ছিলেন। তিনি আবু ইউসুফ ও ইমাম সাহেবের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর মদীনায় যান। সেখানে ইমাম মালেকের কাছে মোয়াত্তা অধ্যয়ন করেন। তারপর নিজে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান। তাঁর সহচরদের মাজহাবের প্রতিটি মাসআলা মোয়াত্তার সাথে মিলিয়ে দেখেন। যদি মিলে যেত তো ঠিক ভাবতেন। অন্যথায় যদি সাহাবা ও তাবেঈদের জামাতকে নিজ সহচরদের মতের অনুকূলে পেতেন তা হলে সেটাই বহাল রাখতেন। পক্ষান্তরে যদি তাদের কেয়াস দুর্বল দেখতেন এবং তার বিপরীত বিশুদ্ধ হাদীস দেখতেন কিংবা অধিকাংশ আদেশের আমল তার বিপরীত দেখতেন, তা হলে পূর্বসূরিদের মাজহাবের অপেক্ষাকৃত সবল মতটি তিনি গ্রহণ করতেন। মূলত ফকীহদের রীতি এটাই। তবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন ইবরাহীম নাখঈ ও তাঁর সমসাময়িক আলেমদের মাজহাব আকড়ে থাকতে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর তরীকাও তাই ছিল। অবশ্য দুটি অবস্থার কোনো না কোনো একটিতে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে যেত।

হয় তাদের শায়েখ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইবরাহীম নামঈর মাজহাব থেকে যে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন তা নিয়ে শায়েখের সাথে তাদের মতবিরোধ ঘটেছে। নয়ত ইবরাহীম নাখঈ ও তার মতাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমতের কোনো একটি প্রাধান্য দেবার ক্ষেত্রে শায়েখ ও শাগরিদের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ কিতাব লিখে উক্ত তিন ইমামের রায়গুলো সন্নিবেশিত করেন। তা থেকে বহু লোক কল্যাণ লাভ করেছে। পরিশেষে আবু হানীফা (রহঃ)-এর সহচরবৃন্দ সেসব কিতাবের দিকে মনোনিবেশ করেন। সেগুলোর সারসংক্ষেপ রচনা করেন ও সেগুলো দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকা টিপ্পনি লিপিবদ্ধ করেন। তা থেকে

মাসআলা উদ্ভাবন করেন। সেগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তারপর সেই আলেমরা সেগুলো নিয়ে খোরাসান ও এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়েন। তারা তাদের মাজহাবের নাম দিলেন হানাফী মাজহাব।

ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আত্মপ্রকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ী গড়ে উঠছিলেন। তিনি পূর্বসূরিদের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে কিছু ব্যাপার এমন দেখতে পেলেন যা অনুসরণ করা চলে না। তিনি তার রচিত 'কিতাবুল উম্মে'র শুরুতে তা বর্ণনা করেছেন। তার ভেতর একটি ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি দেখতে পেলেন, পূর্বসূরিগণ মুরসাল ও মুনকাতে হাদীসের ওপরেও আমল করতেন। অথচ সেসব হাদীসে ভুলভ্রান্তি বিদ্যমান ছিল। যখন হাদীসের সব সূত্র একত্রিত করা হতো তখন পরিষ্কার দেখা যেত যে, এমন সব মুরসাল হাদীসও রয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই। কিছু কিছু মুরসাল রেওয়ায়েত মুসনাদ রেওয়াতের পরিপন্থীও দেখা যায়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নির্ধারিত শর্তাবলি না পাওয়া গেলে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। উক্ত শর্তাবলি অসূলের কিতাবে বিদ্যমান।

অপর বিষয়টি এই যে, পূর্বসূরিদের কালে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী হাদীসের ভেতর সমন্বয় সাধনের কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মনীতি ছিল না। তাই তাদের গবেষণায় ভুলচুক দেখা দিত। তাই তিনি তার নিয়মনীতি নির্ধারণ করে এক কিতাব রচনা করলেন। গ্রন্থাকারে রচিত অসূলে ফেকাহর এটাই পয়লা কিতাব। আমাদের কাছে তার যে নমুনা পৌছেছে তা এই যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসানের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তখন মদীনার আলেমদের ওপর প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, তারা একজন সাক্ষ্য এবং কসমের ওপর ফয়সালা দেন। ইমাম মুহাম্মদ বলতেন যে, আল্লাহর কিতাবের ওপর তাদের এটা বাড়াবাড়ি।"

ইমাম শাফেঈ বললেন, তা হলে আপনি কেন বলছেন, ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত করা জায়েয নয়? আর তার দলীল হিসেবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বক্তব্য পেশ করছেন যে, খবরদার! ওয়ারিসের জন্যে ওসিয়াত জায়েয নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের কেউ মৃত্যুর মুখোমুখি হলে তার জন্যে ফরজ হলো ওসিয়াত করা।

এ ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন ইমাম শাফেঈ ইমাম মুহাম্মদকে করলেন। ইমাম মুহাম্মদ চুপ থাকলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

একটি ব্যাপার হলো এই যে, সে সব তাবেঈন আলেমদের কাছে অনেক সহীহ হাদীস পৌছে ছিল না যাদের হাতে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব ছিল। ফলে তাদের ইজতেহাদী রায় দিতে হয়েছে। হয় তারা সাধারণভাবে জ্ঞাত জিনিসের ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছেন, নয়তো সাহাবাদের কারো অনুসরণ করে রায় দিয়েছেন। অতঃপর তৃতীয় স্তরে এসে তাদের অজানা হাদীসগুলো মশহূর হয়ে গেল। তখন আবার তারা এ জন্যে তা গ্রহণ করতে পারেন নি যে, তাদের শহর যা অনুসরণ করে চলছে তা তার পরিপন্থী। মানে, তাদের সর্বসম্মত রায়ের তা বিরোধী। আর এ কারণেই তারা সে সব হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজেছেন এবং তা বাতিল ঘোষণা করেছেন।

কিছু কিছু হাদীস তৃতীয় স্তরে এসেও খ্যাতি লাভ করেনি। বরং তারপরে এসে তখন মশহুর হয়েছে যখন মোহাদ্দেসগণ হাদীসের সূত্র জমা করার দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। তারা হাদীসের বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান চালালেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় হাদীস সংগ্রহের জন্যে সফর শুরু করলেন। পরন্তু হাদীস বিশারদদের কাছে তারা সেগুলোর যাথার্থ্য সম্পর্কে জেনে নিলেন। ফলে এমন বহু হাদীস সামনে এল যার বর্ণনা মাত্র দু'-একজন সাহাবী দিলেন। কিংবা তাদের থেকে মাত্র দু-একজন বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেছেন।

এভাবে সামনে এগিয়ে চলুন। বস্তুত এ সব হাদীস ফকীহদের দৃষ্টির বাইরে ছিল। এগুলো মশহুর হলো হাদীসের হাফেজগণ যখন হাদীসের সূত্রসমূহের সমাবেশ ঘটালেন। যেমন, বহু হাদীস বসরাবাসী বর্ণনা করেছেন। অথচ অন্যান্য শহরের লোক তার খবরই রাখত না। তাই ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন– সাহাবা ও তাবেঈ আলেমগণ প্রতিটি মাসআলার জন্যে হাদীস খুঁজতেন। যখন তা পেতেন না, তখন তারা অন্য কোনো দলীল দাঁড় করাতেন। তারপর যখন কোনো হাদীস পেয়ে যেতেন, তখন তারা ইজতেহাদ ছেড়ে হাদীসই অনুসরণ করতেন।

ঘটনা যখন এই, তখন তাদের হাদীস মোতাবেক ফয়সালা না দেয়াকে হাদীসকে ত্রুটিপূর্ণ ভাবা বলা যায় না। তবে হাঁ, হাদীসে যদি মূলতঃই কোনো একটি ত্রুটি থাকে তো সেটা ভিন্ন কথা। এর উদাহরণ হচ্ছে 'কুল্লাতাইন' বা দু'মশকের হাদীস। হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। সব চাইতে বড় সূত্র হলো যে, হাদীসটি আবুল ওয়ালিদ হতে বর্ণিত। তিনি তা মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে জুবায়ের থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বা মুহাম্মদ ইবনে ইবাদ ইবনে

জাফর থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে এবং তারা দুজন ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। এরপর হাদীসের সূত্র বিভিন্ন হয়ে গেল। উপরোক্ত দুজন যদিও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তথাপি তারা সেই পর্যায়ের নয় যাদের হাতে ফতোয়া সোপর্দ করা হয়েছে। তা না হলে তারা লোকদের কাছে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত ছিলেন। এ ধরনের হাদীস সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব ও যুহরীর যুগে খ্যাতি লাভ করেনি। এ কারণেই হানাফী ও মালেকী আলেমরা তার ওপর আমল করেননি। ইমাম শাফেঈ তার ওপর আমল করেছেন। খেয়ারে মজলিসের হাদীসের মতোই এ হাদীসটিও বিশুদ্ধ। অনেক সূত্র থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সাহাবাদের ভেতর ইবনে উমর ও আবু হোরায়রা (রাঃ) হাদীসটির ওপর আমল করেছেন। কিন্তু সপ্ত ফকীহ ও তাদের সমকালীন আলেমদের সামনে হাদীসটি প্রকাশ পায়নি। এ কারণেই তারা তা গ্রহণ করতে পারেননি। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা একক সূত্রের হাদীস ভেবে সেটাকে বাদ দিয়েছেন। অথচ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তা গ্রহণ করেছেন।

এর কারণ এটাও যে, ইমাম শাফেঈর (রহঃ) যুগে সাহাবাদের বাণীগুলো সমবেত করা হয়েছে এবং বহুল পরিমাণ আছারের সমাবেশ ঘটেছে। তার ভেতর মতভেদও ছিল। তার ভেতর বেশ কিছু আছার ইমাম শাফেঈ হাদীস বিরোধী দেখতে পেয়েছেন। কারণ, সে ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবার কাছে হাদীস পৌঁছেনি। তিনি দেখতে পেলেন যে, এ ধরনের ব্যাপারে পূর্বসূরিরা হাদীস অনুসরণ করতেন। তাই তিনি মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবাদের যে সব আছার সর্বসম্মত ছিল না তা বর্জন করতেন। তিনি বলতেন– তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

একটি ব্যাপার এ ছিল যে, শাফেঈ (রহঃ) একদল ফকীহকে দেখতে পেলেন যে, তারা শরীআত দ্বারা যা প্রমাণিত সত্য সেটাকে কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত বস্তুর সাথে ঘুলিয়ে ফেলেছেন। অথচ শরীআতের দৃষ্টিতে এ ধরনের কেয়াসের কোনোই গুরুত্ব নেই। তারা শরীআত সম্মত কেয়াস ও ব্যক্তিগত আনুমানিক সিদ্ধান্তের ভেতরে কোনো পার্থক্য করতেন না। কখনো বা ব্যক্তিগত আনুমানিক সিদ্ধান্তকেই এস্তেহসান বা উত্তম বলে আখ্যায়িত করতেন।

ব্যক্তিগত আনুমানিক সিদ্ধান্ত বলতে আমি বুঝিয়েছি সেটাকে যাতে কোনো ক্ষতি বা কল্যাণকে কারণ ধরে নিয়ে হুকুম দেয়া হয়। ইমাম শাফেঈ এ শ্রেণীর কেয়াসকে পুরোপুরি বাতিল করেছেন। তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি নিজেই

কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করে মাসআলার হুকুম দেন, তিনি শরীআত প্রণেতা হতে চান।'

ইবনে হাজিব তাঁর 'মুখতাসারুল অসূল' গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন। তার উদাহরণ হলো এই যে, ইয়াতীম কখন সর্বিক জ্ঞানের মালিক হয় তা একটা অন্তর্নিহিত ব্যাপার। এ কারণে ফকীহরা সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন হবার একটা আনুমানিক বয়স নির্ধারণ করেছেন পঁচিশ বছর। তারা এ অনুমিত বয়সটিকে সার্বিক জ্ঞান লাভের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং বললেন, পঁচিশ বছর বয়স হলেই ইয়াতীমের সম্পদ তার হাতে সোপর্দ করা যাবে। তারা এটার নাম দিয়েছেন এস্তেহসান বা উত্তম ব্যবস্থা। অথচ শরীআত সম্মত কেয়াস বলে, এভাবে তা করা যায় না।

সার কথা হলো এই যে, ইমাম শাফেঈ যখন পূর্বসূরিদের এ অবস্থা দেখতে পেলেন, তখন তিনি ফেকাহ শাস্ত্রকে নতুনভাবে গড়ে তুললেন। তিনি অসূলে ফেকাহ নির্ধারণ করলেন এবং তার ভিত্তিতে ফেকাহর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিন্যস্ত করলেন। তার ওপর তিনি কিতাব লিখলেন। নিজে যথেষ্ট কাজ করলেন এবং লোকদের প্রচুর কল্যাণ সাধন করলেন। ফকীহরা তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন, তাঁর কিতাবের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লিখলেন, দলীল প্রমাণ তুলে ধরলেন ও মাসআলা-মাসায়েল তৈরি করলেন। তারপর তারা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়লেন। অবশেষে এ মাজহাব শাফেঈ মাজহাব নামে খ্যাত হলো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়-৮৩

মোহাদ্দেসীন ও আহলে রায়ের মাঝে পার্থক্য

এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহীম, যুহরী, মালেক, সুফিয়ান ছাওরীর যুগে একদল আলেম নিজেদের তরফ থেকে ইজতেহাদ করে রায় দেয়া পসন্দ করতেন না। তারা ফতোয়া দেয়া ও মাসআলা বের করার ব্যাপারেও ভয় পেতেন। শুধু বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা করতেন। তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনার ওপর।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে এক ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি এটা পসন্দ করি না যে, আল্লাহ পাক যা হালাল করেছেন তা হারাম করব কিংবা আল্লাহ পাক যা হারাম করেছেন তা হালাল করব।

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, হে লোকসকল! পরীক্ষার মুহূর্ত না আসতেই তা চেয়ে নিও না। কারণ মুসলমানদের ভেতর এমন লোক বিদ্যমান থাকবে যাদের কাছে কোনো মাসআলা জানতে চাইলেই তারা তা বলে দেবে।

হযরত উমর, হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)ও না আসা বিপদ ডেকে আনার ব্যাপারটি অপসন্দ করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত জাবির ইবনে যায়েদকে বলেন, 'তুমি তো বসরায় থাক। সর্বদা কুরআনের ভাষ্য ও সনাতন সুন্নাতের ভিত্তিতে ফতোয়া দেবে। কারণ, তা ছাড়া তুমি যদি কিছু কর তা হলে তুমিও ধ্বংস হবে এবং অপরকেও ধ্বংস করবে। আবু নসর বলেন, যখন হযরত আবু সালমা বসরায় এলেন, তখন আমি ও হযরত হাসান তাঁর কাছে গেলাম। হযরত আবু সালমা হযরত হাসানকে বললেন, তুমি কি হাসান? আমি বসরায় তোমার দেখা পাবার জন্যে বেশি উদগ্রীব ছিলাম। এ কারণে যে, আমি জানতে পেলাম, তুমি নিজের রায় মোতাবেক ফতোয়া দাও। ভবিষ্যতে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও আল্লাহর কিতাবের ভাষ্যমতেই ফতোয়া দেবে।

ইবনে মুকান্দার বলেন, আলেমরা মূলত আল্লাহ ও তাঁর মাখলূকের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। তাই তাদের উচিত নাজাতের রাস্তা ধরে চলা।

ইমাম শাবীকে প্রশ্ন করা হলো, যখন আপনার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন কোন পন্থা অবলম্বন করেন? তিনি বললেন, তুমি ভালো প্রশ্ন করেছ। যখন আমাদের কারো কাছে কোনো মাসআলা জানতে চাওয়া হতো, তখন তিনি তার সাথীকে বলতেন, তুমি তার জবাব দাও। এ ভাবে এ ওকে জবাব দেবার কথা বলতে বলতে মূল ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যেত।

ইমাম শাবী বলতেন, তোমাকে যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হবে তা অনুসরণ কর। আর যা কিছু কেয়াস করে নিজের রায় শুনানো হয়, তা পায়খানায় নিক্ষেপ কর। এ সব আছার ইমাম দারেমী (রহঃ) বর্ণনা করেন।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র হাদীস ও আছার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের প্রতিলিপি ও কপি ছড়িয়ে পড়েছে। পরিশেষে বর্ণনাকারীদের এমন লোকের সংখ্যা কমই ছিল যাদের সংকলিত সহীফা বা পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়নি। এটা এ কারণে হতো যে, বিভিন্ন এলাকায় তার প্রয়োজন দেখা দিত। সে যুগের হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক, মিসর, ইয়ামান ও খোরাসানের বড় বড়

আলেমগণ তাদের কাছে আসতেন এবং কিতাবগুলো একত্র করে তার বিভিন্ন কপি তৈরি করে তা নিয়ে গবেষণা করতেন। তার কোনটা গরীব হাদীস, কোনটা নাদের এবং আছারগুলোর কোনটা কি পর্যায়ের তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাতেন। তাদেরই প্রচেষ্টায় সে সব হাদীস ও আছার সংগৃহীত হলো যা আগে কখনো হয়নি। তাই ইলেম চর্চার ক্ষেত্রে তারা সে সুযোগ পেয়ে গেলেন যা আগের লোকেরা পাননি। হাদীসের বিভিন্ন সূত্রও তাদের হস্তগত হলো। এমনকি এরূপ অনেক হাদীস তারা পেলেন যার এক একটির শতাধিক সূত্র বিদ্যমান। ফলে একটি সূত্রে যা সুপ্ত ছিল অপর এক সূত্রে তা ব্যক্ত হতে দেখলেন। ফলে কোন হাদীসটি গরীব আর কোনটি মশহুর তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। মোতাবেআত ও শাওয়াহেদের বিন্যাস নিয়েও তারা চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পেলেন। তখন এমন বহু সহীহ হাদীসের তারা হদিস পেলেন যা পূর্বযুগের মুত্তাকী লোকদের সামনে প্রকাশ পায়নি।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে বললেন, আপনি আমাদের চেয়ে বেশি সহীহ হাদীস জানেন। যখন কোনো নতুন সহীহ হাদীস আপনি পান তখন আমাকে তা জানাবেন। তা হলে আমি তার ভিত্তিতে আমার মাজহাবের মাসআলা ঠিক করে নেব। সে সহীহ হাদীস কূফা, বসরা বা সিরিয়া যে কোনো সূত্রেই পান না কেন তাতে কোনো আপত্তি নেই। এটা ইবনে হাম্মামের বর্ণনা। এর কারণ এই যে, কিছু সহীহ হাদীস এমন আছে যা বিশেষ কোনো শহরের বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেছেন। যেমন সিরিয়া বা ইরাকের বর্ণনাকারীগণ। কখনো তা একদল বর্ণনাকারীর বর্ণনা হয়। কখনো আবার কোনো বিশেষ পরিবারের বর্ণনা হয়। যেমন হযরত বুরাইদের পাণ্ডুলিপি। তিনি তা আবু বুরদাহ থেকে ও তিনি আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেন। তেমনি আমর ইবনে শুআইবের কপি। তিনি তা তার পিতা শুআইব থেকে ও তিনি তা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। কিছু হাদীস এমন আছে যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা নগণ্য এবং কোনো অখ্যাত সাহাবী থেকে তা বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মুফতীগণ এ সব হাদীসের খবর রাখতেন না। অতঃপর তাদের সামনে বিভিন্ন শহরের সাহাবী ও তাবেঈদের আছার ও অভিমত জমা হয়ে গেল। এর আগে তারা শুধু নিজ শহরের আছার ও অভিমত অবহিত ছিলেন। আগেকার আলেমগণ বর্ণনাকারীদের নাম-ধাম ঠিকানা ও তাদের ন্যায়ানুগতা বা স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে হাদীসের পারিপার্শ্বিক ও লক্ষণাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। পরবর্তীকালে আসমাউর রেজাল ও আদালতের

স্তরভেদের ওপর যথেষ্ট তথ্য ভিত্তিক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণীত হয়। তারা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও অসিদ্ধতা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। এ গবেষণার ও গ্রন্থ রচনার ফলে তাদের সামনে মুত্তাসিল ও মুনকাতে হাদীসের রহস্য খুলে গেল। হযরত সুফিয়ান ও ওয়াকী (রহঃ)ও তাঁদের পর্যায়ের আলেমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তথাপি তারা মারফূ মুত্তাসিল হাদীস এক হাজারের কম পেয়েছেন। আবু দাউদ আস্ সাজাস্তানী এ তথ্য বর্ণনা করেছেন মক্কাবাসীদের কাছে লেখা এক পত্রে।

এ স্তরের হাদীস বিশারদগণ প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। পরন্তু ইমাম বুখারী সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, তিনি ছয় হাজার বাছাই করে তাঁর সহীহ সংকলনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেছেন। আবু দাউদ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পাঁচ হাজার হাদীস বাছাই করে তাঁর সুনানের সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন। ইমাম আহম্মদ (রহঃ) নিজ মুসনাদকে হাদীসের মানদণ্ড স্থির করে বললেন, এ সংকলনেই আসল হাদীসের সন্নিবেশ ঘটেছে। এর বাইরে যে সব হাদীস বিদ্যমান তা অসার ও ভিত্তিহীন। এ যুগের সেরা আলেমগণ হলেন– আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান, ইয়াজিদ ইবনে হারুন, আবদুর রাজ্জাক, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, মুসাদ্দাদ, হান্নাদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহবিয়া, ফজল ইবনে দাকীন, আলী আল মাদীনী প্রমুখ।

মুহাদ্দেসীনের স্তরের তারাই পয়লা নিদর্শন। এ স্তরের অনুসন্ধিৎসু মোহাদ্দেসগণ বর্ণনার বিষয়টিকে পূর্ণত্ব দান করেছেন এবং হাদীসের বিন্যাস সাধন করে ফেকাহ শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। যখন তারা তাদের বিন্যস্ত হাদীস ও আছারগুলোকে প্রচলিত মাজহাবগুলোর পরিপন্থীও দেখতে পেলেন তখন তারা অতীতের ফকীহদের অনুসরণের ওপর একমত হওয়া সঠিক ভাবলেন না। তাই তারা তাদের রচিত নীতিমালার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও সাহাবা, তাবেঈন ও মোজতাহেদীনের আছার নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালালেন। আমি সংক্ষেপে সেই নীতিমালাগুলো তুলে ধরছি।

১। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, যেখানে কুরআনের ভাষ্য সুস্পষ্ট সেখানে অন্যদিকে যাবার কোনো বৈধতা নেই।

২। যখন কুরআন পাকের ভাষ্য কয়েক দিকে ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ মোতাবেক তার ফয়সালা হবে।

৩। তারা যখন আল্লাহর কিতাবে প্রশ্নের সমাধান না পেতেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসরণ করতেন। সে হাদীস মুস্তাফীজ হোক, ফকীহদের কাছে গ্রহণযোগ্য বা বিশেষ শহরের কাছে গ্রহণযোগ্য হোক, অথবা বিশেষ কোনো সূত্রে বর্ণিত হোক, সাহাবা ফকীহরা তা অনুসরণ করুন বা না করুন সেটা তারা দেখতেন না।

৪। কোনো মাসআলায় যদি তারা যে কোনো ধরনের হাদীস পেতেন তা হলে তার মোকাবেলায় কোনো আছার বা ইজতেহাদের অনুসারী হতেন না।

৫। যখন হাদীসসমূহের পুরোপুরি অনুসন্ধান তারা শেষ করতেন এবং নির্দিষ্ট মাসআলার জবাব তাতে না পেতেন, তখন সাহাবা ও তাবেঈদের ভাষ্য অনুসরণ করতেন। সেক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট কোনো শহর বা গোত্রের অনুসারী হতেন না। অথচ তাদের পূর্ববর্তীরা তাই করতেন।

৬। যদি কোনো ব্যাপারে অধিকাংশ খলীফা বা ফকীহদের মতৈক্য দেখতে পেতেন তা হলে সেটাকে তারা যথেষ্ট ভাবতেন।

৭। যদি কখনো তাদের ভেতর মতভেদ দেখা দিত, তখন নিজেদের ভেতর যে শ্রেষ্ঠ আলেম, সেরা মুত্তাকী কিংবা যার স্মৃতিশক্তি প্রখর অথবা যার খ্যাতি সর্বাধিক তার অনুসৃত হাদীস গ্রহণ করতেন।

৮। যদি কোনো মাসআলায় দুটো মতই সমান পাল্লার দেখতে পেতেন, তখন দু'মতের যে কোনোটি অনুসরণকে বৈধ ভাবতেন।

৯। যদি তাও সম্ভব না হতো, তা হলে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসৃত সাধারণ রীতিনীতি ও বিধিবিধান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন। অতঃপর এ ধরনের অন্যান্য মাসআলার দৃষ্টান্ত মোতাবেক নতুন মাসআলার জবাব বের করতেন। যখন দুটো মাসআলার অবস্থা বাহ্যত একরূপ হতো তখনই তারা অনুরূপ হুকুম দিতেন। সেক্ষেত্রে নিজেদের রীতিনীতির অনুসারী হতেন না। তখন জ্ঞান-বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করতেন এবং অন্তর যা কবুল করে সে পথেই পা বাড়াতেন। যেমন মোতাওয়াতার হাদীসের জন্যে তার বাহ্যিক শর্ত পূরণই যথেষ্ট নয়। বরং তার মানদণ্ড হচ্ছে অন্তরে স্বস্তি সৃষ্টি হওয়া। আমি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারটি বলে এসেছি। এ নীতিটি মূলত পূর্বসূরিদের পদ্ধতি ও তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসারে উদ্ভাবন করা হয়েছে। মায়মুন ইবনে সাহরান (রহঃ) বলেন ঃ

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পদ্ধতি এটাই ছিল যে, যখনই তাঁর সামনে কোনো মকদ্দমা আসত, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর কিতাব দেখুন। যদি তাতে পেয়ে যেতেন তো সেই অনুসারে ফয়সালা করতেন। যদি আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া যেত, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস পেলে সেই মোতাবেক রায় দিতেন। যদি তাও না পেতেন তা হলে বেরিয়ে যেতেন মুসলমানদের কাছে। তারপর তাদের বলতেন, আমার কাছে এরূপ এরূপ এক বিচার এসেছে। তোমরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের কোনো মকদ্দমার রায় দিতে দেখেছ? অনেক সময় তার কাছে বহু লোক সমবেত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের মকদ্দমায় যে ফয়সালা দিতেন তা বর্ণনা করতেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন– "সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদের মাঝে সে সব লোক দৃষ্টি করেছেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদসমূহ স্মরণ রাখে। যদি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস না পেতেন, তা হলে শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের একত্র করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যখন কোনো ব্যাপারে তারা মতৈক্যে পৌছতেন, তখন তদনুসারে রায় দিতেন।

কাজি শুরাইহ (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) তাকে লিখেছেন– যদি তোমার কাছে কোনো মকদ্দমা আসে, তাহলে আল্লাহর কিতাবে সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশ থাকলে সেই মোতাবেক রায় দেবে। এমন না হয় যেন কেউ তোমাকে আল্লাহর কিতাব থেকে ফিরিয়ে রাখে। তারপর যদি এমন মকদ্দমা আসে যে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে কোনো নির্দেশ না পাও, সেক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ দেখ এবং তদনুসারে রায় দাও। অতঃপর যদি এমন মকদ্দমা আসে যার মীমাংসা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ খুঁজে না পাও, তা হলে উম্মাহর যে ব্যাপারে এজমা রয়েছে তার ভিত্তিতে রায় দাও। তবে যদি এমন মকদ্দমা আসে যা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ ও এজমায়ে উম্মতে না পাওয়া যায়, তখন দুটো পথের একটি অনুসরণ কর। হয় নিজের এজতেহাদ মোতাবেক রায় দাও এবং রায় দিতে বসেও এজতেহাদ কর। অন্যথায় এজতেহাদে বিলম্ব কর এবং রায়দানে অপেক্ষা কর। আমি বিলম্ব করাটাকেই উত্তম মনে করি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এমন সময় গেছে যখন আমরা ফতোয়া দিতাম না। এমনকি আমরা তার যোগ্যও ছিলাম না। আল্লাহ

তাআলার এটা ফয়সালা যে, আমাদের তিনি ফতোয়া দেবার পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন। তোমরাও তা দেখছ। তাই বলছি, আজ থেকে যার সামনে যে মাকদ্দমা আসুক, তার উচিত হবে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা দেয়া। যদি তার কাছে এমন বিচার আসে যার ফয়সালা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার তখন উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালা মোতাবেক রায় দেয়া। যদি তার কাছে এমন মকদ্দমা আসে যার ফয়সালা কুরআনে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালায় না পাওয়া যায়, তা হলে নেককার লোকদের ফয়সালা মোতাবেক রায় দেবে। সেক্ষেত্রে যেন সে এ কথা না বলে যে, এ ব্যাপারে রায় দিতে আমার ভয় হয়, তবে আমি যতটুকু বুঝি তা এই। কারণ আল্লাহ পাক হারামকে যেমন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তেমনি হালালকেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ দুয়ের মাঝে অস্পষ্ট কোনো বস্তু যদি এসে যায়, তা হলে সন্দেহজনক ব্যাপার বাদ দিয়ে নিঃসন্দেহ ব্যাপারটি গ্রহণ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে যখন কোনো ব্যাপার জিজ্ঞেস করা হতো, তা হলে তা কুরআন মোতাবেক বলে দিতেন। যদি তার জবাব কুরআনে না পেতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে পেয়ে যেতেন, তা হলেও বলে দিতেন। যদি তাতেও না পেতেন তাহলে সে ব্যাপারে আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ বলে দিতেন। যদি তাতেও কিছু না পেতেন, তখন নিজে ইজতেহাদ করে রায় দিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ "তোমাদের কি ভয় নেই, তোমাদের ওপর আজাব নাযিল হবে বা তোমাদের ধ্বসিয়ে দেয়া হবে? নইলে তোমরা কি করে বলে বেড়াও যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ কথা বলেছেন এবং কাতাদা থেকে অমুক এরূপ বর্ণনা করেছেন।"

ইবনে সিরীন (রহঃ) এক ব্যক্তির কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস শুনালে সে বলল, অমুক ব্যক্তি তো একথা বলেছেন। ইবনে সিরীন (রহঃ) বললেন, আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শোনাচ্ছি, আর তুমি বলছ, অমুক এ কথা বলেছেন।

ইমাম আওযাঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এক পত্রে লিখেছেন, কিতাবুল্লাহর মোকাবেলায় কারো কোনো মতের মূল্য নেই। ইমামদের মতের মূল্য সেখানেই হতে পারে যেখানে

কিতাবুল্লাহর কোনো নির্দেশ নেই। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীও সেখানে অবর্তমান। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্ধারিত বিধানের মোকাবেলায়ও কারও মতের গুরুত্ব নেই।

হযরত আমাশ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ ইবরাহীম (রহঃ) বলতেন, মুক্তাদি ইমামের বাম পাশে দাঁড়াবে। আমি তাকে বললাম, সামী যিয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করিয়েছেন। ইবরাহীম (রহঃ) সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল করে নিলেন।

শাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ তার কাছে এক ব্যক্তি একটি ব্যাপার জানতে চাইলে তিনি তাকে বলেন, এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ কথা বলেছেন। তখন সে বলল, আপনি আমাকে আপনার অভিমত বলুন। তিনি তখন বললেন, আমি তার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যাই যাকে আমি বলি, ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ কথা বলেছেন। আর সে বলে যে, আমি আপনার অভিমত জানতে চাই। আমি তো আমার মতের চেয়ে দ্বীনকে বেশি ভালোবাসি। খোদার কসম! সে লোককে আমার মত শোনাবার বদলে গান গাওয়াটা আমি বেশি পসন্দ করব।

এ সব আছার ইমাম দারামী বর্ণনা করেছেন।

আবু সায়েব থেকে ইমাম তিরমিজী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত ওয়াকী (রহঃ)-এর কাছে ছিলাম। এক ব্যক্তি নিজের মতকে বেশ গুরুত্ব দিত। ওয়াকী একদা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসআর করেছেন (পশুর কাঁধে জখম করে কোরবানি করেছেন।) অথচ ইমাম আবু হানীফা বলছেন, সেটা তো মোছলা করা (নাক কান কাটা)। তা শুনে সেই লোকটি বলল, ইবরাহীম নাখঈ থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনিও বলেছেন, আশআর করা তো মোছলা করা। আবু সায়েব বলেন, আমি দেখতে পেলাম, ওয়াকী (রহঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান শোনাচ্ছি আর তুমি বলছ, ইবরাহীম এ কথা বলেছেন? তোমাকে কয়েদ করা উচিত এবং যতক্ষণ তুমি এ কথা থেকে তওবা না করবে, ততক্ষণ মুক্তি না দেয়া চাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আতা, মুজাহিদ, মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা বলতেন– যে কোনো ব্যক্তির

কথা গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, ওলামা সম্প্রদায় যখন এসব নীতিমালার ভিত্তিতে ফেকাহ্ শাস্ত্র রচনা করেন, তখন তাদের সামনে এমন কোনো মাসআলা বাকি ছিল না যা নিয়ে তারা কথা বলেননি। তখন তাদের সামনে যে ঘটনাই আসুক না কেন, সে ব্যাপারে তারা মারফূ মুত্তাসিল হাদীস বা মুরসাল কি মাওকুফ হাদীস কিংবা সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস পেয়ে গেছেন। অথবা পয়লা দু'খলীফার অভিমত কিংবা অন্যান্য খলীফা ও কাজিদের মত এবং বিভিন্ন শহরের আছার তারা হাতে পেয়ে গেছেন। তাই তা থেকে সাধারণভাবে অথবা ইশারা-ইঙ্গিত নিয়ে তারা মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। আল্লাহ্ পাক এভাবে তাদের সুন্নাহ্ অনুসরণের তাওফীক দান করেছেন।

আরেক কথা, সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ও ব্যাপকতর বর্ণনার মালিক, হাদীসের স্তরবিন্যাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিশারদ ও ফেকাহ শাস্ত্রের সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষক ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। তার পরের মর্যাদা হলো ইসহাক ইবনে রাহভিয়ার। ফেকাহ শাস্ত্রের এরূপ স্তরবিন্যাস বহু হাদীস ও আছারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোনো লোকের ফতোয়া দেবার জন্যে এক লাখ হাদীস জানা কি যথেষ্ট? তিনি জবাব দিলেন, না। এমনকি সে লোক যখন বলল যে, পাঁচ লাখ জানা কি যথেষ্ট? তখন তিনি বললেন, আশা করি সেটা যথেষ্ট হতে পারে। এটা ছিল জানার শেষ সীমা নির্ধারণের জবাব। ইমাম আহমদের এ জবাবের তাৎপর্য হলো এই যে, ফতোয়া দেবার জন্যে অনেক বেশি হাদীস জানা চাই।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা দ্বিতীয় যুগের পত্তন ঘটালেন। তারা দেখতে পেলেন, তাদের সহযাত্রীরা হাদীস সংগ্রহ ও ফেকাহ্ শাস্ত্রকে তার মূল কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে যথেষ্ট ত্যাগ ও পরিশ্রম করে গেছেন। তাই তারা অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। যেমন, শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদদের এজমা সম্মত বিশুদ্ধ হাদীস বাছাই করা। এ দলে ছিলেন য়ায়েদ ইবনে হারুন, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ। তেমনি একদল ফেকাহ সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো একত্রিত করেন। বিভিন্ন শহর ও রাজ্যের ফকীহ্ ইমামরা নিজ নিজ মাজহাব সে সব হাদীসের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। এগুলো ছিল তারই পূর্ণাঙ্গ সংকলন। যেমন প্রত্যেকটি হাদীসকে তার যথাযথ স্তরে স্থান দিয়েছেন। যেমন,

শাজ ও নাদের হাদীসগুলো সংকলিত করেছেন। পূর্বসূরিরা সেগুলো বর্ণনা করেননি। অথবা সেগুলোর এমন সব সূত্র বর্ণনা করেছেন যা পূর্বসূরিরা করেন নি। তাদের মাধ্যমে এমন সব হাদীসও প্রকাশ পেয়েছে যা মুত্তাসিল নয় বা তার সূত্রও উচুঁস্তরের নয়। তা ছিল হয় ফকীহ থেকে ফকীহর, নয়তো হাফেজ থেকে হাফেজের বর্ণনা।

এ ধরনের কয়েকটি জ্ঞানগত উদ্দেশ্যই তাদের হাতে সম্পন্ন হয়েছে। এ স্তরের মুহাদ্দেসগণের ভেতর শীর্ষস্থানীয় হলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ), মুসলিম (রহঃ), আবু দাউদ (রহঃ), আব্দ ইবনে হুমায়েদ আদ দাবালী (রহঃ), ইবনে মাজাহ (রহঃ), আবু ইয়াকী (রহঃ), তিরমিজী (রহঃ), নাসায়ী (রহঃ), দারে কুতনী (রহঃ), হাকেম (রহঃ), বায়হাকী (রহঃ), আল খতীব (রহঃ), আদ্‌দায়লামী (রহঃ), ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) প্রমুখ।

আমার দৃষ্টিতে তাদের ভেতর সব চাইতে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, সর্বাধিক কল্যাণকর ও বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা হলেন চারজন। তাদের যুগও খুবই কাছাকাছি ছিল। তাদের ভেতর পয়লা উল্লেখ্য হলেন আবু আবদুল্লাহ বুখারী (রহঃ)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সহীহ, মুস্তাফীজ, মুত্তাসিল হাদীসগুলোকে অন্যান্য হাদীস থেকে পৃথক করে ফেলা। তার ভিত্তিতে যেন নির্ভরযোগ্য ফিকাহ্, জীবন চরিত ও তাফসীর রচনা করা যায়।

তাই তিনি 'জামেউস সহীহ' প্রণয়ন করলেন এবং তার জন্যে তিনি যে সব শর্ত দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করেছেন। আমি জানতে পেয়েছি যে, জনৈক নেককার ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেন। তখন তিনি বলেছেন, "তোমার হলো কি? তুমি মুহাম্মদ ইবনে ইদরীসের ফেকাহ নিয়ে মত্ত রয়েছ এবং আমার কিতাব ছেড়ে দিয়েছ? সে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কিতাব কোনটি? তিনি জবাবে বললেন, সহীহ্ বুখারী।

আমি আমার জীবনের কসম খেয়ে বলছি, সহীহ বুখারীর সেই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়েছে যার বেশি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কথা ভাবাই যায় না।

দ্বিতীয় স্থান হলো ইমাম মুসলিম নিশাপুরীর। তিনিও নিয়ত করেছিলেন সে সব বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের যার ওপর মোহাদ্দেসগণের এজমা হয়েছে। সেগুলোও মারফু মুত্তাসিল হাদীস এবং তা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত উদ্ভাবন করা যায়। সেগুলো এমনভাবে গুছিয়ে দেয়া যেন মনে রাখা ও মাসআলা বের করা সহজ হয়। বস্তুত তিনি হাদীসগুলোকে

উত্তমভাবে সাজিয়েছেন। প্রত্যেক হাদীসের সব সূত্র তিনি এক জায়গায় জমা করেছেন। ফলে ভাষ্যের মতভেদ ও সনদের পার্থক্য খোলাখুলিভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বিভিন্ন হাদীস একই স্থানে সমবেত করেছেন যেন আরবি ভাষাভাষী বা আরবি জানা লোকের হাদীস ছেড়ে অন্য কিছু খোঁজাখুঁজি করে ফিরতে না হয়।

তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আবু দাউদ সাজিস্থানী (রহঃ)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সে সব হাদীস সংকলিত করা ফকীহরা যা দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। ফকীহদের ভেতর এ সব হাদীস চর্চা হতো এবং বিভিন্ন শহর ও রাজ্যে প্রচলিত বিধিবিধানের ভিত্তি ছিল এ সব হাদীস। তিনি তাঁর সুনান প্রণয়ন করেন এবং তাতে সহীহ, হাসান, অনুসরণযোগ্য সকল হাদীস ঠাঁই দেন। আবু দাউদ বলেন, আমার সংকলনে এমন কোনো হাদীস ঠাঁই দেইনি যা বর্জনের ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। তিনি তার সংকলনে জঈফ হাদীস যা রয়েছে তার দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং যার ভেতর কোনো ত্রুটি ছিল তা তিনি এমনভাবে নির্দেশ করেছেন যা হাদীস নিয়ে গবেষণাকারীরা সহজেই বুঝতে পান। যে সব হাদীস থেকে মাসআলা বের করা হয়েছে এবং কোন মাজহাব অনুসারী তা অনুসরণ করছেন তার প্রতিটি হাদীসেই তিনি শিরোনাম জুড়ে দিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্যদের বিশ্লেষণ হলো এই যে, যে কোনো মুজতাহিদের জন্যে আবু দাউদই যথেষ্ট।

চতুর্থ স্থানে রয়েছেন আবু ঈসা তিরমিজী (রহঃ)। তিনি শায়খাইনের (বুখারী ও মুসলিম) পদ্ধতিকে আরও সুস্পষ্ট করেছেন এবং তাঁরা যেখানে অস্পষ্টতা রেখে গেছেন তিনি তা পছন্দনীয় পন্থায় বিশ্লেষণ করেছেন। আবু দাউদের পন্থাও তিনি গ্রহণ করেছেন এবং মাজহাবের ইমামদের মাসলাক বর্ণনা করেছেন। সেমতে তিনি এক পূর্ণাঙ্গ কিতাব প্রণয়ন করেন এবং হাদীসের সূত্রগুলোকে তিনি সংক্ষিপ্ত রূপদান করেন। তিনি একটি সূত্র উল্লেখ করে অন্য সূত্রগুলোর ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। এমনকি কোন হাদীসটি সহীহ, কোনটি হাসান, কোনটি জঈফ ও কোনটি মুনকার এবং জঈফ হাদীসের দুর্বলতার কারণ তিনি এভাবে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হাদীস শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এমনকি নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের তারতম্যও যেন তারা বুঝতে পায়। কোন হাদীস মুস্তাফীজ ও কোন হাদীস গরীব তাও তিনি বলে দিয়েছেন। তিনি সাহাবা ও ফকীহদের কার কি মাজহাব সেটাও নির্দেশ করেছেন। যে ব্যক্তির নাম বলা দরকার তিনি তার নাম বলেছেন এবং যার লকব

বলাই যথেষ্ট তার লকব বলে দিয়েছেন। আলেমদের জন্যে কোনো কিছুই তিনি অস্পষ্ট বা গোপন রেখে যাননি। এ কারণেই বলা হয়, এ কিতাব যেমন মুজতাহিদের জন্যে যথেষ্ট, তেমনি মুকাল্লেফদের জন্যেও যথেষ্ট।

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর যুগ থেকেই পরবর্তীকালে এমন লোকও ছিলেন যারা মাসআলা বলার ব্যাপারে কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না এবং ফতোয়া দিতেও ভয় পেতেন না। তারা বলতেন, দ্বীনের ভিত্তিই হলো ফিকাহ। তাই এর প্রচার-প্রকাশ প্রয়োজন। অথচ তারা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করা ও তাঁর পর্যন্ত সনদ পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে ভয় পেতেন। এমনকি শাবী (রহঃ) বলেন ঃ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অপর কারো দিকে সনদের সম্পর্ক নির্ণয় আমি বেশি পছন্দ করি। কারণ, ভাষ্যে যদি বেশ-কম কিছু থাকে তো তার দায়-দায়িত্ব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যাবে না, যাবে তার ওপর।"

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, "আমি তো এটাই বলা উত্তম মনে করি যে, আবদুল্লাহ বলেন এবং আলকামা বলেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন তো ভয়ে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তিনি বলতেন, হয়ত তিনি একথা বলেছেন, নয়তো এরূপ বলেছেন অথবা এরূপ বলেছেন।

হযরত উমর (রাঃ) একদল আনসারকে কূফায় পাঠানোর প্রাক্কালে বলেন, তোমরা কূফায় যাচ্ছ। তোমাদের নিকট এমন লোকও আসবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে কাঁদতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, আসহাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, আসহাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। তারা তোমাদের কাছে হাদীস শোনার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে। তাই সাবধান! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খুব কমই বর্ণনা করবে।

ইবনে আওন (রহঃ) বলেন ঃ "শাবী (রহঃ)-এর কাছে কেউ যদি কোনো মাসআলা জানতে আসত তো অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পক্ষান্তরে ইবরাহীম (রহঃ) সহজেই তা বলে দিতেন এবং ব্যাপকভাবেই এ কাজ করতেন।" এসব বর্ণনাই ইমাম দারামীর (রহঃ)।

অতঃপর হাদীস, ফেকাহ ও মাসআলা-মাসায়েল ভিন্নভাবে প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিল। তার কারণ ছিল এই যে, তাদের কাছে এত বেশি হাদীস ও আছার মওজুদ ছিল না যার সাহায্যে তারা মুহাদ্দিসদের অনুসৃত নীতির ওপর ফেকাহর মাসআলা উদ্ভাবন করতে পারেন। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন শহরের আলেমদের অভিমত জমা করে তা নিয়ে বাহাস-মোবাহেসা চালাতেও তাদের মন সায় দিচ্ছিল না। তারা নিজেদের ওপরও আস্থা আনতে পারছিলেন না। ফলে তারা ফকীহ ইমামদের ওপর আস্থাবান হলেন। তাদের ধারণা, ফকীহরা বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার উচ্চতম স্তরে রয়েছেন। তাদের অন্তরের আকর্ষণও নিজ সহচরদের প্রতি ছিল সর্বাধিক। হযরত আলকামা (রহঃ) বলেন ঃ

কোনো সাহাবীই ফেকহী জ্ঞানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) থেকে মজবুত নন।"

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম হযরত সালেম থেকে বড় ফকীহ। যদি সাহাবী হবার বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত না হতেন, তা হলে আমি বলতাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আলকামা বড় ফকীহ।

এ ধরনের আলেমদের মেধা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি এতই প্রখর যে, তারা নিজ সহগামীদের অভিমত পেলে খুব দ্রুত মাসআলার জবাব বের করে নেন। তাদের বক্তব্য হলো– "যাকে যে কাজের জন্যে পয়দা করা হয়েছে তাকে তার তাওফীক দেয়া হয়েছে।"

মূলত সব দলই নিজেদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট। এর ফলে তারা তাদের নির্ধারিত মাসআলা উদ্ভাবন পদ্ধতির ভিত্তিতে নতুন করে ফেকাহর কিতাব প্রণয়ন করেন। তার সুরাতটি এই ছিল যে, প্রত্যেকে তার কিতাবটি সংরক্ষণ করত যার দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সঠিক বিবেচিত হতো এবং যিনি তার সহযাত্রীদের ভাষ্য ও আলেমদের অভিমত সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল ছিলেন। তার নীতি ছিল এই যে, তিনি প্রতিটি মাসআলা নিয়ে নিজে চিন্তা-ভাবনা করতেন। সে মতে যখন তার কাছে কিছু জানতে চাওয়া হতো কিংবা কোনো মাসআলার ব্যাপারে তার প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তিনি তাঁর সহযাত্রীদের বিশ্লেষণগুলো দেখতেন। যদি তাতে জবাব পেয়ে যেতেন তো ভালো কথা, নইলে তাদের অভিমতের ব্যাপ্তি নিয়ে ভাবতেন। তারপর এ পথেই তা বের করতে প্রয়াসী হতেন, অথবা তাদের ভাষ্য থেকে কোনো ইঙ্গিত নিয়ে মাসআলার জবাব বের করতেন। অনেক সময়ে কোনো কোনো অন্যের ইশারা অথবা চাহিদা

থেকেও উদ্দেশ্য বুঝা যেত। কখনো বা সেই বিশেষ মাসআলার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতেই হুকুম দেয়া হতো। অনেক সময় কোনো একটি সুস্পষ্ট বিধানের কার্যকারণ নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে নতুন বিধানটি প্রমাণিত করা হতো।

কখনো কখনো কোনো আলেমের কোনো ব্যাপারে দুটো ভাষ্য দেখা যায়। তা যদি নৈকট্য ভিত্তিক বা শর্তমূলক কেয়াসের মাধ্যমে এক করে নেয়া যায় তা হলেও মাসআলার জবাব মিলে যায়। কখনো তাদের কোনো বক্তব্যের উপমা ও শ্রেণীবিন্যাসের মাঝ থেকে কোনো কোনো ব্যাপার জানা যেত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কোনো সংজ্ঞার মাধ্যমে তা বুঝানো যেত না। এ অবস্থায় তারা ভাষাভাষীদের শরণাপন্ন হতেন এবং তার শ্রেণী নির্ধারণ করতেন। তারপর তার জন্যে পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা স্থির করতেন। তার ভেতরকার অস্পষ্ট ব্যাপার আয়ত্ত করতেন এবং তার দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রয়াস পেতেন।

কখনো তাদের কোনো ভাষ্যের দুটো দিক থাকত। তখন তা থেকে একটিকে প্রাধান্য দেবার জন্যে এরা গবেষণা করতেন। কখনো পূর্ববর্তীদের দলীল বর্ণনার ভেতরে কিছু রহস্য থেকে যেত। এরা সে রহস্য উদঘাটন করতেন। কখনো বা এ মাসআলা বের করার লোকেরা তাদের ইমামদের কোনো কাজ কিংবা কোনো ব্যাপারে তাদের চুপ থাকা থেকে দলীল দাঁড় করাতেন। তার নাম দিতেন তারা তাখরীজ এবং বলতেন, আমরা অমুকের বক্তব্য থেকে তাখরীজ করেছি। অথবা তারা বলতেন– অমুকের মাজহাব মতে কিংবা অমুকের মূলনীতি ও পদ্ধতি মোতাবেক এ মাসআলার জবাব হলো এই। এ তাখরীজ বা মাসআলা বের করার লোকদের বলা হয় মাজহাবের মুজতাহেদ। যে ব্যক্তি বলেন যে, যে ব্যক্তি "আল-মাবসূত' স্মৃতিস্থ করেছে সে মুজতাহেদ, তার ইজহেতাদের তাৎপর্য হচ্ছে উক্ত তাখরীজ। মানে, তার রেওয়ায়েত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাক, না জানুক সে কোনো একটি হাদীসও, তবু সে মুজতাহিদ। এভাবেই প্রত্যেক মাজহাবে তাখরীজ হয়েছে। এমনকি তার পরিমাণ বিপুল হয়ে গেছে। অতঃপর যে মাজহাবের আসহাব বিখ্যাত হয়ে গেছেন, তাঁরা বিচার ও ফতোয়া বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে গেছেন। লোকদের ভেতর তাঁদের প্রণীত গ্রন্থাবলি ছড়িয়ে পড়েছে। তারা পাঠদান ও খোলাখুলি শিক্ষাদান শুরু করলেন। ফলে সেই মাজহাব দিকে দিকে বিস্তার লাভ করল। প্রতিদিন তাদের খ্যাতি বেড়েই চলল। পক্ষান্তরে, যে মাজহাবের অনুসারী অখ্যাত থাকলেন, তারা কাজি ও মুফতির মসনদ অলংকৃত করতে পারলেন না। লোকজনও তাদের ব্যাপারে কোনো আকর্ষণ বোধ করল না। ফলে কিছুদিন পর সে সব মাজহাব বিলুপ্ত হলো।

অধ্যায়-৮৪

হিজরী চতুর্থ শতকের আগে ও পরের লোকের অবস্থা

জেনে নিন, হিজরী চতুর্থ শতকের আগের লোকেরা কোনো বিশেষ এক মাজহাবের অনুসারী হতে একমত ছিলেন না। শায়েখ আবু তালেব মক্কী তাঁর 'কিতাবুল কুলুবে' বলেন, বিভিন্ন কিতাব ও সংকলন পরবর্তী কালের সৃষ্টি। লোকদের ভাষ্যের ভিত্তিতে হুকুম জারি করা, লোককে কোনো এক মাজহাবের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া, কোনো এক ভাষ্যের অনুসারী হওয়া এবং সব ব্যাপারেই সেটা উদ্বৃত করা এবং এক এক মাজহাব নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা, আগেকার লোকদের ভেতর অর্থাৎ পয়লা শতক, দ্বিতীয় শতক ও তৃতীয় শতকে ছিল না।

আমি বলছি, পয়লা ও দ্বিতীয় শতকের পর কিছু কিছু তাখরীজ বা মাসআলা উদ্ভাবন শুরু হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ শতক পর্যন্ত লোকেরা কোনো বিশেষ মাজহাব অনুসরণ, তা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো এবং তার ভাষ্য উদ্ধৃত করে বেড়ানোর ব্যাপারে একমত হয়নি। মূলত অনুসন্ধানে এটাই জানা যায়।

তাদের ভেতর আলেম ও সাধারণ মুসলমান ছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা সামাজিক জীবনের মাসায়েলের প্রশ্নে যে ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোনো মতভেদ ছিল না অথবা অধিকাংশ মুজতাহেদ যে ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করতেন না, সে সব সর্বসম্মত মাসআলার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শরীআত প্রণেতা ছাড়া কারো অনুসরণ করতেন না। তারা নিজেদের বাপ-মা বা শহরের মুআল্লিমদের কাছে ওযু, গোসল, নামায, যাকাত ইত্যাদির নিয়ম-কানুন শিখতেন এবং তদানুসারে আমল করতেন। যখন কোনো নতুন ঘটনা সামনে আসত, তখন নির্দিষ্ট কোনো মাজহাবের ভাবনা ছাড়াই কাছাকাছি যে মুফতি পেতেন তার কাছ থেকেই জেনে নিতেন।

পক্ষান্তরে, আলেমদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা হাদীসের অনুসারী ছিলেন এবং নিজেরাও মোহাদ্দেস ছিলেন। হাদীস নিয়েই তারা নিমগ্ন ছিলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আছার তাদের কাছে এত বেশি মওজুদ ছিল যে, কোনো মাসআলার জবাবের জন্যে তাদের অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী হতে হতো না। তাদের কাছে মশহুর বা সহীহ হাদীস ছিল। তার ওপর কোনো কোনো ফকীহর আমলও ছিল। তাই তা বর্জনের

কোনো কারণ ছিল না। তাছাড়া তাদের অধিকাংশ সাহাবীর ও তাবেঈনের আছার বা বিখ্যাত ভাষ্য ছিল যার বাইরে যাওয়া ঠিক ছিল না। যদি পরস্পর বিরোধের কারণে রেওয়ায়াত অনুসরণে অসুবিধা দেখা দিত ও তার কোনোটিকে প্রাধান্য দেবার কোনো ব্যাখ্যা না পেত, ফলে মানসিক অস্বস্তি দেখা দিত, তখন তারা পূর্বসূরিদের কারো কোনো ভাষ্য পেলে তা অনুসরণ করতেন। যদি সেক্ষেত্রেও দুটো ভাষ্য পেতেন, তাহলে যেটা মজবুত মনে হতো সেটাই গ্রহণ করতেন, হোক তা মদীনাবাসীর কিংবা কুফাবাসীর।

পক্ষান্তরে তাদের ভেতর যারা তাখরীজ পন্থী হতেন, তারা যে হাদীসের বিধান সুস্পষ্ট ছিল না, কেবলমাত্র সেগুলো থেকেই ইজতেহাদ করে মাসআলা বের করতেন। ফলে তারা যে কোনো এক মাজহাবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেতেন। তখন বলা হতো, অমুক হানাফী কিংবা অমুক শাফেঈ মাজহাবের লোক। কখনো কোনো মোহাদ্দেসও মতৈক্যগত কারণে কোনো মাজহাবের সাথে চিহ্নিত হয়ে যেতেন। কারণ, বহু মাসায়েলে তিনি সেই মাজহাবের সাথে মতৈক্য রাখেন। যেমন ইমাম নাসায়ী (রহঃ) ও ইমাম বায়হাকী (রহঃ)-কে শাফেঈ মাজহাবের লোক বলা হয়। তবে কাযা ও ইফতা বিভাগের দায়িত্ব শুধু মোজতাহেদকেই দেয়া হতো। আর ফকীহও বলা হয় শুধু মোজতাহেদকে।

এ চার যুগের পর দুনিয়ায় এমন লোক এল যারা এদিক-ওদিক মনোনিবেশ করলেন। ফলে কতিপয় নতুন ব্যাপার দেখা দিল। তার ভেতর একটা তো হলো ফেকাহ শাস্ত্রের মতভেদ ও ঝগড়া। গাজ্জালী (রহঃ)-এর বর্ণনামতে তার বিশ্লেষণ হচ্ছে এই ঃ

যখন খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হলো, তখন তাদের হাতে খেলাফত চলে গেল যারা খেলাফতের অন্যায় দাবি করত। অথচ তাদের ফতোয়া ও শরয়ী আহকামের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। ফলে তারা ফকীহদের সাহায্য লাভ ও সর্বাবস্থায় তাদের সাথে রাখার জন্যে বাধ্য ছিল। কিন্তু কিছু প্রবীণ আলেম তাদের পুরনো ভাবের ওপর বজায় থাকলেন এবং স্বচ্ছ দ্বীনের অনুসারী থেকে গেলেন। খলীফা যখন তাদের ডাকতেন তখন তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতেন এবং সে ডাকে সাড়া না দিয়ে ফিরে থাকতেন। ফলে সে যুগের লোকেরা আলেমদের ইজ্জত ও শাসকদের তাদের প্রীতি সুদৃষ্টি দেখতে পেল এবং এও দেখতে পেল যে, আলেমরা তাদের এড়িয়ে চলেন। এ ইজ্জত ও ঠাঁট অর্জনের জন্যে তারা তালেবে ইলেম হবার জন্যে খুবই উৎসাহিত হলো।

এর আগে ফকীহরাই ছিল আকাঙ্ক্ষিত। একালের ফকীহরা সুলতানদের আকাঙ্ক্ষিত বানালেন। সুলতানদের এড়িয়ে চলাই ছিল তাদের ইজ্জতের সনদ। কিন্তু সুলতানদের পেছনে ধর্ণা ধরে এরা লাঞ্ছনার সনদ হাসিল করলেন। শুধু আল্লাহ্ পাক যাদের রক্ষা করেছেন তারাই বেঁচে গেলেন।

ইতিপূর্বে অনেকেই কালাম শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাতে তারা বহু তর্ক-বিতর্ক করেছেন, বহু প্রশ্ন তুলে তার জবাব লিখেছেন। তাতে তারা বহাস-মোবাহেসার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এ বিদ্যাটি তাদের মন মগজে ততদিন সক্রিয় ছিল যতদিন সুলতান ও উজীররা ফেকহী মাজহাবের হানাফী মাজহাব শ্রেষ্ঠ, না শাফেঈ মাজহাব শ্রেষ্ঠ, এ ঝগড়া ও মোনাজেরার দিকে মনোনিবেশ না করেছেন। যখন এ পরিস্থিতি এল, তখন লোকেরা কালাম শাস্ত্র ছেড়ে দিল এবং জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলো বর্জন করে হানাফী ও শাফেঈ মাজহাবের মধ্যকার মতানৈক্যের ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। মালেক (রহঃ), সুফিয়ান (রহঃ) ও আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহঃ) সাথে তাদের যে মতানৈক্য ছিল, সেদিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তারা ভাবলেন, এ সব ইমামের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীআতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো উদঘাটন করা, মাজহাবের ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা ও ফতোয়ার মূলনীতি নির্ধারণ করা। ফলে তাদের সামনে জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলো মুখ্য হয়ে গেল। তারা সেক্ষেত্রে অনেক কিছু উদ্ভাবন করলেন। তার ভেতর নানা ধরনের বিতর্ক ও বহাছের গ্রন্থ সৃষ্টি হলো। এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। জানিনা আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যতে এ সব জ্ঞানচর্চার কোন ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

তার ভেতর একটি ব্যাপার হলো এই যে, এ কালের লোকেরা তাকলীদের ওপর নিশ্চিন্তে বসে গেছেন। তাদের অন্তরে অজ্ঞাতেই অন্ধ অনুসরণের প্রভাব ছেয়ে গেছে। মূলত ফকীহদের পারস্পরিক মতভেদ ও বহাস-মোবাহাসাই এর কারণ। যখনই তাদের ভেতর ফতোয়ার ক্ষেত্রে ঝগড়া ও বিরোধ সৃষ্টি হলো, তখন একজন ফতোয়া দিলে আরেকজন তার ওপর প্রশ্ন তুলে তা রদ করতেন এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে পূর্বসূরিদের কারো সুস্পষ্ট ভাষ্যের ওপর একমত হয়ে তারা বহাস খতম করতেন।

তাছাড়া কাজিদের জুলুমও তাকলীদের অন্যতম কারণ ছিল। কাজিরা আমানতদার ছিলেন না। এ অবস্থায় তাদের ফয়সালা তখনই মানা হতো যখন

সে ব্যাপারে জনগণের কোনো সন্দেহ না থাকত এবং তার সমর্থনে আগেকার কারো বক্তব্য পাওয়া যেত।

একটা কারণ এও ছিল যে, শাসকরা অজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই লোকেরা তাদের কাছে ফতোয়া জানতে চাইত, তাদের না হাদীস জানা ছিল, না তাখরীজের পদ্ধতি জানা ছিল। যেমন আখেরী যমানার অধিকাংশের বাহ্যিক অবস্থা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ইবনে হুমাম প্রমুখ সতর্ক করে গেছেন এ ব্যাপারে। এখন তো একজন অমুজতাহিদকেও ফকীহ বলা হয়।

এটাও একটা ব্যাপার ছিল যে, প্রত্যেকেই সব বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি ও গবেষণা চালাচ্ছে। কেউ ভাবছেন, তিনি আসমায়ে রেজাল-এর ভিত কায়েম করছেন এবং যাচাই বাছাই করার স্তর জানার জ্ঞান আবিষ্কার করছেন। অতঃপর লোকদের দৃষ্টি নতুন ও পুরাতন ইতিহাসের দিকে নিবদ্ধ হলো। কিছু লোক নাদের ও গরীব হাদীস তালাশ করতে লাগলেন, হোক তা মাওজু স্তরের হাদীস।

কিছু লোক অসূলে ফেকাহর ভেতর বহু কূটতর্ক সৃষ্টি করলেন। প্রত্যেকে তার সহাবাদের জন্যে ঝগড়ার নীতিমালা ও পদ্ধতি তৈরি করে দিলেন এবং প্রতিপক্ষের মোকাবেলার জন্যে প্রশ্নাবলির এক পশলা বৃষ্টি সৃষ্টি করে দিলেন। প্রতিপক্ষ আবার তার জবাব তৈরি করেছেন এবং তার জন্যে যথেষ্ট অনুসন্ধান চালিয়েছেন। প্রত্যেকটি ব্যাপারের তারা সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন ও শ্রেণীবিন্যাস ঘটিয়েছেন। কোথাও পর্যালোচনা দীর্ঘ করেছেন, কোথাও তা সংক্ষেপে সেরেছেন।

কিছু লোক এ পথও ধরেছেন যে, সুদূর ভবিষ্যতের কাল্পনিক মাসআলা বানিয়ে তা নিয়ে বহাস করেছেন। উদ্দেশ্য কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যেন কখনো তার মাজহাবের যৌক্তিকতার ব্যাপারে কথা না বলতে পারে।

কিছু লোক তাখরীজ পন্থীদের ও এমনকি তারও নিম্নমানের লোকদের ভাষ্যের ব্যাপক অর্থ ও ইশারা-ইঙ্গিত নিয়ে অনুসন্ধান ও বহাস চালিয়েছেন যা না কোনো আলেম শোনা পসন্দ করেছেন আর না অজ্ঞ লোকেরা শুনতে চেয়েছে। এ ঝগড়া, মতানৈক্য ও গবেষণার ফেতনা সেই প্রাথমিক যুগের ফেতনার কাছাকাছি পৌছে গেল যখন লোকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। সেই ফেতনার পরিণামে জালেম শাসক চেপে বসল, কলঙ্কজনক ও অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটতে লাগল। তেমনি এ ইলমী ফেতনার পরিণামে দেখা দিল মূর্খতা, ভেজাল, সংশয় ও অবিশ্বাসের আঁধার যুগ। তা থেকে মুক্তিরও কোনো আশা নেই।

এরপর এল শুধুই অন্ধ তাকলীদের যুগ। তারা এখন আর হক ও বাতিল যাচাই করার প্রয়োজন ভাবে না। ঝগড়া ও উদ্ভাবনের তারতম্য জ্ঞানও এখন বাকি নেই। এখন তো অবস্থা এই যে, গলা ফুলিয়ে যে ব্যক্তি ফকীহদের সবল ও দুর্বল ভাষ্যগুলো কোনো যাচাই বাছাই ছাড়াই মুখস্ত করে মুখ চিবিয়ে চিবিয়ে তা বলতে পারে সেই ফকীহ হয়ে যায়। তেমনি যে ব্যক্তি সহীহ ও দুর্বল হাদীসের তারতম্য না করে কাহিনীকারের মতো চিৎকার দিয়ে দিয়ে বলে যেতে পারে সেই মুহাদ্দিস বনে যায়। আমি এ কথা বলছি না যে, সবাই এরূপ হয়ে গেছে। বরং আল্লাহর বান্দাদের ভেতর একদল সর্বদা এরূপ রয়েছেন যাদের কেউ কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এ দলটি আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর প্রমাণ হিসেবে বিরাজ করে। হোক তা যতই ক্ষুদ্র দল।

এরপর যে যুগ এল তাতে উক্ত ফেতনা বেড়েই চলল। তাকলীদ চরম রূপে বেড়ে গেল। মানুষের অন্তর থেকে আমানতদারী উঠে গেল। অবশেষে লোকেরা দ্বীনি ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিল। তারা একথাই বলতে লাগল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের অমুক মাজহাবের ওপর চলতে দেখেছি এবং আমরা তাদেরই অনুসরণ করে চলছি।

তাই ফরিয়াদ কেবল আল্লাহর কাছেই করছি, তাঁরই মদদ চাচ্ছি, তাঁর ওপরই ভরসা করছি এবং তিনিই নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ও তাঁর ওপরই নির্ভর করছি।

সাধারণ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে উচিত হবে কয়েকটি জরুরি মাসআলা সম্পর্কে লোকদের অবহিত করা। কারণ, লোকদের জ্ঞান বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাদের পা ফসকে গেছে। তাদের লেখনী ভুল বর্ণনা করছে ও বাঁকা পথে চলছে।

১। একটি মাসআলা হলো এই যে, ফিকাহর যে চারটি মাজহাব রচিত হয়েছে ও তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, তার ওপর উম্মতদের এজমা হয়ে গেছে। অথবা বলা যায়, ভারসাম্যপূর্ণ সমঝদার লোকদের মতৈক্য ঘটেছে যে, সেগুলোর তাকলীদ করা জায়েয। তার ভেতর যে অনেক কিছু কল্যাণ রয়েছে তা অস্পষ্ট নয়। কারণ এ যুগে তাকলীদ এ জন্যে বৈধ যে, লোকদের সাহস হারিয়ে গেছে, তাদের নফসের খাহেশ অনেক বেড়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিমত নিয়ে গৌরব করে বেড়ায়। ইবনে হাজম যে বলেছেন ঃ

'তাকলীদ করা হারাম' এবং কারো জন্যে জায়েয নয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ব্যতীত অন্য কারো ভাষ্য থেকে দলীল নেয়া। কারণ আল্লাহর তাআলা বলেন :

"তোমাদের প্রতিপালক প্রভু থেকে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো মুরুব্বীদের পায়রবীর পেছনে ছুটো না।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে– না, আমরা তো সেই পথ অনুসরণ করব যে পথে আমাদের বাপ-দাদা চলে গেছেন।"

তেমনি যারা তাকলীদ করে না তাদের প্রশংসা করে আল্লহ পাক বলেন :

"অনন্তর সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদের যারা আমার কথা শোনে ও সেই পুণ্যবাণী যথাযথভাবে অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদেরই পথ দেখিয়েছেন এবং তারাই যথার্থ জ্ঞানী।"

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, "অতঃপর তোমরা যদি কোনো মতবিরোধে পড়ে যাও, তাহলে আল্লাহর দিকে ও তাঁর রাসূলের দিকে মনোনিবেশ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান রাখ।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মতবিরোধের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মনোনিবেশ করার অনুমতি দেননি। তেমনি মতবিরোধের প্রশ্নে অন্য কারো ভাষ্যের দিকে মনোনিবেশ করাকে হারাম বলে নির্ধারণ করেছেন। কারণ, কোনো ব্যক্তির বক্তব্যও কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত ব্যাপার। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহাবা ও তাবেঈদের এ ব্যাপারে এজমা ছিল যে, তাদের কাতারের পূর্ববর্তীদের কোনো ব্যক্তির ভাষ্যের দিকে মনোনিবেশ করা বা ব্যক্তি বিশেষের সব কথা মেনে নেয়া নিষিদ্ধ।

এক্ষণে যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর যে কারো সব কথা মেনে নেয় ও অনুসরণ করে, অথবা অন্য যেকোনো ইমাম বা মান্যবরের সব কথাই মেনে চলে ও অনুসরণ করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন সুন্নাহর কোনো বাণী গ্রহণ করে না যতক্ষণ তা সেই ব্যক্তি বিশেষের ভাষ্যের অনুকূল না হয়; তো স্মরণ রাখুন, সে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা উম্মতের বিরোধীতা করল। অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, উত্তম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের কাউকেই

কেউ যদি সাথী না পেয়ে থাকে তো সে ঈমানদারের রাস্তা ছেড়ে ভিন্ন রাস্তায় চলছে। নাউজুবিল্লাহ! আমরা সেরূপ অবস্থা থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাই। অধিকন্তু উক্ত সব ফকীহই সালফে সালেহীন ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। ফলে সেরূপ ব্যক্তি তো যার তাকলীদ করছে, সেই ইমামেরই বিরোধীতা করছে। তা ছাড়া এমন কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে লোক উক্ত ইমামদের কারো কিংবা অন্য কোনো ইমামের তাকলীদ করাকে উমর (রহঃ), আলী (রহঃ), ইবনে মাসউদ (রহঃ), ইবনে উমর (রহঃ); ইবনে আব্বাস (রহঃ) কিংবা উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-দের কারো তাকলীদ করার চেয়ে উত্তম ভাবতে পারে। যদি তাকলীদ বৈধ হতো তা হলে তাদের যে কোনো সাহাবীর তাকলীদ করা বেশি গুরুত্ব পেত অন্য যে কোনো ইমামের তাকলীদ থেকে।

ইবনে হাজমের উপরোক্ত বক্তব্য তার বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে যার ভেতরে অন্তত কিছুটা ইজতেহাদী শক্তি রয়েছে। হোক তা একটি মাসআলা উদ্ভাবনের শক্তি। আর তার বেলায় প্রযোজ্য হবে যার সুস্পষ্টভাবে এ বিদ্যা অর্জিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে বলেছেন, এ কাজ নিষেধ করেছেন এবং এ কাজের হুকুমটি মানসুখ হয়নি। তার পন্থা এই যে, হয় সে ব্যক্তি হাদীস ও মাসায়েলের ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষের হাদীস ও ভাষ্য খুব ভালোভাবে যাচাই করবে এবং জেনে নিবে কোনটি মানসুখ আর কোনটি নাসেখ, আর শ্রেষ্ঠ আলেমদের কোন মাজহাবে এজমা রয়েছে। তখনই সে তাদের বিরোধীদের দেখতে পাবে যে, তারা শুধু কেয়াস, ইজতেহাদ ও চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রমাণ দেন। তখন সে এটাও বুঝবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বিরোধীতার কারণ সুপ্ত নেফাক অথবা হেমোকাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

তেমনি শায়েখ আযযুদ্দীন ইবনে আবদুল মালিক বলেন ঃ এটা চরম বিস্ময়কর কথা যে, মুকাল্লেদ ফকীহদের কিছু লোক এরূপ যে, তারা নিজ ইমামের মাসআলার উৎস দুর্বল দেখতে পায়, তার কোনো জবাবও তারা খুঁজে পায় না, তথাপি তারা সেই মাসআলায় তাদের ইমামের তাকলীদ করেন। কিতাব, সুন্নাহ ও সহীহ কেয়াস যে মাজহাবের মাসআলার সত্যতা প্রমাণ করে, শুধুমাত্র ইমামের তাকলীদে দৃঢ়তার কারণে সেটাও তারা বর্জন করে। বরং কিতাব ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিধান ছেড়ে তারা তার দূরতম বাতিল ব্যাখ্যা করে বেড়ায়। তিনি আরও বলেন ঃ

"এতকাল লোকেরা সর্বদা কাছে যে আলেম পেত তার কাছেই মাসআলা জেনে নিত। তারা কোন মাজহাবের প্রশ্ন তুলত না, কে কার কাছে মাসআলা জানতে গেল তা নিয়েও মাথা ঘামাত না। যে যখন যার কাছ থেকে সুযোগ পেত, মাসআলা জেনে নিত। অবশেষে যত সব মাজহাব দেখা দিল এবং সেগুলোর অন্ধ অনুসারী সৃষ্টি হলো। এ অন্ধ মুকাল্লিদদের অবস্থা এই ছিল যে, যদিও তাদের মাজহাব দলীল প্রমাণ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, তথাপি তার তাকলীদ করে চলে। মনে হয় যেন তা কোনো প্রেরিত নবীর বাণী। এ পদ্ধতিটি সত্য থেকে ও সততা থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে গেছে। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এটা পসন্দ করতে পারে না।

ইমাম আবু শামাহ বলেন, "ফিকাহ নিয়ে যারা মশগুল থাকেন তাদের নির্দিষ্ট কোনো মাজহাবকে যথেষ্ট মনে করা অনুচিত। পরন্তু প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে সেটাকেই সঠিক ভাববেন, যেটা কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ ও তাৎপর্যের সর্বাধিক অনুকূল। এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করা তার জন্যেই সহজ হবে যখন সে ব্যক্তি পূর্বেকার জ্ঞান গবেষণায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবে। তার জন্যেও এটা জরুরি যে, মাজহাবী সংকীর্ণতা ও শেষ যুগের আলেমদের মতভেদ নিয়ে চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থাকবে। কারণ যে কাজটি সময়ের অপচয় ঘটায় আর স্বচ্ছ মন মানসিকতাকে ঘুলিয়ে ফেলে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) থেকে এ প্রমাণ মেলে যে, তিনি তাকে সহ যেকোনো ইমামকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফেঈর (রহঃ) সহচর ইমাম মুজনী (রহঃ) তার 'মুখতাসার' গ্রন্থে বলেন ঃ আমি আমার এ কিতাবে শাফেঈ (রহঃ)-এর জ্ঞান-গবেষণা ও তার ভাষ্যের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এজন্যে যে, তাকে যে জানতে চায় তাকে আমি তার মন মগজের কাছে পৌছে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিচ্ছি যে, ইমাম শাফেঈ তার ও অন্যান্যের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন যেন তার বদলে দীনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয় এবং নিজকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। অর্থাৎ তিনিও ইমাম শাফেঈর জ্ঞান গবেষণা জানতে বলেছেন, কিন্তু তার তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া ইবনে হাজমের বক্তব্য তার জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে, যে লোক সাধারণ পর্যায়ের এবং কোনো ইমামের তাকলীদ করে আর মনে করে, ইমাম সাহেব কোনো ভুল করতে পারেন না। আরও বলে যে, সর্বাবস্থায় তিনি নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তার

মতের বিরুদ্ধে যত দলীলই আসুক, আমি তার তাকলীদ ছাড়ব না। ইমাম তিরমিজী (রহঃ) আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনেছি, 'তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশদের আল্লাহকে বাদ দিয়েই গ্রহণ করে ফেলেছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা তাদের (আলেমদের) ইবাদত করত না, তবে তারা যেটাকে হালাল বলত সেটাকেই হালাল ভাবত আর যেটাকে হারাম করত সেটাকেই হারাম ভাবত।

তেমনি সেই ব্যক্তির ব্যাপারেও ইবনে হাযমের বক্তব্য ঠিক হতে পারে যে লোক ভিন্ন মাজহাবের কারো কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা জায়েয মনে করে না। যেমন হানাফী হলে কোনো শাফেয়ীর কাছে এবং শাফেঈ হলে কোনো হানাফীর কাছে। তেমনি হানাফী মোক্তাদী শাফেঈ ইমামের পেছনে এবং শাফেঈ মোক্তাদী হানাফী ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয মনে করে না। এ ধরনের লোক প্রথম যুগের লোকদের বিরোধী এবং সাহাবা ও তাবেঈদের বিরোধীতা করছে।

পক্ষান্তরে, ইবনে হাজমের বক্তব্য তার বেলায় প্রযোজ্য নয় যে ব্যক্তি শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমানের ওপরেই চলে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে বস্তুকে হালাল বলেছেন সেটাকেই হালাল ভাবে আর যেটাকে হারাম বলেছেন সেটাকে হারাম ভাবে। অবশ্য যদি সে লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান না জানে, না সে বিভিন্ন হাদীস একত্র করে তা থেকে ফরমান অনুধাবনের পদ্ধতি না জানে, না তা থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষমতা রাখে, তাহলে সে এক সত্যনিষ্ঠ আলেমের আনুগত্য করবে এবং ধারণা রাখবে যে, সে আলেম সত্যভাষী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান মোতাবেক ফতোয়া দেন। তারপর যদি সে দেখে যে, সে আলেম সম্পর্কে তার ধারণা ভুল তাহলে কোনো ঝগড়া না করে সেখান থেকে সরে আসে, তাহলে সে রকম আনুগত্য কে অস্বীকার করতে পারে?

ঘটনা যখন এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকেই মুসলমানদের ভেতর ফতোয়া চাওয়া ও ফতোয়া দেয়ার রীতি চলে আসছে। তাই কেউ সর্বদা একই ব্যক্তি থেকে মাসআলা জেনে নেয় বা কখনো এর থেকে আর কখনো ওর থেকে তা জেনে নেয়, তো এর ভেতরে কোনো পার্থক্য নেই। তাই এর ভেতর খারাপ এমন কি জিনিস থাকতে পারে যদি কেউ অনুসরণ করতে

গিয়ে কোনো ফকীহর ওপর এরূপ ঈমান না রাখে যে, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তার ওপর ফিকাহ নাযিল করেছেন এবং আমাদের ওপর তার আনুগত্য করা ফরজ ও তিনি নিষ্পাপ ব্যক্তি?

আজকাল আমরা যদি কোনো ফকীহর অনুসরণ করি তো এ কারণে করি যে, তিনি কুরআন-সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেম। তাঁর বক্তব্য হয় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্য থেকে নেয়া হয়েছে, নয়তো তার ইশারা-ইঙ্গিত ও মর্ম থেকে উদ্ভাবন করে নেয়া হয়েছে। অথবা তিনি তাঁর লক্ষণাদি থেকে এটা জেনে নিয়েছেন যে, শরীআত প্রণেতা অমুক পরিস্থিতিতে যে হুকুমটি দিয়েছেন তা আসলে অমুক কারণটির ওপর নির্ভরশীল। সে কারণটি তিনি ভালোভাবে জেনে নিয়ে যখন প্রত্যয়ী হয়েছেন, তখন উক্ত নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীসের ওপর কেয়াস করে কুরআন হাদীসের নির্দেশ বহির্ভূত ব্যাপারটির হুকুম বের করেছেন। সেই ফকীহ যেন বলছেন– আমার প্রবল ধারণা এটাই যে, পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বলছেন, যখনই এ কারণটি পাওয়া যাবে, তখন এ হুকুমটিও জারি হবে। এরূপ ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে যার ভিত্তিতে কেয়াস করা হয় সেটাও অন্তর্ভুক্ত হয়। এ কারণেই এটাকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

অবশ্য তারা অস্পষ্ট বা অনুল্লেখিত বিধানের ব্যাপারেই ইজতেহাদ করে থাকেন। যদি তা না হতো তা হলে কোনো মুসলমানই মুজতাহিদের তাকলীদ করত না। এখন যদি এমন হয় যে, রাসূলে মা'সুমের সহীহ সনদের কোনো হাদীস পৌছে যার যার আনুগত্য আমাদের ওপর ফরজ এবং তা হয় মাজহাবী ইমামের মতের পরিপন্থী, এ অবস্থায় যদি আমরা রাসূলের হাদীস ছেড়ে ইমামের ইজতেহাদী মত অনুসরণ করি তা হলে আমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? যখন সব মানুষ রব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হবে সেদিন আমরা কি অজুহাত পেশ করব?

আলোচ্য সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো এই যে, ফকীহদের ভাষ্য থেকে মাসআলা নেয়া ও হাদীসের ভাষ্যে তা অনুসন্ধান করা। এ দুটোর জন্যে দ্বীনের আওতায় মজবুত মূলনীতি রয়েছে। প্রত্যেক যুগেই বিজ্ঞ আলেমরা এ দুটো ব্যাপার অনুসরণ করে আসছেন। একদল আলেম হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্যের ওপর গুরুত্ব বেশি আরোপ করেছেন এবং তাখরীজের দিকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। অপর দল এর বিপরীত করেছেন। মানে, হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্যের ওপর কম

গুরুত্ব দিয়ে তার তাৎপর্য ও ইশারা চাহিদা থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এটা উচিত নয় যে, একদলের সবকিছুই বর্জন করে অপর দলের সব কিছুই গ্রহণ করা। সাধারণত সবাই তাই করছে। বরং সঠিক কাজ হলো এই যে, একটাকে অরেকটার সাথে মিলিয়ে যে মাসআলার অভাব রয়েছে তা পূরণ করা। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন ঃ

"সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তোমার পন্থা এ দুদলের মাঝামাঝি পন্থা, মধ্যবর্তী পন্থা। বস্তুত আহলে হাদীসদের (মোহাদ্দেস) উচিত যে, তারা তাদের অনুসৃত পদ্ধতি ও মাজহাবকে তাবেঈ মুজতাহিদদের রায়ের সামনে পেশ করবেন। পক্ষান্তরে তাখরীজ পন্থীদের উচিত যে, তারা এমন পদ্ধতি মেনে চলে যাতে সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিরোধ থেকে তারা বাঁচতে পারে এবং যে মাসআলায় ক্ষেত্রে কোনো হাদীস বা আছার পাওয়া যায়, সে মাসআলায় যথাসম্ভব নিজের তরফ থেকে তারা কিছু না বলেন।

মুহাদ্দিসদের জন্যে এটা ঠিক নয় যে, আসহাবে হাদীসরা যে অনড় রীতি নীতি চালু করে গেছেন তার ওপরেই মজবুত হয়ে তা নিয়েই গভীরভাবে মগ্ন থাকে। অথচ শরীআত প্রণেতার তার সমর্থনে কোনো ভাষ্যও নেই। তাছাড়া সহীহ হাদীস ও বিশুদ্ধ কিয়াসও তারা বাতিল করে দেয়। তারা মুনকার বা মুরসাল হবার ন্যূনতম সন্দেহ হলেও সে হাদীস বাতিল করে দেয়। যেমন ইবনে হাজম বলেছেন, তিনি 'তাহরীমে মাসালেফ' বা সচ্ছল জীবন যাপন হারাম হওয়ার হাদীসটি বুখারী শরীফের বর্ণনায় সামান্য সন্দেহের কারণে বাতিল করেছেন। অথচ সে হাদীসটি সহীহ মুত্তাসিল। আর এরূপ কিছু করা কেবল পরস্পর বিরোধের ক্ষেত্রেই বিবেচ্য হতে পারে। মুহাদ্দিসরা বলেন, অমুক ব্যক্তি অমুকের হাদীসের অধিকতর হাফেজ। এ কারণেই তার বর্ণিত হাদীস প্রাধান্য পাবে। সেক্ষেত্রে অন্য হাদীসের প্রাধান্য পাবার যত ধরনেরই কারণ থাক না কেন।

রেওয়ায়াত বিল মানাই (নিজের ভাষায় হাদীসের বক্তব্য বর্ণনা) ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীরা সর্বদা খেয়াল রাখতেন যেন হাদীসের মূল অর্থ পুরোপুরি আদায় হয়। সেক্ষেত্রে তারা আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিতদের ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। যেমন 'ওয়া' বা 'ফা' এর সংযোজন-বিয়োজন অথবা বাক্যাংশের পূর্বাপর প্রয়োগ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতেন না। তাই এ সব সূক্ষ্ম বৈয়াকরণিক প্রশ্ন তুলে হাদীসের ভিন্ন অর্থ সৃষ্টি করে দলীল দাঁড় করানো নিছক পাণ্ডিত্য প্রকাশ বৈ নয়। অনেক সময় এরূপ হয় যে, অপর বর্ণনাকারী বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী

বর্ণনাকারীর বিশেষ কোনো বর্ণের বদলে অন্য কোনো বর্ণ প্রয়োগ করেছেন। সত্য তো এটাই যে, বর্ণনাকারী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কথা বর্ণনা করেন প্রকাশ্যত তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই কথা। তবে যদি কোনো অন্য হাদীস যথাযথভাবে এসে যায় তো সেটাই নেয়া হবে।

তেমনি কোনো তাখরীজপন্থীর জন্যে এটা ঠিক নয় যে, তিনি এমন কোনো ভাষ্য থেকে মাসআলা নেবেন না যা তার সহচরদের জন্যে জটিলতা সৃষ্টি করবে এবং তাদের কাছে ভাষ্যটি দুর্বোধ্য হবে। এমনকি ভাষাভাষীরাও সে ভাষ্য বুঝবে না। পরন্তু ভাষাবিদ পণ্ডিতরাও তার অর্থ খুঁজে পাবে না। এ ধরনের তাখরীজের জন্যে হয় কোনো অবলম্বন বা মৌলভিত্তি থাকে নয়তো উপেক্ষাযোগ্য কোনো মাসআলা প্রতিষ্ঠিত থাকে। ফলে ব্যাপারটিতে কার্যকারণ ও অভিমতগত পার্থক্য ও বিরোধ দেখা দেয়। যখন তার সহচরদের কাছে এ মাসআলা জানতে চাওয়া হয়, তখন দেখা যায়, কখনো অসুবিধা দেখে সে অনুরূপ অপর এক মাসআলা নজীর হিসেবে পেশ করেন, নয়তো এমন এক কারণ বর্ণনা করেন যা তাখরীজকারীর দেখানো কারণের বিপরীত হয়ে দেখা দেয়।

অবশ্য তাখরীজ এ জন্যে জায়েয যে, সেটা মূলত মুজতাহিদের তাকলীদেরই একটি ব্যাপার। তবে এ তাখরীজ তখনই পূর্ণতা পায় যখন মুজতাহিদের ভাষ্য বোধগম্য হয়। এটা কখনো ঠিক নয় যে, তাখরীজ করতে গিয়ে জাতির ঐকমত্যের কোনো হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর তা এ নীতির মাধ্যমে যা সে নিজে বা তার কোনো সহচর উদ্ভাবন করেছেন। যেমন তারা হাদীসে মিসরাত ও সাহমে জবিলকুরবা বাতিল করেছেন। অথচ উদ্ভাবিত নীতিমালার মোকাবেলায় হাদীসের গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এ ব্যাপারটির ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, আমি যখন কোনো কথা বলব বা কোনো নীতি নির্ধারণ করব তা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বিরোধী হয়েছে বলে জানতে পাও তা হলে হাদীসই গ্রহণ করবে। কারণ, সেটাই বিশুদ্ধ বাণী।"

এ জটিল সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো এই যে, শরীআতের বিধান জানার ভিত্তি হচ্ছে কিতাব ও আছার অনুসন্ধান এবং তার আবার কয়েকটি স্তর রয়েছে। অনুসন্ধানের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন তারা যাদের জন্যে বিধিবিধানের জ্ঞান সহজাত হয়ে গেছে অথবা তা কষ্টার্জিত হলেও স্বতঃস্ফূর্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তাদের শরয়ী আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান ও পরিচিতি এ পরিমাণ অর্জিত হয়েছে

যে, সাধারণ মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে ফতোয়া প্রার্থীদের তারা অনায়াসে জবাব দিতে পারে। হয়ত দু-চারটা ব্যাপারে তাদের সময় নিতে হয় মাত্র। এ ধরনের ধারণা সৃষ্টিকেই বলে ইজতেহাদ। এ যোগ্যতা অর্জিত হয় ব্যাপার বর্ণনার সমাবেশ ঘটানো এবং শাজ-নাদের বর্ণনার ও অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। পরন্তু তাদের ভাষ্যের পটভূমি সম্পর্কেও পরিচিতি থাকা দরকার যা শুধু এক বিজ্ঞ ভাষাবিদেরই থাকতে পারে। সাথে সাথে পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোর সমন্বয় ঘটানোর পদ্ধতি এবং দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এ জন্যে পূর্বসূরিদের আছার সম্পর্কেও তাদের অবহিত থাকতে হবে।

এ জ্ঞান কখনো এভাবে অর্জিত হয় যে, কেউ ফেকাহর মাশায়েখদের কোনো এক শায়েখের মাজহাবের ওপর অধ্যয়ন করে তার তাখরীজের পদ্ধতি সম্পর্কে পাকাপোক্ত ধারণা অর্জন করবে। সাথে সাথে সে সুনান ও আছার পর্যাপ্ত পরিমাণে অবহিত হবে। সে জানার পর্যায় এই হবে যে, সে বুঝতে পারে তার বক্তব্য এজমা বিরোধী নয়। এটাই হচ্ছে তাখরীজ পন্থীদের পদ্ধতি।

এ অনুসন্ধানীদের মধ্যবর্তী স্তরের লোকের অবস্থা হলো এই যে, তার কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও পরিচিতি এরূপ অর্জিত হবে যাতে করে সে ফিকাহর সর্বসম্মত মাসায়েলগুলো বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ অবহিত হতে পারে এবং কিছু কিছু ইজতেহাদী মাসআলারও বেশ কিছু জ্ঞান অর্জিত হয়। যদিও এক মুজতাহিদের উপায়-উপকরণ জ্ঞান তার পুরোপুরি আয়ত্তে থাকবে না, তথাপি কোনো কোনো ইজতেহাদী মাসআলার দলীল-প্রমাণ, পরস্পর বিরোধী ভাষ্যের একটি প্রাধান্য দেয়ার পদ্ধতি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই ও ভালো বুঝার ক্ষমতা অর্জন করা চাই। এ ধরনের লোকের জন্যে বৈধ হবে দু' মাজহাবের ভেতরের ভালো-মন্দ যাচাই করে চলা। কারণ সে উভয় দলের দলিল প্রমাণ সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। সে এটাও বুঝতে পায় যে, তার বক্তব্য সেই ব্যাপরগুলোর ক্ষেত্রে নয়, যেখানে মুজতাহিদের ইজতেহাদ চলে না। এমনকি সে সব ব্যাপারে তো কাজিরও কোনো ফয়সালা চলে না। পরন্তু মুফতির ফতোয়াও সেখানে অচল। এ স্তরের লোকের জন্যে এটাও বৈধ যে, কোনো কোনো উদ্ভাবন যা পরম্পরা শুরু হয়েছিল তা বর্জন করবে। অবশ্য যদি তা অশুদ্ধ হবার ব্যাপারে সে অবহিত থাকে। এ কারণেই এ স্তরের আলেমগণ ব্যাপক ইজতেহাদের দাবিদার না হয়েও গ্রন্থ প্রণয়ন করতে থাকেন, বিন্যাসের বাছাই করেন। উদ্ভাবন করতে

থাকেন ও পরস্পর বিরোধী ভাষ্য ও অভিমতের কোনোটিকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। যেহেতু জমহুরের নিকট ইজতেহাদ আংশিক ক্ষেত্রে হয়, উদ্ভাবনও আংশিক ক্ষেত্রে হয়, আর তাতে উদ্দেশ্য হলো প্রবল ধারণাটি অর্জন করা এবং মুকাল্লাফ হবার ভিত্তিই হলো প্রবল ধারণা, সেক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর কোনোটিকেই দূরের ভাবা যেতে পারে না।

তৃতীয় স্তরের লোকের তো মাজহাব হলো এই যে, তাদের সামনে যা কিছু মাসআলা ও সমস্যা আসুক বলতে গেলে প্রায় সবটাতেই তাদের সহচর, বাপ দাদা ও শহরবাসীর অর্জিত মাজহাব। মানে সেই মাজহাব যা তারা অনুসরণ করে চলছে। অবশিষ্ট দু-চারটা ব্যাপার তারা মুফতীদের কাছে ফতোয়া চেয়ে ও ক্বাজিদের কাছে বিচার চেয়ে মীমাংসা করে নেয়। তখন মুফতি ও কাজির মাজহাবই তাদের মাজহাব হয়ে থাকে। আমরা প্রত্যেক মাজহাবের সেকালের ও একালের বিজ্ঞ আলেমদের এ পথে চলতে দেখেছি। মাজহাবের ইমামরাও তাদের সহযোগীদের জন্যে এ অসিয়তই করে গেছেন।

আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহেরে হযরত আবু হানীফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার দলীল প্রমাণ জানল না, তার জন্যে আমার ভাষ্যের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া উচিত নয়। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) যখন ফতোয়া দিতেন, তখন বলতেন– এটা নোমান ইবনে ছাবেত অর্থাৎ আমার রাস্তা এবং আমার সাধ্যমতে যা জানতে ও বুঝতে পেয়েছি তাতে এ মতটি উত্তম ভেবেছি। যদি এর থেকে উত্তম মত পাওয়া যায় তাহলে সেটাই বিশুদ্ধ মত।"

ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার থাকে।

ইমাম হাকেম ও ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন ঃ "যদি কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তা হলে সেটাই আমার মাজহাব।"

এক বর্ণনায় তিনি বলেন– "যখন তোমরা আমার কোনো অভিমত হাদীস বিরোধী দেখতে পাও, তখন হাদীস অনুসরণ কর ও আমার অভিমত দেয়ালে ছুড়ে মার।"

একদিন তিনি ইমাম মুজনী (রহঃ)-কে বলেন ঃ "হে ইবরাহীম! সব ব্যাপারে আমার তাকলীদ কোরো না। নিজেও কিছু চিন্তা ভাবনা করে বের কর। কারণ, এটা দ্বীনের ব্যাপার।"

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলতেন– "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য ছাড়া অন্য কারো বক্তব্য দলীল নয়। হোক তা যত বেশি লোকের বক্তব্য। তেমনি কেয়াস কিংবা অন্য কিছুও প্রমাণ নয়। তেমনি শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যই শুধু স্বীকৃত ও সমর্থনযোগ্য।"

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলতেন ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মোকাবেলায় কারো বক্তব্যই নির্ভরযোগ্য নয়। এক ব্যক্তিকে তিনি বলেন– আমার তাকলীদ করো না। তেমনি মালেক, আওযাঈ ও নাখঈ (রহঃ)-এর তাকলীদও কোরো না। তোমরাও কুরআন-সুন্নাহ থেকে সেভাবে বিধানাবলি নাও যেভাবে তারা নিয়েছেন। যে ব্যক্তি শরয়ী ফতোয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতামত জানে না তার জন্যে ফতোয়া দেয়া অনুচিত। তেমনি ফতোয়া দেয়ার জন্যে বিভিন্ন মাজহাব সম্পর্কে জানা দরকার। যদি কোনো মাসআলা জানতে চাওয়া হয় এবং যার কাছে জানতে চাওয়া হয় সে যদি জানে যে, তার স্বীকৃত মাজহাবের আলেমদের সে ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে তা হলে সে নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারে 'এটা জায়েয' এবং 'এটা জায়েয নয়'। তখন তার বক্তব্য হওয়া উচিত নিছক বর্ণনামূলক। যদি সে মাসআলায় তাদের আলেমরা একমত না হয়ে থাকেন তাহলে এ কথা বলতে দোষ নেই– 'এটা অমুকের মতে জায়েয এবং অমুকের মতে জায়েয নয়।' তবে এই দুটি মতের মাঝে একটিকে নিজে পছন্দ করে সে অনুসারে ফতোয়া দেয়া জায়েয নয়। কারণ তার তো দলীল জানা নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা বলেছেন–"আমরা কোথা থেকে কি বলেছি তা জেনে শুনে আমাদের বক্তব্য মতে কারো ফতোয়া দেয়া উচিত নয়।'

ইমাম ইবনে ইউসুফ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন অনেক ক্ষেত্রে আবু হানীফা (রহঃ) থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন? তিনি জবাব দিলেন– তার কারণ এই যে, আবু হানীফা (রহঃ)-কে যে বুঝ দান করা হয়েছে তা আমাদের দেয়া হয়নি। ফলে তিনি তার বুঝ মোতাবেক যা বলেছেন তা আমরা বুঝি না। ফলে আমাদের তো এ অনুমতি নেই যে, যতক্ষণ আমরা তার বক্তব্য না বুঝি ততক্ষণ তার বক্তব্য মতে ফতোয়া দিতে পারি।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে কোনো এক শহরের এক আলেম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, সেখানে তার চেয়ে যেহেতু কোনো বড় আলেম নেই, তাই তার জন্যে ফতোয়া না দেয়া জায়েয হবে

কি? তিনি জবাব দিলেন, তিনি যদি ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন তা হলে তো জায়েয নয়। প্রশ্ন করা হলো, কি হলে তিনি ইজতেহাদের যোগ্য হবেন? তিনি বললেন, তাকে মাসআলার কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং তার সমসাময়িক আলেমরা যদি তার বিরোধীতা করে তা হলে তাদের সাথে যেন সে দলীল প্রমাণ দিয়ে বহাস করতে পারে। বলা হয়েছে যে, ইজতেহাদের জন্যে ন্যূনতম যোগ্যতা হলো 'মাবসূত' স্মৃতিস্থ করা।"

'আনা বাহরুর রায়েক' কিতাবে আবুল লাইস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু নসর থেকে একটি মাসআলা জানতে চাওয়া হলে যিনি তার সামনে ছিলেন তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আপনার সামনে তো ইবরাহীম ইবনে রুস্তমের কিতাব, আল মাসাফের 'আদাবুল ক্বাজি' কিতাবুল মুজাররাদ ও হিশামের কিতাবুন নাওয়াদের মোট চারখানা কিতাব রয়েছে। আমাদের জন্যে কি তার মধ্য থেকে যে কোনো এক কিতাবের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া জায়েয হবে? এ কিতাবগুলো তো আপনার পসন্দনীয় কিতাব। তিনি জবাব দিলেন– আমাদের সহচরদের থেকে বিশুদ্ধভাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেটাই আমাদের প্রিয়, আকর্ষণীয় ও পসন্দনীয় ইলেম। কিন্তু ফতোয়ার ব্যাপার হলো এই যে, আমি কারো জন্যে এমন কিছুর ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া জায়েষ মনে করি না যা সে বুঝে না। সে যেন লোকদের বোঝা ঘাড়ে না নেয়। তবে যদি এমন কোনো মাসআলা হয় যা আমাদের সহচরদের ভেতর মাশহুর, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট তো আমি আশা করি যে, তার ওপর নির্ভর করা বৈধ হবে।

বাহরুর রায়েকে আছে, কেউ যদি শিঙ্গা লাগায় কিংবা গীবাত করে তা হলে রোযা ভেঙে যায়। সেমতে কেউ যদি খানা খায় ও কোনো মুফতীর কাছে ফতোয়া না চায় এবং তার কাছে কোনো হাদীসও না পৌঁছে থাকে তা হলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ সেটা নিছক অজ্ঞতার ব্যাপার। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রে এ অজুহাত চলে না। তবে যদি সে কোনো ফকীহর কাছে ফতোয়া চেয়ে থাকে এবং তিনি রোযা ভঙ্গের ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তা হলে তার কাফফারা লাগবে না। কারণ; সাধারণ মানুষের জন্যে কোনো আলেমের তাকলীদ করা জরুরি যদি সে তার ফতোয়ার ওপর আস্থা রাখে। সেক্ষেত্রে তার কৃতকর্মের জন্যে মাজুর বিবেচিত হবে, এমনকি মুফতী যদি ফতোয়ায় ভুলও করে থাকে। যদি সে কারো কাছে ফতোয়া নাও চেয়ে থাকে আর তার কাছে এ হাদীস পৌঁছে থাকে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিংগা লাগাবে যে আর

যে গীবাত করবে তার রোযা ভেঙে গেল এবং তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীসও পৌঁছেছে যে, গীবাত করলে রোযা ভঙ্গ হয় এবং সে এসবের মানসুখ হওয়া কিংবা এ সবের ব্যাখ্যাও জানে না, তা হলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের ওপর আমল করা অপরিহার্য।

অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফের মতানৈক্য রয়েছে। তাঁর মতে নাসেখ ও মানসুখের জ্ঞান না থাকলে কোনো সাধারণ ব্যক্তির জন্যে হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয নয়। যদি কেউ কোনো নারীকে যৌনাবেগ নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা তাকে চুমু দেয় অথবা চোখে সুরমা লাগায় তারপর ভাবে যে, তার রোযা ভঙ্গ হয়েছে ও ইফতার করে নেয়, তা হলে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি সে ফকীহর কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে রোযা ভাঙে তো কাফফারা দিতে হবে না। তবে যদি সে সূর্য হেলার আগে রোযার নিয়ত করে সেই রোযা ভাঙে তা হলে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে কাফফারা জরুরি নয়। অবশ্য সাহেবাইনের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) তাতে মতানৈক্য রয়েছে। আল মুহীতে এভাবে বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, সাধারণ মুসলমানদের মাজহাব হলো তাদের মুফতীর ফতোয়া। আল মুহীতের খাজাউল ফাওয়ায়েত অধ্যায়ে রয়েছে, যদি এরূপ কোনো সাধারণ ব্যক্তি হয় তার নির্দিষ্ট কোনো মাজহাব নেই, তা হলে তার মাজহাব হলো তার মুফতীর ফতোয়া। ওলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করেন।

যদি কোনো হানাফী আলেম ফতোয়া দেয় যে, তুমি আসর ও মাগরেব নামায দ্বিতীয়বার পড়ে নাও আর কোনো শাফেঈ আলেম যদি বলেন, তোমাকে পুনর্বার পড়তে হবে না, এক্ষেত্রে সে নিজের রায় কাজে লাগতে পারবে না। সে যদি কাউকে জিজ্ঞেস না করে অথবা হঠাৎ করেই সে কোনো মাজহাব মতে ঠিক কাজ করে ফেলে তা হলে তার জন্যে তা যথেষ্ট হবে। তার সে কাজ আর পুনর্বার করতে হবে না।

শায়েখ ইবনে সালাহ বলেন ঃ যদি কোনো শাফেঈ মাজহাবের লোক নিজ মাজহাবের বিরোধী হাদীস দেখতে পায় তখন যদি তার পূর্ণভাবে অথবা সাধারণভাবে ইজতেহাদের উপায় উপকরণ অর্জিত হয়ে থাকে, অথবা সেই অধ্যায়ের বা মাসআলার ব্যাপারেও তা জ্ঞাত থাকে, তা হলে সে হাদীসের স্বাধীনভাবে আমল করতে পারে। তবে যদি ইজতেহাদের কার্যকারণ ভালোভাবে জানা না থাকে এবং আলোচনা পর্যালোচনার পরেও হাদীসের বিরোধীতা করাটা

যদি তার জন্যে কষ্টকর মনে হয় এবং তার মাধ্যমে যে হাদীসটির কোনো সন্তোষজনক জবাব না পায়, তার জন্যেও হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয হবে। তবে শর্ত এই যে, ইমাম শাফেঈ ছাড়া যদি কোনো স্বতন্ত্র ইমাম সে হাদীসের ওপর আমল করে থাকেন। কেবল এরূপ ক্ষেত্রেই সে নিজ ইমামের মাজহাব ছাড়ার অজুহাত পেতে পারে। ইমাম নববী এটাকে ভালো বলেছেন এবং এটাকে সুপ্রমাণিত করেছেন।

একটি সমস্যার ক্ষেত্র হলো এই যে, ফকীহদের ভেতর মতভেদের রূপ তখনই দেখা দেয় যখন উভয় দিকেই সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ বর্ণিত হয়। যেমন তাকবীরে তাশরীক, তাকবীরাতে ঈদাইন ও এহরামের অবস্থায় বিয়ে। তেমনি ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর থেকে বর্ণিত তাশাহহুদ ও বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া, আমীন আস্তে বলা, একামাতে দু-দুবার বা এক একবার বাক্যগুলো পড়া ইত্যাদি। এ মতভেদ মূলত দুটো ভাষ্যের একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে দেখা দেয়। পূর্বসূরিদের পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তাদের মাসআলার বৈধতার ব্যাপারে মতভেদ ছিল না, মতভেদ ছিল দুটোর ভেতরে একটাকে প্রাধান্য দেবার ব্যাপারে। তার উপমা হলো ক্বারীদের কিরাত পাঠের বিভিন্ন পদ্ধতি। এ সব ব্যাপারে অধিকাংশ দলীল এটাই দেয়া হয় যে, পঠন পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ ছিল। অথচ সব সাহাবাই হেদায়েতের ওপর রয়েছেন। এ কারণেই আলেমগণ সর্বদা মুফতীদের ফতোয়া ও ক্বাজিদের ফয়সালা বৈধ রেখে চলেছেন। কখনো তারা নিজ মাজহাবের বিরোধী আমলও করে আসছেন। তোমরা মাজহাবের ইমামদের দেখতে পাবে যে, তারা এ সব ব্যাপারে বিরোধীদেরও মতামত বলে দেন। আর তা তারা সুস্পষ্টভাবেই বলে দেন। এমনকি তাদের মতও তারা এভাবে বলে থাকেন যে, এ মতটি অধিক সতর্কতামূলক, এটা আমার কাছে বেশি পসন্দনীয় এবং আমি তো এটাই জানতে পেরেছি।

আল মবসুতে এ ব্যাপারটির নজির অনেক দেখা যায়। তেমনি ইমাম মুহাম্মদের আছার ও ইমাম শাফেঈর ভাষ্যেও তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

পরবর্তীকালে এক দল সাহাবাদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলল। তারা বিরোধীতার দিকটাই জোর দিল এবং নিজ ইমামদের পসন্দনীয় মতের ওপর মজবুত হয়ে বসে গেল। তা ছাড়া পূর্বসূরিদের থেকে যে বর্ণিত হয়েছে 'নিজ সহচরদের মাজহাবের অবশ্যই পাবন্দী করবে এবং কোনো অবস্থাতেই তার বাইরে যাবে না' সেটা মূলত ছিল নিছক প্রকৃতিগত ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক

মানুষ সেটাই পসন্দ করে যা তার সহচর ও সমগোত্রীয়রা পছন্দ করে। এমনকি তারা খানাপিনা ও পোশাক-আশাকেও তাই করে। অথবা দলীল প্রমাণের জোর দেখে কিংবা অন্য কোনো উপকরণের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সমগোত্র ও সহচরদের পছন্দনীয় ব্যাপারগুলোকে পসন্দ করে থাকে। অবশ্য কিছু লোক সেটাকে মাজহাবী সংকীর্ণতা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। মূলত সে ব্যক্তি তা থেকে মুক্ত।

সাহাবা ও তাবেঈন এবং তাদের পরবর্তী কিছু লোক 'বাসমালাহ্' পড়তেন আর কিছু লোক তা পড়তেন না। কিছু লোক বাসমালাহ নিঃশব্দে পড়তেন, কিছু লোক সশব্দে পড়তেন। তাদের কিছু লোক ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন। কিছু লোক শিংগা টানালে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে ও বমি করলে ওযু করা জরুরি ভাবতেন, আবার কিছু সাহাবা তা ভাবতেন না। কিছু সাহাবা লজ্জাস্থানে হাত লাগলে এবং যৌনাবেগ নিয়ে নারী স্পর্শ করলে ওযু করা জরুরি বলতেন। অন্য সাহাবারা তা বলতেন না। এক দল আগুনে রান্না করা কিছু খেলে ওযু করতেন, অন্যরা তা জরুরি মনে করতেন না। তাদের কিছু লোক উটের গোশত খেলে পুনরায় ওযু করতেন এবং অন্যরা তা করতেন না। এতকিছু সত্ত্বেও তারা একজন আরেকজনের পেছনে নামায পড়তেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা কিংবা তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং ইমাম শাফেঈ প্রমুখ মদীনায় মালেকী ও অন্য কোনো মাজহাবের ইমামের পেছনে নামায পড়তেন। সেই ইমাম বাসমালাহ্ পড়ুক বা না পড়ুক, আস্তে পড়ুক বা জোরে পড়ুক তা নিয়ে তাদের কোনো দ্বিধা ছিল না। খলীফা হারুনুর রশীদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এমন এক ইমামের পেছনে নামায পড়লেন যিনি শিঙ্গা টানিয়ে ওযু করতেন না। তা বলে তারা দ্বিতীয়বার নামায পড়া প্রয়োজন ভাবেন নি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে কিংবা শিঙ্গা টানালে ওযু করা জরুরি ভাবেন। তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো, যদি কোনো ইমামের শরীর থেকে রক্ত ঝরে ও সে পুনর্বার ওযু না করে তা হলে তার পেছনে আপনি নামায পড়বেন কি? তিনি জবাব দিলেন, ভাই! আমি ইমাম মালেক ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের পেছনে কেন নামায পড়ব না?

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ উভয়ই দু ঈদের নামাযে ইবনে আব্বাসের (রহঃ) তাকবীর পাঠ করতেন, কারণ হারুনুর রশীদ তার পরদাদার তাকবীর পসন্দ করতেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একবার ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযারের কাছে নামায পড়লেন। তখন তাঁর আদব রক্ষার্থে তিনি ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পড়লেন না এবং বললেন, অনেক সময় আমরা ইরাকীদের মাজহাবও মেনে নেই।

ইমাম মালেক (রহঃ) খলীফা মানসুর ও খলীফা হারুনকে যা বলেছিলেন তা আমি আগেই বলে এসেছি। ফাতাওয়ায়ে বাজ্জাসিয়ায় ইমামে ছানী কাজি ইউসুফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জুমআর দিন হাম্মাম খানায় গোসল করে জুমআর নামাযে ইমামতি করলেন। তারপর তিনি জানতে পেলেন যে, হাম্মাম খানার কুয়ায় একটি মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। তখন তিনি বললেন, এ ক্ষেত্রে এখন আমি আমার মাজহাবী ভাইদের মাসলাক মতে চলব। যখন কুয়ার পানির পরিমাণ এক কুল্লা হবে, তখন আর তা নাপাক হবে না।

ইমাম খাজান্দী (রহঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, শাফেঈ মাজহাবের এক ব্যক্তি এক বছর কি দু'বছরে নামায পড়েনি। এখন সে হানাফী মাজহাবে এসেছে। এখন তার জন্যে কোন মাজহাবের পদ্ধতিতে নামায কাজা করতে হবে? তিনি জবাব দিলেন– যখন সে উভয় মাজহাব বৈধ মনে করছে, তখন যে কোনো মাজহাব অনুসারে নামায আদায় করা বৈধ হবে।

জামেউল ফাতওয়ায় রয়েছে যে, এক হানাফী ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি অমুককে বিয়ে করলে তিন তালাক, তারপর সে যদি এক শাফেঈ মুফতীর কাছে ফতোয়া চায় এবং সে বলে তালাক হবে না ও কসম বাতিল হয়ে যাবে, তখন তার জন্যে শাফেঈ মাজহাব অনুসরণে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ ইমাম শাফেঈর মাজাহাবের পক্ষেও বহু সাহাবা রয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ তার আমালী গ্রন্থে বলেন -যদি কোনো ফকীহ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক দিলাম এবং তিনি তা তিন তালাকের নিয়তেই বলে থাকেন, তারপর যদি কোনো কাজি ফয়সালা দেন যে, তার তালাক রেজয়ী তালাক, তা হলে তিনি স্ত্রীকে সাথে রাখতে পারবেন। মোট কথা, ফকীহদের মতভেদের সব মাসআলারই এরূপ অবস্থা। হালাল করা, হারাম করা, আজাদ করা, সম্পদ পাওয়া, না পাওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেই যে কোনো ফকীহর উচিত কাজির ফয়সালা মেনে চলা, নিজের মত ত্যাগ করা, কাজি তার ওপর যা অপরিহার্য করে সেটাই নিজের ওপর অপরিহার্য করা এবং কাজি তাকে যা দান করেন সেটাই গ্রহণ করা।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন ঃ অজ্ঞ লোকের অবস্থাও অনুরূপ। যদি সে কোনো সমস্যায় পড়ে ও ফকীহদের কাছে ফতোয়া চেয়ে সে বস্তুর হালাল বা হারাম হওয়ার ফতোয়া পায় অতঃপর মুসলমানদের কাজি তার বিপরীত ফয়সালা প্রদান করে এবং মাসআলাটি নিয়ে ফকীহদের ভেতর মতভেদ থাকে, তখন তার উচিত কাজির ফয়সালা অনুসারে চলা ও ফকীহর ফতোয়া বর্জন করা।

জটিল বিষয়গুলোর এও একটি যে, কিছু কিছু আলেম মনে করেন যে, বড় বড় ফতোয়া ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কিতাবাদিতে যা কিছু লেখা আছে তা সবই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও সাহেবাইনের মতামত। তারা উদ্ভাবিত অভিমত ও ইমামের মূল ভাষ্যের ভেতরে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। না তারা ফকীহদের এ কথার অর্থ বুঝে যে, কারখীর উদ্ভাসিত মাসআলা এরূপ, তাহাভীর উদ্ভাবিত মাসআলা এটি এবং ফকীহদের বক্তব্য ইমাম আবু হানীফা এ কথা বলেছেন অথবা হানাফী মাজহাব মতে জবাব এই, কিংবা আবু হানীফার পদ্ধতি মতে এরূপ জবাব হবে।' মূলত তারা এ দুয়ের পার্থক্যই বুঝে না। গবেষণা কর্ম ও মাজহাবী মাসআলার তারতম্য বোধ তাদের নেই। তারা হানাফী মোহাক্কেক ইবনে হুমাম ও ইবনে নাজীমের দিক পরশে দশ দশ হাত কুয়ার মাসআলায় এবং তায়াম্মুমের জন্যে পানি এক মাইল দূরে হবার শর্ত সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন সেদিকেও নজর দেন না যে, এরা গবেষণা করেছেন মাত্র এবং মূলত এটা মাজহাব নয়।

কিছু লোকের ধারণা যে, মাজহারে বুনিয়াদ সে সব বিতর্ক ও বাড়াবাড়ির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা ইমাম সারাখসীর আল মাবসূত কিংবা হেদায়া ও তাবয়ীন কিতাবে বিদ্যমান। তারা এ কথা জানে না যে, বিতর্ক ও বাহাসমূলক এ সব কথা পয়লা মুতাযিলারা শুরু করেন। তাই তা মাজহাবের ভিত্তি নয়। অতঃপর পরবর্তী যুগের আলেমরা সেসব পছন্দ করেছেন জ্ঞানের প্রসারতা, মেধা, তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোনো কারণে। আল্লাহই ভালো জানেন। আমি এ অধ্যায়ে যা কিছু আলোচনা করলাম তাতে এ ধরনের সন্দেহ সংশয়ের সমাধান রয়েছে।

আরেকটি জটিল সমস্যা হলো এই যে, আমি কিছু আলেমকে দেখতে পেয়েছি যে, তারা মনে করেন, আবু হানীফা (রহঃ) শাফেঈ (রহঃ)-এর মতবিরোধের ভিত্তি হলো সে সব নীতিমালা যা অসূলে বজবী বা অনুরূপ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। অথচ সত্য কথা এই যে, সে সবের অধিকাংশ নীতিমালাই তাদের ভাষ্য থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। আমার মতে নির্দিষ্ট বস্তু তো সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ব্যাপার। তার জন্যে কোনো বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। তেমনি বাড়াবাড়ি যেখানে যা তা মানসুখ। তেমনি সাধারণ বস্তু তো নির্দিষ্ট বস্তুর মতোই সুস্পষ্ট। তেমনি বর্ণনার আধিক্যই কোনো কিছুর প্রাধান্য পাবার কারণ নয়। যদি কোনো হাদীস কেয়াস বিরোধী হয়ে যায়, তথাপি গায়রে ফকীহর বর্ণিত হাদীস আমল করা ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া শর্ত ও গুণাবলির তাৎপর্যের কোনো নির্ভরযোগ্যতা

নেই। আর কোনো নির্দেশের দাবি হলো তা ওয়াজিব হওয়া। অন্যান্য মাসআলার ব্যাপারও অনুরূপ।

এরূপ নীতিমালাও রয়েছে যা ইমামদের ভাষ্য থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। অথচ তা ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের কাছ থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি। তা আবার সেগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও পূর্বসূরিদের উদ্ভাবনের ওপর সম্ভাব্য প্রশ্নাবলির জবাব নিয়ে মাথা ঘামানোরই বজদভী ততখানি গুরুত্ব দেননি যতখানি দিয়েছেন বিরোধীদের নীতিমালার সংরক্ষণ ও তার ওপর উত্থাপিতব্য প্রশ্নাবলির জবাব দানের ব্যাপারটিকে। তার উদাহরণ এই যে, তিনি একটি নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, খাস যা তা সুস্পষ্ট এবং সেটাকে আরও স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি আল্লাহ্ পাকের ফরমান– 'রুকু কর ও সিজদা কর' এর ওপর পূর্বসূরিদের পর্যালোচনা থেকে তিনি উক্ত নীতিটি উদ্ভাবন করেছেন। তেমনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ওপর পূর্বসূরিরা যা আলোচনা করেছেন তা থেকে তিনি বের করলেন, মানুষের নামায বৈধ হবে না যতক্ষণ না রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সোজা হয়। অথচ পূর্বসূরিরা পিঠ সোজা করে স্বস্তির অবস্থা সৃষ্টিকে ফরজ বলেন নি এবং হাদীসটিকেও উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেননি। ফলে তারা আল্লাহ পাকের ফরমানের ওপর যা কিছু আলোচনা করেছেন তার এ উদ্ভাবন সেই আলোচনাকেই প্রশ্ন সাপেক্ষ করে ফেলেছে। আল্লাহ পাকের ফরমান হচ্ছে, মাথা মাসেহ কর এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কপাল মাসেহ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তেমনি ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীকে কোড়া মারা হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের ফরমান। তেমনি আল্লাহ পাকের ফরমান হচ্ছে নারী চোর ও পুরুষ চোরের হাত কাট। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন– এমনকি সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করবে।

এসব ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পূর্বসূরিরা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা তাদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তারা সে সব ক্ষেত্রে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যা সাধারণ হুকুম তাও যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি যা নির্দিষ্ট হুকুম তাও সুস্পষ্ট।

তারা পূর্বসূরিদের পর্যালোচনা থেকে উদ্ভাবন করলেন যে, আল্লাহ্ পাকের ফরমান কুরআন থেকে যতটুকু পার পড় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 'সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায নেই' নির্দিষ্ট কারণ হয়ে দেখা দেয়নি।

তেমনি 'নালা-খাল থেকে প্রাকৃতিকভাবে সিঞ্চিত জমির ফসলের এক-দশমাংশ প্রদেয়' হাদীসকে 'পাঁচ উকিয়ার কম ফসলে যাকাত নেই' হাদীসের জন্যে তারা নির্দিষ্ট কারণ বলে আখ্যায়িত করেন নি। এভাবে আরও অনেক মাসআলা রয়েছে।

তাদের এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে হলো যে, আল্লাহ পাকের ফরমান, 'যা পার কুরবানি কর' তো ব্যাপকার্থক হুকুম নির্দেশক, কিন্তু তারা তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ভিত্তিতে সেটাকে বকরী বা তার বড় কিছু কুরবানির কথা বলে হাদীসকে আয়াতের নির্দিষ্ট কারণ হিসেবে মেনে নিলেন? ফলে এ প্রশ্নের তাদের জবাব দিতে হলো।

তেমনি তাদের নীতি হলো, শর্ত ও গুণাবলির তাৎপর্যের কোনো গুরুত্ব নেই। তারা পূর্বসূরিদের সেই আমল থেকে উদ্ভাবন করেছেন যা তারা 'তোমাদের সে প্রশস্ততা যাদের নেই' আয়াতের ব্যাপারে অনুসরণ করেছেন।

তাদের সৃষ্ট নীতিমালার ওপর পূর্বসূরিদের আরও কিছু আমল প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুক্ত চারণ ভূমিতে প্রতিপালিত উটের যাকাত দিতে হবে। তারা এর জবাব দিতে গিয়ে কষ্টার্জিত জবাব দিয়েছেন। এ কারণে তারা এ নীতি স্থির করেন যে, যদি কোনো হাদীস কেয়াসের খেলাপ হয়, তা হলে ফকীহ নয় এমন লোকের হাদীসের ওপর আমল করা অপরিহার্য হবে। মিসরাতের হাদীস বর্জনের ব্যাপারটিও তারা পূর্বসূরিদের আমল থেকে উদ্ভাবন করেছেন। ফলে অট্টহাসি বা ভুলে খাওয়ায় রোযা ভেঙ্গে যাবার হাদীসের সাথে তাদের জটিলতা দেখা দিয়েছে। অগত্যা তাদের কষ্টার্জিত জবাব দিতে হয়েছে।

আমি যা কিছু বললাম অনুসন্ধান করলে যে তা ভুরিভুরি নজির পাওয়া যাবে তা অনুসন্ধানীদের কাছে গোপন নয়। তবে যারা অনুসন্ধানী নয় তাদের জন্যে তো ইশারায় ইঙ্গিতে বেশ কিছু বলে দিলাম। এ নিয়ে লম্বা বহাস নিষ্প্রয়োজন। আর তোমাদের জন্যে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের প্রদত্ত দলীল প্রমাণই যথেষ্ট।

মাসআলা হলো এই, যে ব্যক্তির স্মরণশক্তি ও সততা মশহুর হয়ে আছে অথচ সে ফকীহ নয়, তা হলে কেয়াস পরিপন্থী হাদীস বর্জনের জন্যে তার ওপর আমল অপরিহার্য নয়। যেমন, হাদীসে মিসরাত। ঈসা ইবনে আবানের এ মাজহাব। পরবর্তীকালের বহু আলেম এটাকে পছন্দ করেছেন।

ইমাম কারখী ও তাঁর অনুসারী বহু আলেমের মাজহাব এই যে, কেয়াসের

ওপর সর্বদা হাদীস প্রাধান্য পাবে। এমনকি সে ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ফকীহ হওয়াও শর্ত নয়। তিনি বলেন, আমাদের সমমনাদের থেকেও এটা বর্ণিত হয়নি। দেখুন, তারা আবু হুরায়রা (রহঃ)-এর সেই হাদীসের ওপর আমল করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, ভুলে কেউ খানাপিনা করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। অথচ এ ব্যাপারটি কেয়াসের পরিপন্থী। এমনকি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বক্তব্য হচ্ছে 'যদি হাদীস না হতো তাহলে কেয়াসের ভিত্তিতে আমি রোযা ভঙ্গ হবার বিধান দিতাম।

তোমরা এ ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে জানতে পাবে যখন দেখতে পাবে যে, মোতাকাদ্দেমীনের ভাষ্য থেকে তারা নীতিমালা উদ্ভাবন করতে গিয়ে, নিজেরাই অনেক মতানৈক্যের শিকার হয়েছেন ও একে অন্যের মত খণ্ডনে ব্যস্ত থেকেছেন।

একটি জটিল সমস্যা হলো এই যে, আমি লোকদের ভেতর দেখেছি তারা দুটো দল ছাড়া আর কোনো দলের খবরই রাখে না। তাদের জ্ঞাত দল দুটোর একটি হলো বুদ্ধি বিবেক পন্থী, অপরটি হলো জাহেরী হাদীসপন্থী। যারা কেয়াসের মাধ্যমে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন তারাই হলেন বুদ্ধিবিবেকপন্থী। খোদার কসম! ব্যাপারটা এরূপ নয়। আহলে রায়দের রায় শুধু বুদ্ধি-বিবেক নির্ভর নয়। কারণ কোনো আলেমই বুদ্ধি বিবেকশূন্য নয়। তাই তাদের সে রায় সুন্নাহর ভিত্তিতে নয়। এটা আদৌ ঠিক নয়। কোনো মুসলমানই সেরূপ রায় মেনে নেয় না। কেয়াস ও উদ্ভাবন শক্তি ব্যবহার করলেই সে আহলে রায় হয়ে যায় না। তা হলে ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, এমনকি ইমাম শাফেঈ পর্যন্ত কেয়াস ও উদ্ভাবন অনুসারী ছিলেন। বরং আহলে রায় দ্বারা সেই দলকে বুঝায় যারা অধিকাংশ ফকীহ ও মুসলমানদের মতৈক্য ভিত্তিক মাসআলাগুলো উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের কারো ভাষ্যকে গ্রহণ করেছেন। তাদের অধিকাংশ কাজ এটাই ছিল যে, অতীতের নজিরের ভিত্তিতে নতুন হুকুম বের করা এবং তাকে কোনো একটি মূলনীতির সাথে সেটাকে সম্পৃক্ত করতেন। তারা হাদীস ও আছার অনুসন্ধানের দিকে দৃষ্টি দিতেন না। পক্ষান্তরে জাহেরপন্থী বলতে তাদের বুঝায় যারা না কেয়াস মানে, না সাহাবী ও তাবেঈর আছার অনুসরণ করে। যেমন দাউদ ইবনে হামম (রাঃ)। এ দুটির মাঝখানে অনেক বিজ্ঞ আলেম রয়েছেন। তারা সবাই আহলে সুন্নত। যেমন ইমাম আহম্মদ ও ইমাম ইসহাক (রাঃ)। এ ব্যাপারে আমি বেশ দীর্ঘ আলোচনা করলাম। এমনকি যে বিশ্বাস নিয়ে আমি এ গ্রন্থ রচনা করেছি, তা থেকেও আমি সরে গিয়েছি। এটা আমার পদ্ধতি নয়, অভ্যাসও নয়। তবে দুটো কারণে তা করেছি।

১। আল্লাহ্ তাআলা আমার অন্তরে মুহূর্তের মধ্যে এমন এক মানদণ্ড সৃষ্টি করে দিলেন যার সাহায্যে আমি উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সৃষ্ট প্রত্যেকটি মতভেদের কারণ বুঝে ফেলি। এটাও বুঝতে পাই যে, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তার কোনটি সত্য? আল্লাহ্ পাক আমাকে এ শক্তিও দান করেছেন যে, দলীল প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা আমি তা প্রমাণও করতে পারি। আর তা এমনভাবে পারি যে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না, এমনকি তাতে কোনো জটিলতাও অবশিষ্ট থাকে না। তাই আমি একটি কিতাব রচনার ইচ্ছা করলাম আর তার নাম দিলাম 'গায়াতুল ইনসাফ ফী বয়ানে আসবাবুল এখতেলাফ' (মতভেদের কারণ বর্ণনায় চূড়ান্ত সুবিচার।) উক্ত কিতাবে আমি এই ব্যাপারটি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করব ও তার ভেতর বহু প্রমাণ উপমা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার উপস্থাপন করব। সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচার ও বাক্যের বিভিন্ন দিক, তার উদ্দেশ্য ও দাবি সম্পর্কিত রীতিনীতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করব। অতঃপর এখন পর্যন্ত উক্ত কিতাব রচনার আমি সুযোগ পাইনি। এখন যখন মতভেদের উৎস পর্যন্ত কথা পৌঁছে গেল, তখন অন্তরে এ উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, যা কিছু তাওফীক হয় বর্ণনা করে দেই।

২। এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, এ যুগের লোকদের ভেতর মতভেদের সৃষ্টি হয়ে গেছে যা আমি ওপরে তুলে ধরলাম। তার ভেতর কিছু কিছু ব্যাপারে মানুষ অন্ধ রয়ে গেছে। এমনকি একদল তাদের সাথে লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছে যারা তাদের সামনে আল্লাহ পাকের এ বাণী তুলে ধরে ঃ "আমাদের প্রতিপালক অশেষ দয়ালু। তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ আমরা তা থেকে তাঁরই কাছে সাহায্য চাই।"

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার) পয়লা খণ্ডে হাদীসের তত্ত্ব জ্ঞান সম্পর্কে যা আমি বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছিলাম এটাই হলো তার শেষ কথা। শুরু ও শেষে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর জন্যেই প্রশংসা। এরপর ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ড আসবে। তাতে সেই সব রহস্যের উল্লেখ করব যা স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ব্যাপক হারে প্রকাশিত ঘটনাবলির রহস্য বর্ণনা

এখানে হাদীসের এমন এক পর্যাপ্ত গুচ্ছের বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য যা মুহাদ্দিসদের কাছে সুপরিচিত, আলেম সমাজে প্রচলিত সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমে ও আবু দাউদ, তিরমিজীর সুনানে বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সে সবের আওতায় বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই প্রত্যেক হাদীসের বর্ণনাকারী ও উৎসের দিকে দৃষ্টি দেইনি। কখনো বা হাদীসের মূল বক্তব্য বা হাদীসের অংশমাত্র উল্লেখ করেছি। এ কারণে যে, হাদীসের যে কোনো ছাত্রের জন্যে সে সব কিতাবের দিকে মনোনিবেশ ও সেগুলোর অনুসন্ধান সহজ ব্যাপার।

ঈমানের বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনা ঃ জেনে রাখা দরকার যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিখিল সৃষ্টির জন্যে ব্যাপকতা নিয়ে প্রেরিত হলেন, আর তা এ জন্যে যে, তাঁর দ্বীন যেন অন্যান্য দ্বীনের ওপর বিজয়ী ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় এবং অন্য সব বাতিল দ্বীনগুলো পরাভূত ও লাঞ্ছিত হয়, তখন তাঁরা এ ব্যাপক দ্বীনে নানা ধরনের লোক প্রবেশ করল। ফলে এটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল যে, যারা তাঁর দ্বীন মেনে নিলেন আর যারা মানলেন না, তাদের মাঝে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সৃষ্টি হোক। তারপর এটাও জরুরি হয়ে দেখা দিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ে আসা হেদায়েতের আলো কাদের অন্তরে প্রবেশ করে তা উদ্ভাসিত করল আর যাদের অন্তরে সেভাবে তা প্রবেশ করল না তাদের ভেতরেও পার্থক্য সৃষ্টি করা। বস্তুত ঈমান দু'শ্রেণীর।

১। এক শ্রেণীর ঈমানের ওপর পার্থিব জীবনের বিধান নির্ভরশীল। মানে জান-মালের হেফাজত হওয়া ও আনুগত্য প্রকাশের প্রকাশ্য ব্যাপারগুলো তার ভিত্তিতে শৃঙ্খলিত হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমানও তাই বলছে। তিনি বলেন, আমাকে ততক্ষণ জেহাদ চলিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যখন তারা এ কাজ করবে তখন তার জান ও মাল আমার তরফ থেকে হেফাজতে থাকবে যদি না ইসলামের কোনো বিধি-ব্যবস্থা তার

ওপর আরোপিত হয় এবং তার আসল হিসাব-নিকাশ আল্লাহর ওপর রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেন– যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ল, আমাদের কেবলায় মুখ ফিরাল এবং আমাদের জবাই করা জীব ভক্ষণ করল সে মুসলমান এবং তার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তোমরাও আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্বে খেয়ানত করো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ তিনটি কথা হলো ঈমানের ভিত্তি। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ল তার থেকে বিরত থাক। গুনাহের জন্যে তাকে কাফের বলো না। কোনো কাজের জন্যে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করো না।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমান হলো পারলৌকিক জীবনের বিধানের ভিত্তি। মানে, নাজাত প্রাপ্তি ও মর্যাদা লাভ সংশ্লিষ্ট বিধান। এ সব কিছু সর্বিক আকীদা, পুণ্য কাজ ও উত্তম যোগ্যতা নিয়ে গঠিত। এটা কম ও বেশি হতে থাকে। শরীআত প্রণেতার রীতি হলো যে, এর সব কিছুকেই তিনি ঈমান নামে অভিহিত করেন, যেন সবাই ঈমানের অংশগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছেন। যেমন যার ভেতর আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না তার দ্বীন নেই। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ মুসলমান তাকেই বলি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আল হাদীস।

ঈমানের বহু শাখা। তার উদাহরণ হলো সেই গাছ যার কাণ্ড, ডালপালা, পাতা, ফুল ও ফল রয়েছে। যদি তার ডালপালা কাটা হয়, পাতা ঝরে যায় ও ফলগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়, তা হলে বলা হয় একটা ঠুঁটো গাছ। আর যখন তার কাণ্ডও উপড়ে ফেলা হয় তো পুরো গাছটাই শেষ হয়ে যায়। স্বয়ং আল্লাহ বলেন, সে ব্যক্তিই ঈমানদার আল্লাহর নাম শুনে যার অন্তর সন্ত্রস্ত হয়। এ সব ব্যাপার যখন একই ধরনের নয়, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে দুটো স্তরে ভাগ করেছেন।

১। পয়লা স্তরে হলো আরকান যা ঈমানের সর্বোত্তম অংশাবলি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি– (১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্ব করা ও (৫) রমযানের রোযা রাখা। এ ছাড়া যত অন্যান্য শাখা আছে তা এগুলোরই অংশ বিশেষ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা ও সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কাঁটা সরানো এবং লজ্জা ঈমানের অঙ্গ বিশেষ।

প্রথম শ্রেণীর ঈমানের বিপরীত ঘটলে কুফরী আসে। আর ঈমানের দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমানে ব্যতায় ঘটলে দুটো অবস্থা দেখা দেয়।

এক. যদি অন্তরে স্বীকৃতি না থাকে, শুধু তরবারির বিজয়ের কারণে ইবাদত ও আনুগত্য করে তো সেটা নিছক নেফাক। এ তাৎপর্য মতে যে ব্যক্তি মোনাফেক হবে, পরকালে তার আর কাফেরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। পরন্তু মোনাফেকের ঠাঁই হবে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।

দুই. আর যদি অন্তরের স্বীকৃতি থাকে, কিন্তু বাহ্যিক অবয়বের ইবাদতগুলো না করে, তাহলে তাকে ফাসেক বলা হবে। তেমনি যদি অন্তরে এখলাস না থাকে তাহলে সেটা আরেক ধরনের নেফাক। কোনো কোনো পূর্বসূরি সেটার নাম দিয়েছেন আমলের নেফাক। তার রূপ হলো এই যে, মানুষের ওপর নিজ স্বভাব বা সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব দেখা দেয় কিংবা কুসংস্কারের আবরণ চড়ে যায়। ফলে সে পার্থিব জীবন, গোত্র ও সন্তানাদির মায়ায় আচ্ছন্ন হয়। আর অন্তরে একথা জাগে যে, পারলৌকিক শাস্তি বা পুরস্কার তো অনেক পরের ব্যাপার। তাই সে সদম্ভে পাপের পথে পা বাড়ায়। সাধারণত সে তা অজ্ঞাতেই করতে থাকে। তবে যদি সে ঘোষণা করে তা করে আর সেটাই মানুষের করা বাঞ্ছনীয় অথবা সে ইসলামের ওপর চলাটা কঠিন ও বিপদজ্জনক দেখে তা অনুসরণ করা অপছন্দ করে কিংবা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কারণে আল্লাহর বাণী ঘোষণা থেকে বিরত থাকে, তা হলে সে আমলের মোনাফেক হবে।

ঈমানের আরও দুটো স্তর রয়েছে। এক. অন্তরে সে সব ব্যাপারের স্বীকৃতি দান যা যা নিতান্তই জরুরি। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেন, ঈমান হলো আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। –আল্ হাদীস। দুই, নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তরে যে পবিত্রতা ও প্রশান্তি বিরাজ করে তা আর্জিত হওয়া। এ ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। যখন কোনো বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার ঈমান বেরিয়ে গিয়ে মেঘের মতো তার মাথার ওপর বিরাজ করে। অতঃপর যখন সে তা থেকে মুক্ত হয় তখন তা আবার ফিরে আসে।

হযরত মুআজ (রাঃ) বলেন– এস, ঘণ্টা খানিকের জন্যে ঈমান লই। মানে অন্তরের স্বস্তি ও নির্মলতা বাড়িয়ে নেই।

বস্তুত, শরীআতের পরিভাষায় চারটি অর্থ। যদি তোমরা ঈমানের অধ্যায়ের পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলো যথাযথ স্থানে রেখে নজর বুলিয়ে নাও তা হলে তোমাদের সকল সন্দেহ -সংশয় দূর হয়ে যাবে। ঈমানের পয়লা অর্থ যে ইসলাম তা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। তাই আল্লাহ বলেন, তোমরা ঈমান এনেছ এ কথা না বলে বল, আমরা মুসলমান হয়েছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ (রহঃ)-কে বললেন, মুসলমানও কি? অর্থাৎ বল, আমি মুসলমান। তেমনি ঈমানের চতুর্থ অর্থ যে এহসান তাও সুস্পষ্ট।

নেফাকে আমল ও এখলাস পরস্পর বিপরীত ব্যাপার। দুটোই যেহেতু অদৃশ্য ব্যাপার তাই প্রত্যেকটির লক্ষণ ও নিদর্শন বলে দেয়া জরুরি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার ভেতর রয়েছে সে নির্ভেজাল মোনাফেক। যদি তার একটি স্বভাবও থাকে তাহলে সে সেই স্বভাবের মোনাফেক যতক্ষণ না তা বর্জন করে। (১) তার কাছে আমানত রাখলে খেয়ানত করে (২) যখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে (৪) যখন ঝগড়া করে তো ফাহেশা কথা বলে (৩) যখন ওয়াদা করে তো ভঙ্গ করে।

পক্ষান্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনটি অবস্থা যার ভেতর বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে।

১। সব কিছুর চাইতে তার কাছে আল্লাহ ও রাসূল প্রিয়।

২। কোনো বান্দাকেও ভালোবাসলে তা আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে।

৩। আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে সে অপসন্দ করে ঠিক তেমনি অপসন্দ করে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি কোনো বান্দাকে মসজিদে পড়ে থাকতে দেখবে, তখন তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। তেমনি তিনি অন্যত্র বলেন ঃ আলীকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ এবং আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ নেফাকের লক্ষণ। এ হাদীসের রহস্য এই যে, হযরত আলী (রাঃ) আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর সেই কঠোরতা তার পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব যার প্রবৃত্তি পরাভূত থাকে ও ঠিক হয়ে যায় এবং যার জ্ঞান তার ফাহেশের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন ঃ আনসারদের ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন। তার রহস্য এই যে, সাদিয়্যা ও ইয়ামনী আরবদের মধ্যে সার্বক্ষণিক শত্রুতা বিরাজ করছিল। অবশেষে ঈমান তাদের এক করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী উচ্চকিত করার জন্যে সাহসে বুক বাঁধে, তার ভেতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়। এক্ষেত্রে হিম্মতের অভাব দেখা দিলেই মন্দ স্বভাব থেকে যায়।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। সিসাম ইবনে ছালাবার ও জনৈক আরাবীর হাদীসে আছে যে, আরাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, 'আমাকে এমন কাজ বলে দিন যা আমি সম্পাদন করলে জান্নাতে প্রবেশ করব।' উক্ত পাঁচটি জিনিস ইসলামের রুকন। যে ব্যক্তি তা করল ও অন্য কোনো ইবাদত করল না তার গর্দান আজাব থেকে বেঁচে যাবে এবং জান্নাতের অধিকারী হবে।

তেমনি তিনি বলে দিয়েছেন, নামাযের ন্যূনতম স্তর কি? ওযূর ন্যূনতম স্তর কি?

বিশেষভাবে ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বেনার কথা এজন্যে উল্লেখ করা হলো যে, এ পাঁচটিই মানুষের সর্বাধিক বিখ্যাত ইবাদত। দুনিয়ার কোনো জাতিই নেই যারা সেগুলোর কোনো না কোনোভাবে অনুসারী নয়। যেমন– ইয়াহুদি, ঈসায়ী, মাজুসী ও আরবের অন্যান্য বাসিন্দারা। অবশ্য তাদের সেগুলো পালন করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই এগুলো অন্যান্য ইবাদতের বদলে যথেষ্ট, কিন্তু অন্যান্য ইবাদত এগুলোর পরিবর্তে যথেষ্ট নয়। তার কারণ এই যে, পুণ্য কাজের সব নীতির মূলনীতি হলো তাওহীদ, নবুওয়াত ও শরীআতে এলাহিয়ার স্বীকৃতি। যেহেতু ব্যাপক হারে নবী প্রেরিত হয়েছেন, তাই দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে। তখন জরুরি হয়ে দেখা দিল তাদের ও অন্যান্য মানুষের ভেতরে পার্থক্য সৃষ্টিকারী প্রকাশ্য নিদর্শন চালু করা। সেই নিদর্শনই হলো ইসলামের বিধিবিধানের ভিত্তি এবং সেগুলোর জন্যেই মানুষ জবাবদিহি হবে। যদি তা না হতো, তা হলে কিছুকাল পরে ইসলামী ও গায়রে ইসলামী লোকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে নিজেরাই যার যার ধ্যান-ধারণামতে কিছু নিদর্শন চালু করত। ফলে ইসলামের বিধি-বিধানে প্রচুর মতভেদ দেখা দিত। তখন বহু বিধানেই যে গরমিল সৃষ্টি হতো তা সুস্পষ্ট।

অন্তরের বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে উক্ত স্বীকৃতির চেয়ে উত্তম এমন কিছুই নেই যা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে স্বীকার করা যায়। ইসলামের এ সব রোকন

নিয়ে আমি আগেই সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। মূলত যথার্থ সৌভাগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির ভিত্তি হলো চারটি চরিত্র। একটি হলো চারিত্রিক পূত পবিত্রতা। ওযু সহ নামাযের মাধ্যমে মানুষের সেই দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। তাই নামায হলো পবিত্র চরিত্রের মানদণ্ড। তেমনি পরিপূর্ণ শর্তসহ যাকাত আদায় ও তা যথাযথ মাসরাফে বা খাতে ব্যয় করা সামাজিক সহানুভূতি ও সুবিচারের ভিত্তি ও মানদণ্ড। আমি আগেই বলে এসেছি, নফস বা প্রবৃত্তির ওপর এমন কিছু বাহ্যিক ইবাদত চাপানো দরকার যা তার স্বভাবগত দুর্বলতা ও সংকীর্ণতার পর্দা বিলুপ্ত করে। এসব ক্ষেত্রে রোযার চাইতে বেশি সফল আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না। আমি একথাও ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, শরীআতের নীতিগুলোর মূলনীতি হলো আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তার ভেতর একটি হচ্ছে সম্মানিত কাবাঘর। তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পথ এই যে, সেখানে হজ্ব করা হবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি এ ইবাদতের কল্যাণকারিতা বর্ণনা করে এসেছি। তাতে দেখা গেছে যে, হজ্ব অন্যান্য ইবাদতের স্থলে যথেষ্ট। কিন্তু অন্য কোনো ইবাদতই হজ্বের বদলে যথেষ্ট নয়।

শরীআত ও মিল্লাতের দৃষ্টিতে পাপ দুধরনের। সগীরা বা ছোট পাপ ও কবীরা বা বড় পাপ। কবীরা গুনাহ তাকে বলে যা শক্ত জৈবিকতা, হিংস্রতা ও শয়তানী প্ররোচনার কারণে প্রকাশ পায়। কবীরা গুনাহ করার ফলে সত্যের পথ রুদ্ধ হয় ও আল্লাহর নিদর্শনের মর্যাদা চূর্ণ হয়। অথবা সামাজিক জীবনে অপরিহার্য ব্যবস্থার বিরোধীতা অনিবার্য হয় এবং জনগণের জন্যে কঠিন ক্ষতিকর বিপদ সৃষ্টি হয়। তদুপরি তা করার অর্থ দাঁড়ায় শরীআতকে পেছনে ছুড়ে ফেলা। কারণ, শরীআত কঠোর ভাষায় কবীরা গুনাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং তা অনুসরণকারীদের কঠিন শাস্তির কথা শুনিয়েছে। আর সেটাকে এভাবে চিহ্নিত করেছে যে, তা যে অনুসরণ করে সে যেন মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যায়।

সগীরা গুনাহ তার চেয়ে কম স্তরের পাপ। পাপাচারের পথে তা এগিয়ে দেয় ও ডেকে নেয়। শরীআত নিঃসন্দেহে সেটাও নিষিদ্ধ করেছে। তবে তার নিষিদ্ধতা কবীরা গুনাহের নিষিদ্ধতার মতো শক্ত ও কঠোর নয়।

সত্যিকথা বলতে কি, কবীরাহ গুনাহের সংখ্যা সীমা নির্ধারিত নয়। তার পরিচয় এই যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে যে পাপের জন্যে সরাসরি দোযখের প্রতিশ্রুতি ও ভীতির উল্লেখ রয়েছে এবং তার জন্যে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে সেটাই বড় পাপ। সে পাপকে দীন থেকে খারিজ করে দেবার পাপ বলা হয়েছে। হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের পাপকেই কবীরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন, সে পাপগুলো অনাচার সৃষ্টির ব্যাপারে কবীরা গুনাহর পর্যায়ের কিংবা, তার চেয়েও বেশি। যেমন তিনি বলেন, যখন কোনো ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানদার থাকে না –আল হাদীস। এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এ ধরনের কাজ প্রচণ্ড জৈবিক তাড়না কিংবা হিংস্র প্রবণতার প্রাধান্য লাভ থেকে সৃষ্টি হয়। বস্তুত, তখন তার বিবেক ও মানবতা লোপ পায়। ফলে তার যেন ঈমানই চলে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, এ পাপটি কবীরা গুনাহর অন্যতম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর মুঠোয় আমার জীবন। যদি কোনো ইয়াহুদি কিংবা নাসারা এ উম্মত থেকে এ 'দ্বীন ইসলাম' শুনতে পায় ও যে দ্বীন নিয়ে আমি অবতীর্ণ হয়েছি তা কবুল না করেই মারা যায়, তা হলে সে জাহান্নামী।

আমি বলছি, তার অর্থ এই যে, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পরও কুফরী আঁকড়ে থাকবে, সে দোযখে যাবে। কেননা সেটা বান্দার জন্যে আল্লাহ পাকের বিধি ব্যবস্থা ভঙ্গ করা বৈ নয় এবং সে নিজের ওপর আল্লাহ পাক ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের অভিশাপ ডেকে নিল। পরন্তু সে মুক্তি লাভের পথ থেকে বিচ্যুত হলো।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ সে কখনো ঈমানদার নয় যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সব লোক থেকে বেশি প্রিয় হব। তিনি এও বলেন ঃ এমনকি তার প্রবৃত্তি তার অনুগত হয় যা আমি নিয়ে এসেছি। অর্থাৎ তখনই সে কেবল ঈমানদার হতে পারে।

আমি বলছি, পরিপূর্ণ ঈমান হচ্ছে প্রকৃতির ওপর বিবেক বুদ্ধির প্রাধান্য লাভ। এমনকি বাহ্যিক কার্যকলাপে প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর বিবেকের চাহিদা তার কাছে উত্তম হয়ে দেখা দেবে, আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসার ব্যাপারটিও অনুরূপ। আমি নিজের জীবনের কসম খেয়ে বলছি, কামেল মোমেনদের ভেতর এ অবস্থাটি সর্বদা বিরাজ করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তি আরজ করল– হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের ব্যাপারে আমাকে এমন একটা কথা বলে দিন যেন আপনার পরে আমাকে আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়। এক

বর্ণনায় আছে, আপনি ছাড়া যেন অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি বললেন– বল, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, অতঃপর এর ওপর দৃঢ় হয়ে থাক।

আমি বলছি, তার অর্থ এই যে, মানুষ সর্বদা তার নজরে আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলামের অনুসরণকে প্রতিভাত রাখবে এবং তদনুসারে কাজ করে যাবে ও তার বিপরীত কার্যকলাপ বর্জন করবে। এটা একটা সামগ্রিক মূলনীতি। এর মাধ্যমে মানুষের ভেতর বিভিন্ন শরীআত সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হয়। সবিস্তার জ্ঞান অর্জিত না হলেও সামষ্টিক জ্ঞান অবশ্যই অর্জিত হবে, মানুষকে এগিয়ে যাবার যোগ্যতা দান করবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সরল অন্তকরণে এ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল' আল্লাহ পাক তার জন্যে আগুন হারাম করে দেবেন। এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন– যদি সে জেনাও করে থাকে এবং চুরিও করে থাকে। তিনি এও বলেন ঃ সে যে কাজই করে থাক না কেন।

আমি বলছি, উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে সেই কঠিন ও স্থায়ী আগুন হারাম করবেন যা তিনি কাফেরের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন, এমনকি যদি সে কবীরা গুনাহও করে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির ভেতর এ রহস্য নিহিত রয়েছে যে, পাপের বিভিন্ন স্তরের ভেতর সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যদিও সামগ্রিক অর্থে সবই পাপ।

বস্তুত কুফরের সাথে যখন কবীরা গুনাহের তুলনা করা হয়, তখন কবীরা গুনাহের তেমন গুরুত্ব ও মান থাকে না, না তার কোনো মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব পরিজ্ঞাত হয়, আর না তা স্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনি কবীরা গুনাহের তুলনায় সগীরা গুনাহের অবস্থা। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের পার্থক্য পাকাপাকি ভাবে বলে দিয়েছেন যা ব্যাধি ও সুস্থতার সাথে তুলনীয়। যদি কখনো কুষ্ঠ রোগের মোকাবেলায় সর্দি ও অবসন্নতার তুলনা হয় তা হলে সর্দি ও ক্লান্তিকে সুস্থতা বলে ঘোষণা করা যায়। তখন আর সে সর্দির রোগীকে রুগী বলা যাবে না। শুধু এতটুকু বলা হবে, তার স্বাস্থ্যগত কিছুটা অসুবিধা রয়েছে।

তেমনি কিছু বিপদ এমন রয়েছে যা অন্যান্য বিপদকে ভুলিয়ে দেয়। যেমন কারো পায়ে কাঁটা বিঁধল। তারপর যদি তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ লুট

হয়ে যায়, তখন সে বলে, এর আগে আমার ওপর আর কোনো বিপদ দেখা দেয়নি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শয়তান পানির ওপর আসন পাতে। তারপর সে তার চেলাচামুণ্ডাদের চারদিকে পাঠায়। তারা লোকদের বিপদে ফেলে। –আল হাদীস।

জানা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা শয়তানদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার স্বভাবই হচ্ছে নাফরমানীর স্বভাব। এক ধরনের পোকা যেরূপ তার স্বভাব মোতাবেক কাজ করে চলে যেমন নর্দমার কীট নোংরা পানিতে সাঁতরে বেড়ায়, শয়তানও নাফরমানীর কাজে ছুটাছুটি করে বেড়ায়। তাদের একজন সর্দার থাকে। তার আসন থাকে পানির ওপর। সে তার চেলাচামুণ্ডদের শয়তানী কাজের যে পরিকল্পনাটি তার সামনে থাকে পূর্ণতা সম্পাদনের জন্যে ডেকে থাকে। এর ফলে সে তার দুর্ভাগ্য ও বিভ্রান্তিকে পরিপূর্ণতা দান করে।

প্রত্যেক জাতি ও প্রজাতির ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের এ রীতিই চলতে থাকে এবং তাতে কোনো ব্যত্যয় দেখা দেয় না। আমার কাছে এ ব্যাপারগুরো এতই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব যে, আমি যেন তা স্বচক্ষে অবলোকন করছি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপের মুসলমানরা তার উপাসনা করবে। অবশ্য সে তাদের পারস্পরিক শত্রুতার ব্যাপারে হতাশ হয়নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন– 'এটাই সুস্পষ্ট ঈমান।'

জেনে রাখুন, শয়তানের কুমন্ত্রণা ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়। যে লোক যে ধরনের তাকে সেই ধরনের কুমন্ত্রণা দেয়া হয়। বস্তুতঃ শয়তানের কুমন্ত্রণার শ্রেষ্ঠতম ফসল হলো কুফরে লিপ্ত হওয়া ও দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যদি কেউ ঈমানী দৃঢ়তার বরকতে আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে যায় তো অর প্রভাব ভিন্নভাবে দেখা দেয়। তা হচ্ছে পারস্পরিক লড়াই, রাষ্ট্র ও পরিবারে ঝগড়া ফাসাদ ও ব্যক্তি বা দলগত শত্রুতা সৃষ্টি। যখন আল্লাহ তাআলা সেরূপ প্রভাব থেকেও বাঁচিয়ে রাখেন, তখন সে প্রভাব শুধু ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে দুর্বলভাবে আনাগোনা করে। তার ফলে কেউ মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না, তাই তা ক্ষতিকর নয়। পক্ষান্তরে সে প্রভাবকে যদি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় তা হলে তা সুস্পষ্ট ঈমানের দলীল হয়ে দাঁড়ায়। তবে হ্যাঁ, পুণ্যাত্মা লোকদের ধারে কাছেও কুমন্ত্রণা পৌছতে পারে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেন ঃ জেনে

রাখ, আল্লাহ পাক আমাকে তার ওপর প্রাধান্য লাভে সহায়তা করেছেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে। এখন সে আমাকে শুধু ভালো কথাই বলে।

শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাব যেন সূর্য কিরণ। তা যেভাবে লোহা ও জং ধরার পদার্থের ওপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, অন্যান্য পদার্থের ওপর সেভাবে করে না। তার প্রভাবও বস্তু বিশেষে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শয়তানের যেমন এক প্রভাব এবং তেমনি ফেরেশতারও এক প্রভার দেখা দেয়– আল হাদীস। এর সার কথা হচ্ছে এই যে, ভালো কাজে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির প্রেরণারূপে ফেরেশতার প্রভাব দেখা দেয় এবং নেককাজে বিরাগ ও অনীহা সৃষ্টির প্রেরণা শয়তানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শয়তানের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি সেরূপ কোনো কিছু টের পায়, তার উচিত একথা বলা যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। তিনি আরও বলেন যে, 'সে যেন আউজুবিল্লাহ পড়ে ও বাম দিকে থুক মারে।'

এসব হাদীসের রহস্য এই যে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাঁকে স্মরণ করা ও শয়তানী প্রেরণাকে খারাপ ভাবা ও শয়তানকে লাঞ্ছিত করার ফলে নফসের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় ও শয়তানের প্রভাব কবুলের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ পাক তাই বলেন ঃ "যারা মুত্তাকী তাদের যখন শয়তানের কোনো দল স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে ফলে তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'হযরত আদম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সামনে বহাস করেছেন।' আমি বলছি, 'তাদের প্রভুর সামনে' বাক্যাংশের তাৎপর্য এই যে, মূসা (আঃ)-এর রূহ হাযিরাতুল কুদসীর আকর্ষণে পুণ্যাত্মাদের পুণ্য মজলিসে উপনীত হলে সেখানে হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মার সাথে সাক্ষাত হয়। এ ঘটনার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-এর জবানের মাধ্যমে মূসা (আঃ)-কে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করলেন। যেভাবে নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে কোনো ফেরেশতা বা পুণ্যাত্মাকে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে ও কথাবার্তা বলে, এমনকি তার মাধ্যমে সে এমন কিছু জানতে পায় যা অন্যের জানা নেই, এও অনেকটা তেমনি ব্যাপার। এক্ষেত্রে এমন একটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের ব্যাপার ছিল যা মূসা (আঃ)-এর

জানা ছিল না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁকে সেই গুপ্ত জ্ঞানটি অবহিত করলেন। আর তা হচ্ছে এই যে, এ ঘটনার ভেতর দুটো ব্যাপারের সমন্বয় ঘটেছে।

১। একটি ব্যাপার সংশ্লিষ্ট ছিল হযরত আদম (আঃ)-এর ব্যক্তি সত্তার সাথে। তা হলো এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষটির ফল খাননি ততক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর পিপাসা লাগত, না তাপ অনুভূত হতো, না ক্ষুধা পেত আর না তিনি নগ্ন হতেন। তিনি ছিলেন ঠিক ফেরেশতার মতোই। তারপর যখন তিনি সেই বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তার ভেতরে জৈবিক চেতনা প্রবল হলো এবং ফেরেশতার স্বভাব দুর্বল ও সুপ্ত হলো। এখানে এটা আবশ্যিক হয়ে দেখা দিল যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে কিছু খাওয়া পাপ এবং তার জন্যে তওবা করা অপরিহার্য।

২। দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো আদম সৃষ্টির সামগ্রিক উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ পাক জগৎ সৃষ্টির সময়ে সে ব্যাপারটিকেই সামনে রেখেছেন। তাই আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি ফেরেশতাদের তা জানিয়ে দিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করতে গিয়ে এ ইচ্ছা পোষণ করেন যে, মানব জাতি পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হবেন। তাদের থেকে কখনো পাপ প্রকাশ পাবে এবং তারা ক্ষমা চাইবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা করে দেবেন। তাদের ভেতর বাধ্যবাধকতা ও আনুগত্য, নবী প্রেরণ, পুরস্কার, শাস্তি, পথ প্রাপ্তি ও বিভ্রান্তির বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু ও স্তরবিন্যাস করা হবে। ফলে তারা স্বতন্ত্র এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াবে। মূলত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ আল্লাহ পাকের হেকমত অনুসারেই দেখা দিয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের থেকে পাপ প্রকাশ না পেত তা হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিলুপ্ত করে অন্য এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করে ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।

হযরত আদম (আঃ) পয়লা ব্যক্তি যার ওপর জৈবিক তাড়না জয়ী হয়। ফলে তার দ্বিতীয় জ্ঞান লোপ পেল এবং তার আদিমরূপ প্রকাশ পেল। এ কারণে তিনি কঠোর ভর্ৎসনা শুনলেন। অতঃপর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন এবং তার দ্বিতীয় জ্ঞান পুনরায় চমকিত হলো তারপর যখন তিনি পুণ্যাত্মাদের মজলিসে ফিরে এলেন, তখন মূল ব্যাপারটি তিনি ভালোভাবে অবহিত হলেন। হযরত আদম (আঃ) পয়লা যে ধারণা পোষণ করেছিলেন, হযরত মূসা (আঃ)ও সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে বহাসে লিপ্ত হয়েছিলেন। অবশেষে হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপরেও দ্বিতীয় জ্ঞানের চমক দেখা দিল।

আমি আগেই বলেছি, স্বপ্নের যেরূপ ব্যাখ্যা হয়, তেমনি বাহ্যিক ঘটনাবলিরও ব্যাখ্যা হয়। কোনো বিধিনিষেধই হাওয়ার ওপর হয় না। তার পেছনে এমন কার্যকারণ থাকে যা সেটাকে অপরিহার্য করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক শিশু স্বাভাবিক ধর্মের ওপর জন্ম নেয়। অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াহুদি বানিয়ে নেয়, খ্রিষ্টান বানিয়ে নেয়, কিংবা মজুসী বানিয়ে নেয়। যেমন পশুর প্রতিটি বাচ্চা স্বাভাবিক অবয়ব নিয়ে জন্ম নেয়। তোমরা কি সেটাকে নাক কান কাটা অবস্থায় দেখতে পাও?

আমি বলছি, জেনে নাও যে, আল্লাহ তাআলার চিরন্তর রীতি এটাই যে, তিনি জীব-জানোয়ার ও গাছপালার প্রতিটি শ্রেণীকে এক একটি বিশেষ রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেন। যেমন মানুষকে তিনি বিশেষ এক আকৃতি দান করেছেন। তাদের চামড়া মসৃণ ও স্বচ্ছ। তাদের আকৃতি সোজা ও নখ চেপ্টা। সে কথা বলে, হাসে। এ সব বৈশিষ্ট্য থেকে জানা যায় সে মানুষ। তবে হাঁ, এর ব্যতিক্রম যে আদৌ নেই তা নয়, তবে তা এতই নগণ্য যে ধর্তব্য নয়। যেমন কখনো কোথাও এমন বাচ্চা জন্ম নিল যার শূঁড় অথবা খুরা দেখা গেল।

তেমনি আল্লাহ পাকের এটাও এক স্থায়ী রীতি যে, প্রত্যেক শ্রেণীকে তিনি সীমিত ও স্বল্প পরিমাণের প্রয়োজনীয় অনুভূতি ও উপলব্ধি দান করেছেন এবং সেটা সেই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো জীবের ভেতর তা অনুপস্থিত। তা ছাড়া বিশেষ শ্রেণীর নির্দিষ্ট অনুভূতি ও উপলব্ধি তাদের সবার ভেতরেই সমানে পাওয়া যায়। বস্তুত, মৌমাছিকে নির্দিষ্টভাবে এ উপলব্ধি দান করা হয়েছে যে, সে তার কাজের উপযোগী একটা গাছ খুঁজে বের করবে। তারপর তাতে বাসা বাঁধবে ও তাতে মধু জমা করবে। তুমি দেখতে পাবে, প্রতিটি মৌমাছির ভেতরেই এ উপলব্ধিটি বিদ্যমান। তেমনি কবুতরকে বিশেষভাবে এ উপলব্ধি দান করা হয়েছে যে, কিভাবে বাচ্চাদের আহার খাওয়াবে।

ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ প্রকৃতিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি ছাড়া বিশেষভাবে অতিরিক্ত এক উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ এক বুদ্ধি দান করেছেন। তার ভেতর স্রষ্টার পরিচিতি ও তাঁর উপাসনার জ্ঞান ও উপলব্ধি বিদ্যমান। পরন্তু তার জীবন জীবিকার জন্যে যে সব ব্যবস্থা নিতে হবে তাও তার স্বভাবগত উপলব্ধি ও জ্ঞানে নিহিত রয়েছে। এটাই প্রকৃতির ধর্ম বা ফিত্‌রাত। যদি তার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় তা হলে জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার ওপরেই সে থাকতে পারে। অবশ্য কখনো প্রতিবন্ধকতা এসে যায়। যেমন বাপ-মা বিভ্রান্ত

করে। তখন তার স্বাভাবিক জ্ঞান মূর্খতায় পর্যবসিত হয়। যেমন সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন পন্থায় নারীর যৌন প্রেরণা ও ক্ষুধার তাড়না বিলুপ্ত করে থাকে। অথচ এদুটো ব্যাপার মানুষের জন্মগত স্বভাব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাদের পিতার পৃষ্ঠকোষে থাকতেই স্বভাবজাত ধর্মের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, তখন তারা তাদের পূর্বপুরুষের স্বভাবে নিহিত ছিল। তিনি এও বলেন, তারা কে কি কাজ করার লোক ছিল তাও আল্লাহ পাক ভালোভাবে জানতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দীর্ঘ স্বপ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আদম সন্তানদের সব আত্মা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট অবস্থান করে।

জেনে রাখ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ হয় যে, শিশু সহজাত প্রকৃতির ওপর জন্ম নেয়। আগেই তা বলা হয়েছে। তবে কখনো তার জন্মই এমন হয় যে, কোনো আমল ছাড়াই অভিশাপযোগ্য হয়। যেমন খিজির (আঃ) যে ছেলেটিকে হত্যা করলেন সে। কারণ– তার ওপরে কাফির সীল মারা ছিল।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন সে তার পূর্বপুরুষের স্বভাবে ছিল। তার তাৎপর্য পার্থিব ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ, শরীআত কখনো না জানার অজুহাতে চুপ থাকে না। বরং কখনো তা এ জন্যে চুপ থাকে যে, প্রকাশ্য মানদণ্ডের অভাবে বিধান নির্ধারিত হয় না। অথবা এ জন্যে চুপ থাকে যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথবা এ জন্যে কোনো ব্যাপার এড়িয়ে যায় যে, শ্রোতারা তা বুঝবে না।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাকের হাতেই মানদণ্ড রয়েছে। তিনি যাকে চান নিচে ফেলেন আর যাকে চান ওপরে তোলেন।

আমি বলছি, এ বক্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে তদবীরের দিকে। কারণ, তদবীরের ভিত্তিই হলো সবচাইতে কল্যাণকর ব্যবস্থার অনুসরণ। কারণ, যে কোনো ঘটনায় যখন কোনো পরস্পরবিরোধী কারণ দেখা দেয় তখন আল্লাহ তাআলা ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালাই প্রদান করেন। আল্লাহ পাকের ফরমানও তাই বলছে, 'তিনি প্রতিদিন কোনো এক কাজে রয়েছেন।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী আদমের অন্তরগুলো আল্লাহ পাকের দু'আঙুলের মাঝে রয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, অন্তরের অবস্থা হলো বিরান ময়দানে পড়ে থাকা এক পালকের মতো। বাতাস তাকে উল্টাতে পাল্টাতে থাকে।

আমি বলছি, বান্দার কাজ তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু তার ইচ্ছার ওপর তার কোনো হাত নেই। তার উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি কাউকে পাথর মারতে চাইল। যদি লোকটি জ্ঞানসম্পন্ন ও বিজ্ঞ হয় যে, সে পাথরের ভেতর শক্তি সৃষ্টি করে দেয় এবং পাথরটি নিজে ফিরে সে কাজটি করে। সেক্ষেত্রে এ প্রশ্ন কেউ তোলে না যে, বান্দাদের তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এবং তার ইচ্ছাটাও তার গড়া। এখন লোকটাকে শাস্তি দেয়া হবে কেন? (এটা এ কারণে যে, সে খোদাদত্ত ইচ্ছা ও শক্তির অপব্যবহার করেছে।) মূলত প্রতিফল দানের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ পাকের কিছু কাজ তার অন্য কিছু কাজের উপর বিন্যস্ত হয়। মানে, আল্লাহ্ তাআলা বান্দার ভেতর এ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাকের হেকমতের এ চাহিদা দেখা দিল যে, তিনি তাঁর বান্দাদের ভেতর পুরস্কার ও শাস্তি দানের আরেকটি অবস্থা সৃষ্টি করবেন। যেমন তিনি পানিতে উত্তাপ সৃষ্টি করেন এবং তাপের দাবি এটাই হয় যে, সেটাকে হাওয়ায় রূপান্তরিত করবে। বান্দার জন্যে যে ইচ্ছা ও চেষ্টাকে শর্ত করা হয়েছে, সেটা মৌলিক নয় বরং যৌগিক। তার কারণ এই যে, বাঙময় সত্তা কখনো সেই কাজের রঙ মেনে নেয় না যা সে নিজে করে না বরং অন্যের কাজ হয়। অথবা এমন কাজের রঙও মেনে নেয় না যা স্বেচ্ছায় করে না। তা ছাড়া আল্লাহ্ পাকের হেকমতেরও খেলাপ যে, তিনি তার বান্দাদের এমন কাজের জন্যে শাস্তি দেবেন, যার রঙ তার বান্দার বাঙময় সত্তা গ্রহণ করেনি।

ব্যাপার যখন এই, তখন শরীআতে পরাধীন ইচ্ছাই যথেষ্ট, যখন সে সেই কাজের রঙ মেনে নেয়ার যোগ্য হয়। শরীআতে পরাধীন প্রচেষ্টাও শর্ত হবার প্রশ্নে যথেষ্ট। যখন সে উপার্জন এটা প্রমাণ করে যে, এ পরবর্তী অবস্থাটি বিশেষত সেই বান্দার ভেতরেই সৃষ্টি হওয়া চাই, অন্য কারো ভেতরে নয়। এটাই উত্তম বিশ্লেষণ। সাহাবা ও তাবেঈনদের বক্তব্য থেকে এটাই বুঝা যায়। তাই ব্যাপারটি ভালোভাবেই স্মরণ রাখবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকূলকে অন্ধকারের ভেতর সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের ওপর নিজ নূরের আলো বর্ষণ করেছেন। যার ভাগ্যে সে নূরের অংশ জুটেছে সে পথপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যে লোক সেই নূর থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাই আমি বলে থাকি, আল্লাহর ইলমের ওপর কলমের কালি শেষ হয়ে গেছে।

এ কথার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা লোকদের সৃষ্টির আগেই জেনে

ফেলেছেন যে, তারা মানুষ হিসেবে পূর্ণতা নিয়ে জন্মিবে না। তাই তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে রাসূল পাঠাতে হবে ও কিতাব নাযিল করতে হবে। এর ফলে কিছু লোক পথ পাবে আর কিছু লোক পথহারা থেকে যাবে। আল্লাহ তাআলা শুরুতেই এসব ধারণা করে নিয়েছিলেন। তবে আপনা থেকেই তিনি যা জ্ঞাত ছিলেন তা এরও আগের ব্যাপার। নবী পাঠিয়ে তিনি যে সবিস্তারে সব কিছু জানতে পেলেন তারও বহু আগে তিনি মোটামুটি ব্যাপারগুলো জ্ঞাত ছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, "আমি যাকে খাওয়াব সে ছাড়া তোমরা সবাই ভুখা থাকবে আর আমি যাদের পথ দেখাব তারা ছাড়া তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট।"

আমি বলছি, এটা এমন এক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে যা বনী আদম সৃষ্টির আদিপূর্বে ঘটিত হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার ব্যাপারে এ ফয়সালা করেন যে, অমুক স্থানে সে মারা যাবে, তখন তার সেখানে যাবার এক প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।"

আমি বলছি, এর ভেতরে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বেশ কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনা এ জন্যে সৃষ্টি হয় যাতে কার্যকরণের রীতিনীতি ধ্বংস না হয়ে রক্ষা পায়। এ ক্ষেত্রে যদি তার কোনো প্রয়োজন দেখা নাও দিত তবু তার অন্তরে আপনা থেকে সেখানে যাবার প্রবণতা সৃষ্টি হতো অথবা আল্লাহ পাক অন্য কোনো উপায় সৃষ্টি করে তার ফয়সালার বাস্তবায়ন ঘটাতেন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকূলের ভাগ্যলিপি রচিত হয়েছে। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর।

আমি বলছি, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের ভেতর প্রথম সৃষ্টি করেন আরশ ও পানি। তারপর যা যা হওয়ার তিনি ইচ্ছা করেছেন সেগুলো আরশে সংরক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় এক এক পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ভাষায় তা পরিকল্পনা ও ঐশী ভাষায় তা জিকর বা স্মরণ। ইমাম গাজ্জালী সেটাই বলেছেন।

আমার এ অভিমত হাদীস বিরোধী নয়। তাই তা কখনো ভাবা উচিত নয়। কারণ হাদীসের বিজ্ঞ আলেমদের নিকট কলম ও লাওহে মাহফুজ আগে সৃষ্টি হওয়ার বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। যদিও সাধারণ মানুষের ভেতর এটা সুপ্রচলিত বর্ণনা। নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়নি। সাধারণ মানুষ যা বলে

বেড়ায় তা ইসরাঈলী কাহিনী মাত্র। তা আদৌ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস নয়। পরবর্তী কালের কিছু গবেষক আলেম নগণ্য সূত্রের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন বটে। কিন্তু পূর্বসূরিদের এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য বর্ণিত হয়নি।

সারকথা এই যে, আরশে সৃষ্টিকুলের সব পরিকল্পনা ও রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছিল। সেটাকেই 'কিতাব' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটা মূলত রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান নির্ধারণ ও অপরিহার্যকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার ভিত্তি থেকে সৃষ্ট। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমাদের ওপর রোযা লিপিবদ্ধ করা হলো।' কিংবা 'তোমাদের ওপর লিপিবদ্ধ করা হলো যখন তোমাদের মৃত্যু হাজির হয়, অসিয়াত করা।' তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার ওপর তার জেনার অংশের কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন।' এক সাহাবী বলেন, 'আমি অমুক যুদ্ধে এভাবে এভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছি।' অথচ এ ক্ষেত্রে কিতাবের কোনো ব্যাপারই নেই। এটা কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর বক্তব্য। আরব কবিদের কবিতায়ও এ ধরনের পরিভাষা ব্যবহারের ভুরিভুরি নজির রয়েছে।

তারপর 'পঞ্চাশ হাজার বছর' এর উল্লেখ নির্ধারিত সময়ের অর্থেও হতে পারে। তা আবার দীর্ঘকালের অনির্ধারিত অর্থেও হতে পারে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁর পিঠে হাত বুলালেন ইত্যাদি।

আমি বলছি ঃ এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন গোটা মানবজাতির পিতারূপে। তাই তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশে ভাবী সন্তানদের মৌলসত্তা লেপ্টে দিলেন। তারপর আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক পর্যায়ক্রমে তা অস্তিত্ব লাভ করে চলল এবং কে কখন অস্তিত্ব নেবে তাও আল্লাহর জানা ছিল। সেটা তিনি আদম (আঃ)-কে প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে দেখিয়ে ও জানিয়ে দিলেন। আদম সন্তানদের নেককারী ও বদকারীকে তিনি আলো ও আঁধারের রূপ দিয়ে প্রকাশ করলেন। তাদের স্বভাবে যে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ছিল তা তিনি প্রশ্নোত্তর ও নিজেদের ওপর দায়িত্ব আরোপের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। বস্তুত তাদের মূল যোগ্যতার ভিত্তিতেই তাদের জবাবদিহি করা হবে। বাহ্যত এ জবাবদিহিতা তাদের যোগ্যতার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেকটি মানুষের মৌল উপাদান তার মায়ের পেটে (চল্লিশদিন পর্যন্ত) জমা হতে থাকে। —আল হাদীস

আমি বলছি, এ সময়ে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ও রূপগ্রহণ চলতে থাকে। হঠাৎ একসাথে সব গড়ে যায় না। প্রত্যেকটি স্তরের পরিবর্তিত রূপ পূর্বস্তর থেকে ভিন্নতর হয়। যে অবস্থাটি রক্তের মতো ক্ষিপ্রতা নিয়ে সঞ্চালিত হয় না সেটাকে 'নোত্‌ফা' বলে। যে অবস্থায় দুর্বলভাবে হলেও জমাটবদ্ধতা সৃষ্টি হয় সেটাকে 'আলাকা' বলে। পরবর্তী স্তরে যখন মজবুত জমাটবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তখন তার নাম হয় 'মুযগাহ্'। অবশ্য এ স্তরে নরম নরম হাড় সৃষ্টি হয়। যেমন যখন কোনো খেজুরের বিচি মাটিতে ফেলা হয়, তখন তার অঙ্কুরোদগমের জন্যে নির্দিষ্ট একটি সময় থাকে। যে ব্যক্তি খেজুরের বিচি থেকে অংকুরোদগম ঘটিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সে জানে, কখন কোন মাটিতে কিরূপ পানি সিঞ্চনে তা ঘটে থাকে। তাই সে বলতে পারে কোন বিচিতে কিরূপ গাছ ধরবে কি ধরবে না।

তেমনি আল্লাহ তাআলা কিছু ফেরেশতাকে বাচ্চাদের অবস্থা তাদের স্বভাবের গতিপ্রকৃতি সহ জানবার কিছুটা ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা জানতে পায়, কোন বাচ্চাটি কিরূপ স্বভাব নিয়ে জন্ম নিচ্ছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার ঠাঁই দোযখে হবে না বেহেশতে হবে তা লেখা হয়নি।

আমি বলছি, প্রতিটি মানুষের ভেতরে সাফল্য ও বিচ্যুতি রয়েছে যার জন্যে সে ছাওয়াব ও আজাব দুটোই পাবে। হয়ত হাদীসের এ অর্থও হতে পারে যে, কারো স্থান দোযখে হবে, কারো স্থান বেহেশতে হবে।

আল্লাহর তাআলা বলেন ঃ "যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের প্রতিশ্রুতি দিলেন", এ আয়াত উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। "অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত আদমের পিঠে বুলালেন। তার থেকে তার সন্তানদের বের করলেন।" এ সবের তাৎপর্য এই যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে তাঁর সন্তানদের এবং সেই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদের ও এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তানদের অস্তিত্ব লাভের ধারা অব্যাহত থাকবে। মূলত কুরআন মজীদে কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসে তার উপসংহার টানা হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেন, 'যে ব্যক্তি দান করল ও তাকওয়া গ্রহণ করল এবং ভালো কাজকে স্বীকৃতি দিল' অর্থাৎ আমার জানা ও ধারণামতে যারা এ সব গুণের অধিকারী হলো, তাদের জন্যে দুনিয়ায় এ সব কাজ করা সহজ করে দেব। আয়াতের এ ব্যাখ্যার সাথে হাদীসের বক্তব্যের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ আর ব্যক্তিসত্তা সৃষ্টি করে সেটাকে যথাযথ রূপ দিয়েছি। তারপর তাকে বুঝ দিয়েছি পাপাচরণ ও পরহেজগারীর। আমি বলছি– এখানে এলহাম শব্দের অর্থ হচ্ছে তার সামনে পাপাচার ও পরহেজগারী রূপ তুলে ধরব। ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে। হাদীসটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মূলত এলহাম অর্থ হচ্ছে কারো জ্ঞানজগতে কোনোকিছুর রূপ এমনভাবে চিত্রিত করা যা তাকে সে ব্যাপারে জ্ঞানী কার দেয়। অতঃপর সেটাকে সামগ্রিক রূপ বলে বর্ণনা করা হয় যা থেকে বস্তুটির প্রকাশ ও প্রভাব শুরু হয়। তা থেকে কেউ জ্ঞান অর্জন করতে পারুক বা না পারুক। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকৃতির সব ধরন সম্পর্কেই সতর্ক করেছেন এবং সবগুলোই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। এমনকি নিজ উম্মতকে তা থেকে বিরত থাকার জন্যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।

বস্তুত দ্বীন থেকে উদাসীন হবার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সুন্নতের অনুসরণকে বর্জন করা। এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আমার আগে আল্লাহ তাআলা যে নবীকেই তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছেন, সেই জাতির একদল লোক তাঁর সহায়ক ও সাথী হয়েছেন। তারা তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করতেন ও তাঁর নির্দেশ হুবহু মেনে চলতেন। অতঃপর পরবর্তী স্তরে এমন একদল লোক এল যারা যা বলত তা তারা করত না আর যা করত তা তারা বলত না। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে যারা হাত দিয়ে জেহাদ করেছে তারা মোমেন, যারা জিহ্বা দ্বারা জেহাদ করেছে তারা মোমেন, যারা অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ধারণা পোষণ করেছেন তারাও মোমেন এবং এটাও যারা করেনি তাদের অন্তরে তিলমাত্র ঈমান নেই।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের কাউকে এমন না পাই যে, সে গের্দায় হেলান দিয়ে বসে আছে আর তার কাছে আমার কোনো নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌছেছে, অথচ সে বলে দিচ্ছে, এ সবের আমি কিছুই জানিনা, আমি তো আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি তা অনুসরণ করছি এবং এটাই যথেষ্ট।

এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের জন্যে যথেষ্ট তাকিদ দিয়েছেন। বিশেষত যখন এ নিয়ে মানুষের ভেতরে মতভেদ দেখা দেয় তখন সুন্নত অনুসরণ জরুরি হয়ে যায়।

দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিজেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করো না। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের ওপর কঠোরতা চাপাবেন।'

একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সহ একদল সাহাবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত ইবাদতকে কম ভেবে আরও কঠোর ইবাদতের অভিলাষী হলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

গভীর চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "লোকদের কি হলো যে, আমি যা করি তা তারা পরিহার করে চলছে। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ইল্‌ম সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি পরিজ্ঞাত এবং আমিই তাকে বেশি ভয় করি।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'হেদায়েত পেয়ে যে জাতিই পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের ভেতরেই বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দিয়েছে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'তোমাদের পার্থিব ব্যাপারে তোমরা বেশি জান। ইসলামের সাথে অন্য ধর্ম মতের সংমিশ্রণ সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করেছেন যে সাহাবী ইয়াহুদিদের কিতাব ও ইল্‌ম নিয়ে গবেষণা করতে চেয়েছিলেন, তাকে তিনি বলেন ঃ তোমরা কি সেভাবেই এদিক ওদিক ধাক্কা খেয়ে ফিরতে চাও যেভাবে ইয়াহুদি-নাসারারা ফিরছে? আমি তো তোমাদের সামনে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দ্বীন নিয়ে এসেছি। যদি মূসা (আঃ)ও জীবিত থাকতেন, তা হলে আমার আনুগত্য ছাড়া তাঁরও উপায় থাকত না।'

যে ব্যক্তি ইসলামের ভেতর জাহেলিয়াতের রীতিনীতি চালু করতে চায় তার ব্যাপারে তিনি আরও কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেছেন। তাঁর কাছে সেটা ছিল সর্বাধিক ক্রোধ সঞ্চারক। 'ইস্তিসান' কিতাবে রয়েছে যে, সে ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কিছু আবিষ্কার ও চালু করল, সে প্রত্যাখ্যাত।

ফেরেশতারা যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সেই ব্যক্তির সাথে উপমা দিয়েছেন যে ব্যক্তি ঘর তৈরি করে দস্তরখানা বিছিয়ে লোকদের খানা খাবার জন্যে ডাকছেন, তার তাৎপর্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই, তাঁরা এর মাধ্যমে লোকদের ওপর এ দ্বীন কবুল করা আর না করার দায়-দায়িত্ব

চাপিয়েছেন। একটা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তাঁরা একটি তাত্ত্বিক ব্যাপারে পুরোপুরি শিক্ষাদান করলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি যে আগুন জ্বালাল, ইত্যাদি –আল হাদীস। অন্যত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমার উদাহরণ আর আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি ও তার কথা যে লোক এক জাতির কাছে এল এবং বলল– হে জাতি! আমি একদল সৈন্যকে নিজ চোখে দেখতে পেয়েছি.. ইত্যাদি আল হাদীস। এটা এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, কিছু কিছু কাজ এমন আছে যে, রাসূল পাঠানোর আগেও সেগুলো আজাব লাভের উপযোগী।

অন্যত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম সহ পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হচ্ছে সেই প্রবল বর্ষণ যা কোনো ভূখণ্ডের ওপর পতিত হয়.....আল হাদীস। এ হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আলেম সম্প্রদায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেদায়েত দুপদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন।

১. সরাসরি বর্ণনা থেকে।

২. বর্ণনার প্রামাণ্য দিক থেকে।

তারা মাসয়ালা ইস্তিম্বাত করবে এবং নিজের ইস্তিম্বারাতকৃত কথাগুলো, মতগুলো লোকদের এমনভাবে জ্ঞাত করবে (যাতে লোকেরা তাতে আমল করতে সক্ষম হয়। এটাই মোজতাহেদীনদের হাকীকত।) অথবা শরীয়াতের বিধানের উপর আমল করতে সক্ষম হবে। এতে জনগণ তাদের দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে, হেদায়েত লাভ করবে। এ হাদীসে প্রথম থেকেই জাহেল, অজ্ঞদের তা গ্রহণ না করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণে রাসূল (সা) বলেছেন :

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ۔

"আমার সুন্নাত ও সৎপথপ্রাপ্ত-হেদায়েতপ্রাপ্ত, খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত পালন করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"

আমি বলছি যে, দ্বীনের শৃঙ্খলা আমাদের প্রিয়নবী (সা)-এর সুন্নাতের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। আর খেলাফতে কোবরা তথা রাষ্ট্রীয় খেলাফত পরিচালনা খোলাফায়ে রাশেদীনদের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। যে বিষয়ে

তারা তাদের ইজতিহাদের মাধ্যমে জীবন জীবিকা সংক্রান্ত কল্যাণকর দিকের ও জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে ও লেনদেন, কায়-কারবার, ব্যবসা চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত তা অনুসরণ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শরীয়তের খেলাফ হবে এবং শরীয়তের বিষয়ে নতুন উদ্ভাবন হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) লোকদের বুঝানোর উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ রেখা অংকন করলেন। অতঃপর বললেন ঃ "এটি আল্লাহর রাস্তা।" অতঃপর সে রেখার উভয় পার্শ্বে ডানে ও বামে কয়েকটি রেখা অংকন করলেন এবং বললেন, এগুলোও রাস্তা। এ রাস্তাগুলোর প্রত্যেকটিতে শয়তান অবস্থান করে সেদিকে ডাকছে, একথা বলে এ আয়াতে কারীমা পাঠ করলেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ -

"এটি আমার সরল সঠিক পথ, এর অনুসরণ কর। অন্যান্য পথগুলো অবলম্বন করো না, তা হলে তোমরা আমার পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

আমি বলি, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হচ্ছে তারা, যারা কিতাব, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাত তথা পবিত্র হাদীসকে পরিপূর্ণভাবে আকিদা-বিশ্বাসে ও আমলে-কর্মে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং সে পথে চলবে যে পথে জমহুর সাহাবা ও তাবেয়ীনগণ চলেছেন। যদিও যে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের প্রকাশ্য কোনো প্রসিদ্ধ প্রমাণ সেসব ব্যাপারে তারা দ্বিমত পোষণ করে থাকেন এবং দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সাহাবাদের মধ্যে কোনো ধরনের ঐকমত্য সৃষ্টি হয়নি। কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে কোনো কারণে প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে দ্বিমতের তথা মতভেদের সৃষ্টি হয়েও থাকে। অথবা কোনো সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েও থাকে। পক্ষান্তরে মুক্তি না পাওয়া দল হচ্ছে : যারা সালফে সালেহীনদের আকিদার বিপরীত কোনো আকিদা গ্রহণ করেছে বা এমন কোনো আমল করেছে যে আমল তাদের আমলের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

হুজুর (সা)-এর বাণী :

وَلَا تَجْتَمِعُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ عَلَى الضَّلَالَةِ

"এই উম্মত গোমরাহী-পথভ্রষ্টতার বিষয়ে ঐকমত্য হবে না।" হুজুর (সা)-এর বাণী :

يُبْعَثُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا ـ

"এ উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে আল্লাহ তায়ালা একজন মোজাদ্দেদ প্রেরণ করবেন যিনি তার দ্বীনকে তাজদীদ, সংস্কার করবেন।" অপর এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা রয়েছে –

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عدوله ـ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ ـ

এ দ্বীনের জ্ঞান পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরসূরি বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা বহন করবে। তারা তাদের প্রভাবশালী লোকদের বিকৃতি হতে তাকে রক্ষা করবে, বাতেল পন্থীদের বিভিন্ন দাবি হতেও জাহেলদের, মূর্খদের বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যা হতেও রক্ষা করবে।

জেনে রাখুন যে, মানুষ যখন দ্বীনের বিষয়ে ইখতেলাফ করল এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ বিবাদ বিসম্বাদ সম্প্রসারিত করল তখন তা মহান আল্লাহর দরবারে কষাঘাত করল, তখন মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন পথহারা মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। তাঁর মৃত্যুর পর এর গুরুত্ব হুবহু চলে যায় তার প্রদত্ত জ্ঞানের হেফাযত, সংরক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের প্রতি তখন তাদের মধ্যে প্রচলিত হয় ইলহামাত ও আল্লাহর নৈকট্যলাভ।

আল্লাহর ইচ্ছা হলো কেয়ামত পর্যন্ত লোকদের মাঝে দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। তখন প্রয়োজন দেখা দিল এমন এক উম্মতের যারা আল্লাহর দ্বীনকে হেফাজত, সংরক্ষণ করবে। তাদের সকলে কখনো ভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্য হবে না এবং তাদের মাঝে পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত থাকবে।

তাদের প্রস্তুতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের নিকট যা কিছু কিছু দ্বীন বিদ্যমান ছিল তা এ দ্বীনের সাথে মিলে গেল। তার সাথে সাথে কিছু পরিবর্তনও সাধিত হলো। আল্লাহর ইচ্ছা এ জাতীয় লোকদের অপেক্ষমাণ ছিল যারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, সীমা

লঙ্ঘনকারীদের পরিবর্তন বিদূরণের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিলেন। এর দ্বারা কঠোরতা ও গভীরভাবে গবেষণার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এবং বাতিল পূজারীদের মিথ্যা দাবি দূরকরণের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে অনুগ্রহ ও সুনজরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং এক জাতিকে অপর জাতির সাথে মিলিত করার প্রতি ও জাহেলদের অপব্যাখ্যা দূরীকরণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে অমনোযোগীতা এবং দুর্বল ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর নির্দেশকে ত্যাগ করার মানসিকতা ত্যাগ করার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

مَنْ يُّرِيْدَ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ـ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান দান করেন।"

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ ـ

"নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী।"

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ـ

"আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর যেমন তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। আমার মর্যাদাও এরূপ অপরাপর বাণীসমূহ।

জেনে রাখুন যে, যখন কোনো ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর দয়া হয় এবং তাকে আল্লাহ তার কার্যপ্রণালী পরিচালনার ক্ষেত্র নির্ধারণ করেন তখন তার প্রতি মেহেরবানী করা অত্যাবশ্যকীয় হয়। এবং তাকে ভালোবাসার- তার প্রতি মহব্বত করার, তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফিরিশতাদের প্রতি নির্দেশ জারি করা হয়। তখন তাকে জিবরাঈলের ভালোবাসা এবং দুনিয়াবাসীর তাকে গ্রহণ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

নবী করীম (সা) দুনিয়া হতে বিদায় নেবার পর নবুয়তের ইলমের বাহকদের এবং তার বর্ণনাকারীদের তা একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরকারীদের প্রতি বিশেষ করে এ গুরুভারোপ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে বেহিসাব কল্যাণ দান করলেন।

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِى فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا ـ

"আল্লাহ সে বান্দার মুখমণ্ডল চিরসবুজ করে রাখবেন যে আমার বাণী শুনল এবং তা যথাযথ সংরক্ষণ করল ও যেভাবে শুনল হুবহু সেভাবে পরবর্তীতের নিকট পৌঁছে দিল।"

আমি বলছি যে, এ মর্যাদা প্রদানের কারণ হলো, সে সব মোহাদ্দেছ নবী করীম (সা)-এর হেদায়াতকে সৃষ্টিজগতের নিকট পৌঁছে দিয়েছে এজন্য। নবী করীম (সা)-এর বাণী :

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল সে জাহান্নামে তার স্থান করে নিল।"

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ ـ

" শেষ জামানায় দাজ্জাল হবে, মিথ্যাবাদী হবে।"

আমি বলি যে, যখন পরবর্তী সময়ে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যম শুধুমাত্র রেওয়ায়েতই ছিল। আর যখন রেওয়ায়েতের মধ্যেই গণ্ডগোল দেখা দিল, তখন দৃঢ় সিদ্ধান্ত হলো যে, এর কোনো চিকিৎসা নেই। ফলে নবী করীম (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করাকে কবিরা গুনাহ বলা হলো এবং সাবধানতা অবলম্বন ওয়াজিব তথা অত্যাবশ্যকীয় হলো, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে। যাতে মিথ্যা হাদীস বর্ণিত না হয়।

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

حَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ ـ

"বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর, এতে কোনো দোষ নেই।"

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

لَا تُصَدِّقُوْاهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ ـ

"তাদেরকে সত্যবাদীও মনে করো না আবার তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বলো না।"

আমি বলতেছি যে, কোনো বিষয়ে বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের থেকে বর্ণনা করা যাবে। এবং সে সব ক্ষেত্রে যে সব ক্ষেত্রে দ্বীনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তা জায়েজ নেই।

এক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও জানা থাকা আবশ্যক তা হচ্ছে অধিকাংশ ইসরাঈলী বর্ণনা যা তাফসীর গ্রন্থসমূহে ঠেঁসে দেয়া হয়েছে ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বিবৃত করা হয়েছে ঐগুলো আহলে কিতাবদের আলেমদের থেকে বর্ণিত। শরীয়তের কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে বা আকিদাগত বিশ্বাসগত কোনো ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করা সঠিক হবে না। অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী :

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ. إِلَّا يُصِيْبُ بِهِ غَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোনো জ্ঞান লাভ করল, সে দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা দিলে কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।"

আমি বলছি যে, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলেম আহরণ করা হারাম এবং যে অসৎ উদ্দেশ্যে তা কাজে লাগাতে ইচ্ছুক তাকে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দেয়াও হারাম কয়েক দিক থেকে।

তন্মধ্যে : দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন হতে মুক্ত নয়, বাতেল, জটিল ও কঠিন ব্যাখ্যা দ্বারা। সুতরাং এ জাতীয় ছিদ্রগুলো বন্ধ করা ওয়াজিব- অত্যাবশ্যকীয়।

তন্মধ্যে : বেপরোয়াভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অবমাননা করা হবে।

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ. ثُمَّ كَتَمَهُ. أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ.

"যে ব্যক্তি কোনো দ্বীনি ইলেম শিক্ষা গ্রহণ করল ও সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা লুকিয়ে রাখল, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের শিকল পরানো হবে।"

আমি বলছি যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইলেমকে লুকিয়ে রাখা হারাম। কারণ তা আবমাননার জড় এবং শরীয়তের আহকাম ভোলার কারণ। আখেরাতের তথা পরকালের পুরস্কারসমূহ ও পারস্পরিক সম্বন্দের সাথে সম্পর্কিত। মুখে বলা হতে বিরত থাকাই যেহেতু গুনাহ। তার শাস্তি দেয়া হলো তাকে থামিয়ে দেয়া আর তা হবে আগুনের শিকল তথা লাগাম।

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ : اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ . اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ .

ইলেম তিন প্রকার : (১) আয়াতে মুহকামা (২) সুন্নাতে কায়েমা ও (৩) ফরিজায়ে আদেলা। এছাড়া যা কিছু রয়েছে তা বাড়তি বা অতিরিক্ত জ্ঞান।

আমি বলছি যে, এটা লোকদের জন্য যে জ্ঞানার্জন করা একান্তই কর্তব্য তাকে সীমিত ও সীমাবদ্ধকরণ। অতএব ওয়াজিব হলো– (ক) শাব্দিক দিক থেকে পবিত্র কুরআনকে জানা। বহস ও গবেষণা করে তার মুহকামকে জ্ঞাত হওয়া, তার গুঢ় রহস্য জানা। পবিত্র কুরআনের আয়াতের ও সূরার শানে নুযুল জ্ঞাত হওয়া, তার গুরুত্ব জ্ঞাত হওয়া, নাছেখ ও মানছুখ জ্ঞাত হওয়া। বাকি থাকল মোতাশাবেহগুলো– তার হুকুম মোহকামের দিকে প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভরশীল। (খ) সুন্নাতে কায়েমা বলতে বুঝায় ঐ সব আহকামে শরীয়া ও সুন্নাতে নববীয়াকে যা ইবাদত ও জীবনোপকরণ হিসেবে উপকারি রূপে প্রমাণিত। ইলমে ফিক্হ যে সম্পর্কে আলোকপাত করে থাকে। আর কায়েমা বলতে বুঝায় যা মানসুখ তথা রহিত হয়নি। এবং যা পরিত্যাজ্যও হয়নি, যার রাবী-বর্ণনাকারী কোথাও একজন হয়ে যায়নি এবং জমহুর সাহাবা ও তাবেয়ীগণ যা মেনে চলেছেন, অনুসরণ করেছেন।

তার সর্বোত্তম পর্যায় হলো, যে বিষয়ে মদীনা শরীফ ও কুফা নগরীর ফকীহগণ ঐকমত্য হয়েছেন। আর তার চিহ্ন হলো এর উপর চার মজহাবের ঐকমত্য রয়েছে।

তারপর ঐ স্তর রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে জমহুর সাহাবীদের দুটি বা তিনটি মত রয়েছে। আহলে ইলেম ও বিজ্ঞজনদের একদল প্রত্যেক মতের উপর আমল

করেছেন। তার প্রমাণ হলো মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক ও আবদুর রায্যাক প্রণীত গ্রন্থাবলির ন্যায় গ্রন্থে যেসব বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে।

তাছাড়া অন্যান্যগুলো হলো, কোনো কোনো ফকীহের ইস্তিম্বাত। হতে পারে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা তাখরিজের মধ্য হতে বা দলিল প্রমাণ বা ইস্তিম্বাতের মাধ্যমে এবং তা সুন্নাতে কায়েমার মধ্যে পরিগণিত নয়। (গ) ফরিজাযে আদেলা বলতে বুঝায় ওয়ারিশ তথা উত্তরাধিকারীদের অংশ সংক্রান্ত বিষয়। তার সাথে সম্পৃক্ত হবে বিচার বিভাগীয় বিষয়াদি এবং সে সব বিষয় যেগুলো মুসলমানদের মাঝে বাদানুবাদ এড়িয়ে চলার পথ সুগম করবে।

উপর্যুক্ত তিন প্রকারের জ্ঞানের জ্ঞানী হতে কোনো শহর খালি হওয়া হারাম। কারণ দ্বীন এ জ্ঞানগুলোর উপর নির্ভরশীল। এছাড়া অপর যত জ্ঞান-উলুম রয়েছে সবই হলো অতিরিক্ত জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত।

হেঁয়ালিপনা ও পহেলিকা করতে হুজুর (সা) নিষেধ করেছেন। হেয়ালীপনা বলতে ঐ সব মাসায়েলকে বুঝায় যেগুলোতে যাকে সে মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, সে ভুলে-বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে যায়। এসব মাসয়ালা দ্বারা লোকদের জ্ঞানের গভীরতার পরীক্ষা নেয়া হয়। বেশ কয়েকটি কারণে তা করতে বারণ করা হয়েছে।

তন্মধ্যে রয়েছে : এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া ও অপমানিত করা হয় এবং নিজেকে অহংকারী করা হয় ও গৌরবান্বিত করা হয়।

তন্মধ্যে রয়েছে : তা গভীরভাবে মনোনিবেশ করার দ্বার উন্মোচন করে দেয়। সঠিক তো সেটাই যা সাহাবা ও তাবেয়ীদের নিকট ছিল। (ক) সুন্নাতের প্রকাশ্য দিকের উপরই অবস্থান গ্রহণ করবে অথবা প্রকাশ্যের মর্যাদায় তাকে যথেষ্ট মনে করবে। যেমন– ইঙ্গিত (ايماء) প্রার্থনা (اقتضاء) এবং অভিপ্রায় আর অধিক গভীরতায় নিমজ্জিত হবে না। (খ) যতক্ষণ পর্যন্ত কঠিন প্রয়োজন না হবে ও বিশেষ ঘটনা না ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইজতিহাদে প্রবৃত্ত হবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা দয়া করে, মেহেরবাণী করে লোকদের জন্য তাঁর জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু প্রথমেই তার জন্য প্রস্তুতি থাকা চাই। এটা ভুল করার সম্ভাবনাময় জায়গা।

নবী করীম (সা)-এর বাণী :

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"যে ব্যক্তি কুরআনের অর্থ নিজের মতো করল সে জাহান্নামে তার জায়গা করে নিল।"

আমি বলছি যে, যে ব্যক্তি সে ভাষা সম্পর্কে সম্যক অবগত নয় যে ভাষায় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এবং নবী করীম (সা) হতে ও তাঁর সাহাবাদের হতে ও তাবেয়ীনদের হতে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয় সে ব্যক্তির জন্য তাফসীর করার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা হারাম। চাই সেটি কোনো কঠিন শব্দের ব্যাখ্যাই হোক, কি শানে নুযূলই হোক, কি নাসেখ ও মানসুখের বিষয়ই হোক।

রাসূল (সা)-এর বাণী :

اَلْمِرَاءُ فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ۔

"কুরআনে ঝগড়া করা কুফুরী।"

আমি বলছি যে, কুরআনে ঝগড়া করা হারাম। আর তা হলো তার মনের মধ্যে কোনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো অকাট্য হুকুমকে-বিধানকে অগ্রাহ্য, অস্বীকার ও খণ্ডন করা।

রাসূল (সা)-এর বাণী :

اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ـ ضَرَبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ۔

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা আল্লাহর কিতাবের এক অংশ দ্বারা অপর অংশকে আঘাত করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।"

আমি বলছি যে, পবিত্র কুরআনের এক অংশ দ্বারা অপর অংশের (একে অপরের কথা ও মতামতকে) প্রতিহত করা হারাম। তা হলো কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের কোনো এক আয়াত দ্বারা কোনো বিষয়ে দলিল প্রমাণ গ্রহণ করল তো দ্বিতীয় ব্যক্তি অপর আয়াত দ্বারা তা খণ্ডন করে দিল। নিজের মজহাবের প্রমাণ স্বরূপ এবং নিজের সাথীর দৃষ্টিভঙ্গির পবির্তনের জন্য অথবা কোনো ইমামের মজহাবের সহযোগীতার উদ্দেশ্যে অপর মজহাবের মোকাবেলায়। সে মূলত মূল সত্য প্রকাশের বিষয়ে সাহসী নয়। এমনিভাবে এক হাদীসকে অপর হাদীস দ্বারা খণ্ডন বা প্রতিহত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ :

রাসূল (সা)-এর বাণী :

لِكُلِّ اٰيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ ۔

"প্রত্যেক আয়াতের জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক রয়েছে, প্রত্যেকটি আয়াতের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে।"

আমি বলছি যে, পবিত্র কুরআনের অধিকাংশই আল্লাহ তায়ালার সেফাত, গুণাবলি এবং তাঁর নিদর্শনের বর্ণনা এবং আহকাম, বিধানাবলি, ঘটনা প্রবাহ, কাফেরদের সাথে তর্ক-বিতর্ক এবং জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনার মাধ্যমে নছিহত তথা উপদেশ প্রদান।

জাহের হলো, যে বিষয়ের বর্ণনার উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ করা হয়েছে সে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝানো, হৃদয়ঙ্গম করানো।

আল্লাহর সেফাত তথা গুণাবলির ক্ষেত্রে গোপন ও অপ্রকাশ্য হলো আল্লাহর নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও ধ্যান করা এবং সেগুলোকে দৃষ্টির সামনে রাখা। আহকামের তথা বিধানসমূহের আয়াতের ক্ষেত্রে গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য হলো ইশারা-ইঙ্গিত ও ইকতিদা দ্বারা আহকাম ইস্তিম্বাত করা। যেমন মহান আল্লাহর এ বাণী :

حَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا

"গর্ভধারণ ও শিশু সন্তান প্রসবরে সময় হলো ত্রিশ মাস" দ্বারা হযরত আলী (রা) এ মাসয়ালা ইস্তিম্বাত করা যে গর্ভধারণের সময়সীমা কখনো কখনো ছয় মাসও হয়। মহান আল্লাহর বাণী حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "দু'বছর পরিপূর্ণভাবে" দ্বারা। কিছ্ছা কাহিনী ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রে গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য হলো সওয়াব, শাস্তি ও প্রশংসা ও অপছন্দনীয় হওয়ার ভিত্তি ও কারণগুলো অবগত হওয়া। ওয়াজ তথা উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য হলো– অন্তর নরম হওয়া, ভয় ও আশার সঞ্চার হওয়া এবং এ জাতীয় বিষয় প্রকাশ পাওয়া।

প্রত্যেক আয়াতের বিশেষ সীমা হলো সে ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন তা যার দ্বারা সে বিষয়টি জানা যায়। যেমন ভাষা ও রেওয়ায়াত জ্ঞাত হওয়া ও স্মরণ শক্তির ব্যাপকতা ও বুঝার বিশুদ্ধতা অর্জন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ ۔ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۔

"পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত রয়েছে যার অর্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এ আয়াতগুলো কুরআনের মূল ভিত্তি এবং অন্যান্য আয়াতগুলো মোতাশাবেহ যেগুলোর অর্থ পরিষ্কার নয়, রহস্যাবৃত।"

আমি বলছি যে, জাহের তথা প্রকাশ্য হলো মোহকাম ঐ সব আয়াত যাদের একটি মাত্র অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ গ্রহণের সুযোগ নেই। যেমন পবিত্র কুরআনের আয়াত :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ۔

"তোমাদের জন্য তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে এবং তোমাদের বোনদেরকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে।" আর মোতাশাবেহ হলো ঐ সকল আয়াত যার বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ۔

"যারা ঈমান রাখে ও সৎকাজ করে তারা যা ভক্ষণ করে তাতে তাদের কোনো পাপ নেই।" কোনো কোনো বক্রচিন্তার লোক যদি মদ্যপানে সীমালঙ্ঘন ও ফাসাদ-গণ্ডগোল ও বিবাদ সৃষ্টি না করে তাহলে তাও হালাল– এ আয়াত হতে এ অর্থ গ্রহণ করেছে। অথচ বিশুদ্ধ ও সঠিক মত হলো মদকে হারামরূপে গ্রহণ করা।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী :

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۔

"সকল কাজের ফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"

আমি বলছি যে, নিয়ত হলো ইচ্ছা ও সংকল্প। আর এখানে হাদীস শরীফে তার উদ্দেশ্য হলো মানুষ যা ধারণা করে, কল্পনা-ভাবনা ও চিন্তা করে– তা ব্যক্তিকে সে কাজ করার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায়। যেমন আল্লাহর নিকট সওয়াব চাওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া। হাদীসের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো আত্মাকে পরিপাটি ও সুসজ্জিত করার ক্ষেত্রে এবং তার বক্রতা বিদূরণের ক্ষেত্রে আমলের কোনো তাছির নেই, প্রভাব নেই। কিন্তু যখন আমলকারীর ভাবনা ও চিন্তা তার নফস তথা আত্মাকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করা হয়– অভ্যাসগত ভাবে বা কাকেও প্রদর্শনের ইচ্ছা বা কাকেও শুনানোর বা প্রকৃতির ইচ্ছা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে না হয়ে, আত্মাকে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে কাজটি করে, তখন তার প্রভাব সৃষ্টি হয়। যেমন যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম

সে বাহাদুর ব্যক্তির যুদ্ধ করা। যদি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত না হয় তাহলে সে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে সে শক্তি ক্ষয় করবে। আর তা হলো যেমন রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল— এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রদর্শনের জন্য, আরেক ব্যক্তি যুদ্ধ করে বাহাদুরী দেখানোর জন্য; এদের মাঝে কার যুদ্ধ আল্লাহর পথে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে শুধুমাত্র সেই আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী। গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো : এক্ষেত্রে অন্তরের ইচ্ছা আমলের প্রাণ স্বরূপ। আর আমল ইচ্ছার মুখচ্ছবি তথা চিত্র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী :

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنْ اِتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ بِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ-

"হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, এদের উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলি, যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো হতে বেঁচে থাকল নিঃসন্দেহে সে দ্বীনকে পবিত্র করল ও নিজের ইজ্জত, সম্মান, সুনাম, সুখ্যাতি রক্ষা করল।"

আমি বলছি যে, কখনো কখনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে বিপরীত দুটি দিক দেখা দেয়, তখন সুন্নাতে নববীই হয় তা হতে রক্ষাকারী ও সাবধানকারী।

এসব বিপরীত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে : (ক) উভয় বর্ণনা সরাসরি একটি অপরটির থেকে ভিন্ন বা বিপরীত। যেমন লিঙ্গ স্পর্শ করার বিষয়টি। এতে কি অযু ভঙ্গ হবে? কেউ তার বিপরীত বিষয়টাকে প্রমাণিত করেছে। (কেউ বলেছে এতে অযু ভেঙ্গে যাবে, কেউ বলেছে অযু ভঙ্গ হবে না) প্রত্যেকের মতের পক্ষে হাদীস দলিল হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে এবং যেমন মোহরেমের (যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি। একদল তাকে জায়েজ বলেছেন -অপর দল তাকে নিষিদ্ধ বলেছেন। এক্ষেত্রে রেওয়ায়েত মোখতালেফ তথা ভিন্ন ধরনের হয়েছে।

(খ) এক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটির কোনো নির্ধারিত অর্থ নেই। কোনো উপমা দ্বারা অর্থ বুঝা যায়। কোনো সীমিত অর্থ ও সংজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ বুঝা যায় না। এ ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা দেখা দেয় :

(১) যে ব্যাপারে ইয়াকিনীভাবে শব্দটির ব্যবহার হয়। (২) যে ব্যাপারে শব্দটির ইয়াকিনী ব্যবহার হয় না। (৩) এ ব্যাপারে শব্দটির ব্যবহার ঠিক কি বেঠিক তা জানা নেই।

(গ) বৈপরীত্যের অপর ধরনটি হলো হুকুমটি মোয়াল্লাফ তথা দোদুল্যমান হবে কোনো একটি কারণ বা উদ্দেশ্যের সাথে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা যাবে না। কোনো এক ব্যাপারে এমন হবে যে, উদ্দেশ্যের সাথে দৃঢ়তার প্রত্যয় পাওয়া যাবে না কিন্তু তার কারণ পাওয়া যাবে। যেমন কোনো ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয়কৃত দাসীর সাথে যৌন মিলনের বিষয়টি। এক্ষেত্রে কি তা হতে বিরত থাকবে, কি থাকবে না? এ জাতীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এহতিয়াত তথা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী :

نَزَلَ الْقُرَانُ عَلَى خَمْسَةِ وُجُوه : حَلاَلٌ وَحَرَامٌ وَمُحْكَم وَمُتَشَابِهٌ وَاَمْثَالٌ.

"পবিত্র কুরআন পাঁচভাবে অবতীর্ণ হয়েছে– (১) হালাল (২) হারাম (৩) মোহকাম (৪) মোতাশাবেহ (৫) উপমাসমূহ।

আমি বলছি যে, এগুলো পবিত্র কুরআনের তথা আল্লাহর কিতাবের বিধানের প্রকার যদিও বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো বৈপরীত্য নেই এটা সন্দেহাতীত। অতঃপর হুকুম কখনো হালাল হয় আবার কখনো হয় হারাম (অর্থাৎ এতদুভয় কখনো একত্রিত হতে পারে না)।

ইসলামের মূলনীতি হলো : মোতাশাবেহ আয়াত ও হাদীসগুলোর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ না করা। আর সে সব মোতাশাবেহাতের মধ্যে অনেক বস্তুই রয়েছে। এক্ষেত্রে একথা জানা যায় না যে, এক্ষেত্রে তার হাকিকী অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, নাকি হাকিকী অর্থের নিকট রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সবই হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তা হতে শোবা-সন্দেহ নিরসন করা হয়নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পবিত্রতার অধ্যায়

কিতাবুল তাহারাত

পবিত্রতা সংক্রান্ত আলোচনা

জেনে রাখুন যে, পবিত্রতা তিন প্রকার :

(১) অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা। طهارة من الحدث

(২) দেহের সাথে সম্পর্কিত বস্তু, কাপড়ের সাথে অথবা স্থানের সাথে সম্পর্কিত অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা।

طَهَارَةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَدَنِ، أَوِالثَّوْبِ أَوِالْمَكَانِ

(৩) দেহ হতে উৎপন্ন অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা, যেমন দেহের নিম্নাঙ্গে উৎপন্ন পশম, নখ ও ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি।

অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন সৎ কাজের ভিত্তির মধ্যে অন্যতম।

অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জনের সীমা : এটি এমন রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিদের রুচির উপর ভিত্তিশীল যাদের মধ্যে মালাকূতী নূর প্রসার লাভ করেছে। ফলে তারা যাকে হদছ– অপবিত্রতা বলা হয় তাকে নিজেদের জন্য অপছন্দনীয় মনে করেছেন এবং যাকে তাহারাত তথা পবিত্রতা বলা হয় তাকে তাদের জন্য আনন্দদায়ক ও প্রশান্তিময় মনে করেছেন।

পবিত্রতার ধরনের সীমা, আকৃতি এবং তা ওয়াজিব– অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নিচয়ের নির্ধারণ : ঐ সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যা পূর্ববর্তী মিল্লাতের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন– ইহুদি, নাছারা ও অগ্নি উপাসক ও মিল্লাতে ইসমাঈলের অবশিষ্টাংশ। তারা হদছ তথা অপবিত্রতাকে দু'ভাগে ভাগ করত এবং পবিত্রতাকেও দুভাগে ভাগ করত। যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। আরবদের মাঝে জানাবতের (সহবাসের পর দেহ শুদ্ধির জন্য গোসল) গোসল আমভাবে প্রচলিত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদছের তথা অপবিত্রতার

দু'প্রকারের ন্যায় পবিত্রতারও দু'প্রকার ঘোষণা করলেন। হদছে আকবরের বিপরীতে তাহারাতে কোবরাকে (বড় অপবিত্রতার বিপরীতে বড় পবিত্রতাকে) ঘোষণা করলেন। তা এজন্য যে, এ জাতীয় অপবিত্রতা অল্প সংখ্যক সংঘটিত হয়ে থাকে। তালবিছের দিকে থেকে অধিক হয়। কঠিন কাজে আত্মাকে সতর্ক করার জন্য এরূপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অপরদিকে হদছে ছোগরাকে তাহারাতে ছোগরার (ছোট পবিত্রতাকে ছোট অপবিত্রতার) বিপরীতে ঘোষণা করলেন। এর কারণ হলো এ জাতীয় হদছে ছোগরা অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তালবিছের দিক হতে অল্পসংখ্যক হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বেশি একটা সতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দেয় না। যে সব বস্তুতে অপবিত্রতার তথা হদছ-এর অর্থ পাওয়া যায় সেগুলো অসংখ্য। সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তা জানে, বুঝে কিন্তু যে বিষয়ে সকল মানুষকে অবগত করানো প্রয়োজন, যা অনুভব করার সাথে সম্পৃক্ত তার চিহ্ন আত্মার মাঝে প্রকাশ পায়, যা প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়ে তা এর মাঝে পরিগণিত।

পেটের ভেতরে যা গুড়গুড় করে তা যতক্ষণ পায়খানা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হদছ তথা অপবিত্রতা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রথমটির কোনো আকৃতি ও আয়তন নির্ধারিত নেই। আর যখন তা পাওয়া যাবে তখন অযু করা রোধ করা যাবে না। আর দ্বিতীয় জিনিসটি স্পর্শের মাধ্যমে জানা যায় অনুভূতির দ্বারা অনুভব করা যায়। মানুষ স্বয়ং তা অনুভব করতে পারে, তা প্রকাশ্য নাজাছাতের সাথে সম্পৃক্ত।

আত্মার ব্যস্ততার অবস্থায়ও অযু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর তা হয় সে হদছ প্রকাশ হওয়ার কারণে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাণী :

لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ -

এর মধ্যে হদছের কোনো না কোনো অর্থ বিদ্যমান অর্থাৎ তার দ্বারাও গুনাহ হয়।

ঐ সব বস্তু যার মধ্যে তাহারাত তথা পবিত্রতার অর্থ -(আনন্দ ও মনের প্রশান্তি বিদ্যমান) সেগুলো অসংখ্য। যেমন সুগন্ধি লাগানো, অথবা পবিত্রতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ন্যায় যিকিরসমূহ। যেমন কোনো ব্যক্তি পাঠ করল :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

আবার কেউ পাঠ করল :

اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

"হে আল্লাহ! আমাকে সাদা কাপড়কে যেভাবে অপবিত্রতা হতে পবিত্র করেছেন সেরূপ পবিত্রতা দান করুন।" এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে অবতরণ করা। এবং এ জাতীয় কিছু হওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে লোকদেরকে যে সম্পর্কে অবগত করানো যায় তা সীমিত। এবং সব সময় তা করা সহজ হয় তা এবং যা পরিচ্ছন্ন এবং সকল মজহাবে যা গ্রহণীয় ও চালু রয়েছে তা।

অযুর মূল ভিত্তি হলো দেহের বিভিন্ন পার্শ্ব-অংশ ধৌত করা। শরীয়তদাতা মুখমণ্ডলকে, চেহারাকে পুরো মুখমণ্ডলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। উভয় হাতকে কনুইসহ সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ এর কম হলে তার সীমা অনুভূত হয় না। উভয় পা-কে তার টাখনু তথা ছোট গিটসহ সম্পৃক্ত করেছেন। তা এজন্য যে, এ ছাড়া অযুর অঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মাথা মাসেহ করা নির্ধারিত করেন তা এজন্য যে, তা ধৌত করার মাঝে পেরেশানি বিদ্যমান।

গোসলের মূল হলো সমগ্র শরীর, পূর্ণ দেহ ধৌত করা।

অযু ওয়াজিবকারী বস্তুসমূহের মূল হলো যা পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়। আর সে সব অন্যান্য বস্তু যাকে পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হওয়া বস্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গোসল ওয়াজিবকারী বস্তুগুলো হলো স্ত্রী সঙ্গম, সহবাস ও হায়েজ তথা মাসিক ঋতুস্রাব। এ দুটো বিষয় গোসল অত্যাবশ্যকীয়কারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে থেকেই আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল।

বাকি থাকল পবিত্রতার অপর দু'প্রকার। সেগুলো ارتفاقات এরতেকাফাতের অন্তর্ভুক্ত। আর এতদুভয় ধরনের পবিত্রতা মানব প্রকৃতির দাবি অর্থাৎ মূল দাবি। কোনো সম্প্রদায় বা কোনো জাতি তা হতে মুক্ত নয়। প্রকৃত আরবদের নিকট যে দু ধরনের পবিত্রতা বিদ্যমান ছিল শরীয়ত প্রণেতা ঐ দুটির উপর ভিত্তি করেছেন। এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। যেমনিভাবে ارتفاقات এর ক্ষেত্রে অপরাপর যেসব বিষয়কে সম্পৃক্ত করেছেন তার ক্ষেত্রে করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদব তথা শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং অস্পষ্ট, গুপ্ত ও অজ্ঞাত বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেননি।

অযুর ফজিলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

আমি বলছি যে, এখানে ঈমান দ্বারা অন্তরের সে অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য যা পবিত্রতা ও নম্রতার নূরের সমন্বয়ে গঠিত। আর এহসান শব্দটি এক্ষেত্রে ঈমান শব্দ হতে অধিক প্রযোজ্য। আর তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পবিত্রতা ঐ ঈমানের অর্ধেক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ، حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ۔

" যে ব্যক্তি উত্তমভাবে অযু সমাপন করল, অযুর ফলে তার দেহ হতে পাপরাশি ঝরে পড়ে যায়, পরিশেষে তার নখের নিচের পাপও ঝরে পড়ে যায়।"

আমি বলছি যে, সে পবিত্রতা যা অন্তরের ভিত্তিতে প্রভাব বিস্তার করে সে পবিত্রতা নফসকে পূত-পবিত্র করে দেয়, নির্মল করে দেয়, আর ফিরিশতাদের সাথে মিলিয়ে দেয় এবং অনেক নাপাক অবস্থাকে বিস্মৃত করে দেয়। অতএব ঐ বাতেনী পবিত্রতার খাছিয়তকে অযুর খাছিয়ত করে দেয়া হয়েছে যা সে বাতেনী পবিত্রতার চিত্র ও তার প্রতিচ্ছবি ও ঠিকানা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

اِنَّ اُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ۔

আমার উম্মতকে কেয়ামতের দিন "গোররান মোহাজজালীন" বলে ডাকা হবে (সাদা চিহ্ন বিশিষ্ট) তাদের অযুর চিহ্নের কারণে। অতএব তোমাদের মধ্যে

যে তার সে বিশয়ে সাদা চিহ্ন দীর্ঘ করতে ইচ্ছুক হয় সে যেন তার করে।

এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর বাণী :

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ۔

"অযুর পানি মোমেন ব্যক্তির যতটুকু পৌছবে ততটুকু গয়নার ন্যায় হবে।

আমি বলছি যে, যখন পাঁচটি অঙ্গের গুপ্ত পবিত্রতার মুখপত্র তথা চিহ্ন, চিত্র এগুলোকে ধৌত করা। তখন এগুলো প্রকাশ ঘটবে গয়নার চিত্রের ন্যায়। তা হবে মুখমণ্ডলের ও হাত পায়ের উজ্জল চমকের দ্বারা। যেমনিভাবে দুর্বলতা হিসেবে এবং বাহাদুরী বাঘের ন্যায় প্রকাশ পায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا الْمُؤْمِنُ۔

"মোমেন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ অযুর হেফাযত করে না।"

আমি বলছি যে, অযু সংরক্ষণ করে রাখা কঠিন আমল হওয়ার কারণে শুধুমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো পক্ষে তা সংরক্ষণ করা অসম্ভব এবং ঐ ব্যক্তিই তা সংরক্ষণ করতে পারে, যে অযুর বিশাল উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত। এ কারণে অযুকে ঈমানের চিহ্ন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

অযুর পদ্ধতি

অযুর যে পদ্ধতি হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদ (রা) এবং তাঁদের ব্যতীত অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মোতাওয়াতের পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। যার উপর উম্মতের ঐকমত্য স্থাপিত রয়েছে তা হচ্ছে : পাত্রে হাত প্রবিষ্ট করার পূর্বে উভয় হাত পানি দিয়ে ধৌত করে নেবে। কুলি করবে, নাক ঝেড়ে নাকে পানি দেবে, তারপর নিজের মুখমণ্ডল ধুয়ে নেবে। অতঃপর উভয় হস্ত কনুই পর্যন্ত ধুবে। তারপর মাথা মাসেহ করবে ও উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে।

ঐ লোকদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা প্রবৃত্তির দাস হওয়ার কারণে পা ধৌত করাকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করার কারণে। আমার নিকট যারা বদরের যুদ্ধ ও উহুদের যুদ্ধকে অস্বীকার করে তাদের এবং মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এ বিষয়টি মধ্যাহ্নের সূর্যের কিরণের ন্যায় পরিষ্কার।

তবে হ্যাঁ, যারা বলেছে যে, সাবধানতা রয়েছে ধোয়া এবং মাসেহ্ করার মধ্যে। অথবা ফরজের সর্বনিম্ন পর্যায় হলো মাসেহ্ করা। যদিও ধোয়ার পর্যায়টি ঐ পর্যায়ে পড়ে যেজন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। সুতরাং ওলামাদের এ ক্ষেত্রে বিষয়টি মুলতবী রাখবে যতক্ষণ না বিষয়টির রহস্য উদঘাটিত না হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় আমি এরূপ দেখতে পাইনি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকে পানি দেয়া, কুলি করা ও তরতীবের খেলাপ করে অযু করেছেন। উক্ত তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে।

ঐ দুটি পরিপূর্ণভাবে দু ধরনের পবিত্রতা। যা ফিতরাতী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে অযুর সাথে মিলানো হয়েছে যাতে সে জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় ঐ দুটোর জন্য। আর তা এজন্য যে, উভয়কে ভাঁজ করা যায়। তাদের পৃথক করা হতে একত্রিত করার বর্ণনা অধিক সহীহ্ ও বিশুদ্ধ।

অযুর আদব কতগুলো জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত

তন্মধ্যে আছে : সে সব প্যাচানো অংশগুলোর অর্থাৎ দেহের ভাঁজগুলোর প্রতি লক্ষ দেয়া যেগুলোতে মনোনিবেশ করে তথা খেয়াল করে পানি না পৌছানো হলে সেগুলোতে পানি প্রবেশ করে না। যেমন কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, উভয় পায়ের ও উভয় হাতের অঙ্গুলি খিলাল করা এবং দাড়ি খিলাল করা ও আঙ্গুলে পরিহিত আংটির নিচে পানি পৌছানো।

তন্মধ্যে রয়েছে : পবিত্রতা পূর্ণ করা। যেমন প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার তিনবার করে ধৌত করা। ইসরাগে অযু বা পরিপূর্ণভাবে অযু করা। ইসরাগ, চেহারায় ও হাত পায়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে। এমনিভাবে অধিক পরিচ্ছন্নতা ভালোভাবে রগড়িয়ে ধৌত করা। মাথার সাথে উভয় কান মাসেহ্ করা। অযু থাকা সত্ত্বেও পুনরায় অযু করা।

তন্মধ্যে রয়েছে : বিশেষ কাজে মুসলমানদের সহজাত নিয়মগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যেমন ডান হাত থেকে অর্থাৎ ডান দিকে থেকে অযু শুরু করা। এতে সন্দেহ নেই যে, ডান দিক উত্তম ও শক্তিশালী। সুতরাং ডান দিক হতে অযু শুরু করাই হলো যুক্তিযুক্ত। কোনো কর্ম উভয় হাতের দ্বারা করা হলে ডান হাত দ্বারা শুরু করাই উত্তম। ডানকে ভালো এবং উত্তম কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এর বিপরীতকে নয়। যে কাজ এক হাতে করা হয় তাতেও ডান হাত

ব্যবহার করাই উত্তম।

তন্মধ্যে আছে : মুখে সরাসরি নিয়ত করা এবং অন্তরের সাথে যিকির করা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ।

"যে আল্লাহর নাম স্মরণ করল না তার অযু হবে না।"

আমি বলছি যে, এ হাদীসটির সত্যতার ব্যাপারে হাদীসের খেদমতকারী মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেননি। এটা এমন একটা অবস্থায় উপনীত করেছে যার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে দ্বীন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতির উদ্ভব করেছে। মুসলমানেরা বরাবরই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অযুর পদ্ধতি প্রচার করতে থাকেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দিতে থাকেন। তারা অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠের বিষয়টি উল্লেখই করতেন না। পরিশেষে মোহাদ্দেসীনদের যুগ আসল। অযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা কি রোকনদ্দ না শর্ত এ ব্যাপারে তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন ছিল সর্ব প্রথমে। উভয় পদ্ধতিকে দ্বিমত বাদ দিয়ে এভাবে আমল করা যেত যে, এর অর্থ হলো অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করা। কোনো ইবাদতই নিয়ত ব্যতীত কবুল হয় না। তখন হাদীসের শব্দ لا وضوء "অযু হবে না" অর্থ তার প্রকাশ্য অর্থের দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হবে।

তবে হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ পাঠ অযুর আদব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ অনুযায়ী যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজই আল্লাহর নাম ব্যতীত আরম্ভ করা হবে সে কাজেই বরকতহীন হবে। আর কেয়াসের দৃষ্টিতেও অনেক স্থানেই তা গুরুত্বপূর্ণ।

এ হাদীসের অর্থ এরূপও হতে পারে যে, "অযু পূর্ণ হবে না।" এ ধরনের ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট নই। এটা এমন এক ধরনের ব্যাখ্যা যা শব্দের অর্থ সংরক্ষণের বিপরীত দিকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"কারণ সে জানে না তার হাত রাতে কোথায় অবস্থান করেছিল।"

আমি বলছি, তার অর্থ হচ্ছে, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হাতে ধৌত করা হতে

বেখবর থাকার কারণে হতে পারে তাতে ময়লা আবর্জনা লেগে যেতে পারে, বা কোনো ধরনের নাপাকীও লেগে যেতে পারে। এমতাবস্থায় হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত দিলে তা নাপাক ও ময়লা হতে পারে। এরূপ করা সুরুচি ও ভদ্রতার খেলাপ। এমনিভাবে পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দেয়াও নিষিদ্ধ, কারণ তাতে পানিতে মুখের লালা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটাও রুচি এবং ভদ্রতার খেলাপ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ ـ

"শয়তান তার নাকের ছিদ্রের মধ্যে রাত্রি যাপন করেছে।"

আমি বলছি এর অর্থ হলো, নাকের ছিদ্রের মধ্যে শ্লেষ্মা ও সর্দি ইত্যাদি জমা হয়ে থাকার কারণে সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করলে কোনো কিছু বুঝার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা শয়তানের প্রভাব বিস্তারের কাজে বড় ধরনের সহযোগিতা হতে পারে। যার কারণে যিকির-আযকারের মধ্যে শয়তানের প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُوْلُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

" তোমাদের কেউ অযু সমাপনের পর যদি পাঠ করে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তোমাদের কেউ অযু সমাপনের পর যদি পাঠ করে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের মধ্যে পরিগণিত করুন ও আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল করে নিন।" তা হলে তার জন্য বেহেশতের ৮টি দরজাই উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আমি বলছি যে, আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ না করলে অযুর আত্মা পরিপূর্ণতা লাভে ধন্য হয় না। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিপূর্ণ পবিত্রতা

লাভের জন্য চেষ্টা না করলেও অযুর আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুতে এসবাগের হুকুম দিয়েছেন দ্বিতীয় বিষয়টি লাভ করার জন্য এবং প্রথম বিষয়টি লাভ করার জন্য এ দোয়াকে তালকীন দিয়েছেন। যাতে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণভাবে বান্দার মনোযোগ হয়। আর জান্নাতে প্রবেশ করাকে এ দোয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে ধরেছেন যা আত্মার পবিত্রতার মধ্যে ধর্তব্য।

যে ব্যক্তি পা পরিপূর্ণভাবে ধৌত করেনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ـ

"ঐ পায়ের টাখনুর জন্য জাহান্নাম।"

আমি বলি ঐ শাস্তি ঘোষণার মধ্যে রহস্য হচ্ছে– যখন আল্লাহ তায়ালা অযুতে দেহের তিনটি অঙ্গ ধৌত করা ফরজ করেছেন তখন ঐগুলোকে পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে যখন কিছু অংশ ধৌত করা হলো আর কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে গেল, তাহলে এ অংশ ধৌত করা ঠিক ও পরিপূর্ণ হলো না। যখন অযুই পরিপূর্ণ হলো না তখন নামায কি ভাবে পরিশুদ্ধ হবে। এজন্য ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। এখানে শরীয়তের বিধানের প্রতি অবহেলা করার পথ বন্ধ করাও উদ্দেশ্য।

পায়ের গোড়ালিকে দোজখের জন্য নির্ধারিত করার কারণ হলো তাতে নাপাকি থেকে গিয়েছিল। নাপাকি জমে থাকা ও তা পরিষ্কার না করা দোজখের কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা অর্জন দোজখ হতে মুক্তির পথ এবং গুনাহের কাফফারা হওয়ার উপযোগী। অতএব যখন অযুর ক্ষেত্রে গোড়ালি পরিপূর্ণ রূপে পরিচ্ছন্ন করা হলো না এক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা হলো। ফলে এ অঙ্গ শাস্তির যোগ্য হয়ে গেল। তার পর সে কারণে ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হলো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অযু ওয়াজেবকারী বস্তুসমূহের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

لَا تُقْبَلُ صَلوٰةُ مَنْ حَدَّثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ ـ

"কোন ব্যক্তির অযু নষ্ট হয়ে গেলে, অপবিত্র হলে যতক্ষণ পর্যন্ত অযু না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ -

"পবিত্রতা (অযু) ব্যতীত কোনো নামায কবুল করা হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ -

"নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা (অযু)।"

আমি বলি এসবগুলো হচ্ছে যে পবিত্র হওয়া নামাযের জন্য শর্ত এবং পবিত্রতা পরিপূর্ণভাবে একটি ইবাদত। এবং তাকে নামাযের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। উভয়ের উপকারিতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে। এক্ষেত্রে এখানে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি জড়িত। আর তা হচ্ছে নামাযের জন্য নির্দেশ প্রদান।

আমাদের শরীয়তে অযু ওয়াজিবকারী বস্তু তিন ধরনের : প্রথমটি, ঐসব বস্তু যে বিষয়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন- এক্ষেত্রে বর্ণনা ও আমল সবই একই ধরনের হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে প্রস্রাব, পায়খানা, হাওয়া নির্গত হওয়া, মজি নির্গত হওয়া, গভীর নিদ্রা এবং অন্যান্য যেসব বস্তু এগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয় সেগুলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী :

وكاء السه العينان -

"নিতম্বের গ্রন্থি হলো দু'চোখ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ فَاصِلُهُ -

"কারণ সে যখন কাত হয়ে শোয় তখন তার জোড়াসমূহ ঢিলা হয়ে যায়।"

আমি বলি এর অর্থ হচ্ছে- গভীর নিদ্রা হচ্ছে মানুষের জোড়া ঢিলে হওয়ার ও হদছ হওয়ার কারণ। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তার সাথে অন্য কারণও বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো গভীর নিদ্রা মানুষের দেহকে দুর্বল করে দেয় আর নিদ্রার

মাঝে হদছ হয়ে যায়। মজি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .

"সে তার লিঙ্গ ধুয়ে নেবে ও অযু করে নেবে।"

আমি বলি যে, যে মজি হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে নির্গত হয় এতে শাহওয়াতের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয় সহবাস ছাড়া। তখন তার দাবি হলো বড় ধরনের পবিত্রতা না করে ছোট ধরনের পবিত্রতা অর্জন করবে। সন্দেহের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

لَا يُخْرِجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ رِيْحًا .

"ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ হতে বের হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো শব্দ (হাওয়া বের হওয়ার শব্দ শুনতে পাবে) বা গন্ধ পাবে।"

আমি বলি এর অর্থ হচ্ছে তার হদছ হওয়ার ইয়াকিন তথা দৃঢ় প্রত্যয় হতে হবে। যখন দু'পথের মধ্য দিয়ে কিছু বের হওয়াকে (পায়খানার রাস্তা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়াকে) অযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে তখন। ঐ দু পথ দিয়ে কিছু বের হলো, কি হলো না সে সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় হতে হবে অর্থাৎ ইয়াকিন হতে হবে। সন্দেহের কারণে তা হবে না। এখানে হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে কঠোরতা বর্জন করা। সন্দেহ পরবশ হয়ে অযু ভঙ্গ হয়েছে ভেবে অযু করার জন্য কড়াকড়ি আরোপ করা বর্জন করা। এরূপ করা হলে সন্দেহ পরায়ণ ব্যক্তি কত কিছুই না করে বসবে।

দ্বিতীয়টি হলো : যে বিষয়ে মুতাকাদ্দেমীন, ফকীহ, সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন লিঙ্গ স্পর্শ করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী অনুযায়ী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

"যে ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে তাকে অযু করতে হবে।"

ইবনে উমর, সালেম ও ওরওয়াহ এবং আরো অনেকে এ হাদীস বর্ণনা

করেছেন। তা অগ্রাহ্য ও খণ্ডন করেছে হযরত আলী, ইবনে মাসউদ এবং কুফার ফকীহগণ। তাদের দলিল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْهُ -

"লিঙ্গ তো তার দেহের অংশ বৈ নয়।" এতদুভয়ের কোনোটিই মানছুখ হওয়ার বিষয়ে কোনো প্রশান্তিময় প্রমাণ নেই।

এবং যেমন "নারীকে স্পর্শ করা।" এর বর্ণনাকারী হলেন ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও ফকীহ ইবরাহীম নখয়ী। মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী হচ্ছে :

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -

"অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করবে" এর পক্ষে কোনো হাদীস সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে না। বরং হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস তার বিপরীত প্রমাণ উপস্থাপন করে। এ হাদীসের বিষয়ে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে কারণ এ হাদীসটি মোনকাতে হাদীস।

আমার দৃষ্টিতে এ জাতীয় বিষয়গুলো দুটি হাদীসের মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা বৈপরীত্য না থাকার কারণে কোনো হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত ওমর ও হযরত ইবনে মাসউদ জানাবতের জন্য (শুক্র ক্ষরণ ও অপবিত্রতার) তাইয়াম্মুম করা বৈধ মনে করতেন না। সুতরাং তাদের দৃষ্টি নারীকে স্পর্শ করার বিষয়েই আয়াতের বিধান নির্ধারিত হয়ে গেল। অথচ ইমরান, আম্মার ও আমর ইবনুল আস হতে জানাবাতের জন্য তাইয়াম্মুম করার কথা বর্ণিত রয়েছে এবং এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনে উমর এ ব্যাপারে স্যবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতি। ইবরাহীম নখয়ী ইবনে মাসউদকে অনুসরণ করতেন। ইবনে মাসউদ যে দলিল গ্রহণ করেছিলেন তা পরিশেষে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর নিকট স্পষ্ট হলো। তিনি ইবরাহীম নখয়ীর কঠোর অনুসারী হওয়ার পরও তার মত ত্যাগ করলেন।

মূল কথা হলো : সাহাবা ও তাবেয়ীনদের পরে এ মাসয়ালায় (লিঙ্গ স্পর্শ করা ও নারীকে স্পর্শ করার মাসয়ালায়) ফকীহদের মধ্যে তিনভাগ হয়ে গেল। প্রকাশ্যে তা গ্রহণকারী, সম্পূর্ণভাবে তা ত্যাগকারী ও সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা উভয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী।

প্রবহমান রক্ত ক্ষরণের কারণে অযু করতে হবে এ মত হলো ইবরাহীম নখয়ীর এবং অধিক পরিমাণে বমি হলেও অযু করতে হবে এমতও ইবরাহীম নখয়ীর। আর নামাযে অট্টহাসির কারণেও অযু করতে হবে এমত হযরত হাসান (রা) এর। অন্যেরা মত দেননি। উক্ত তিনটি মাসয়ালার বিষয়ে একটি হাদীস রয়েছে যে হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দীসগণ ঐকমত্য হননি।

এ মাসয়ালায় বিশুদ্ধতম মত হলো যিনি এহতিয়াত তথা সাবধানতা অবলম্বনের প্রতি আমল করেছেন তিনি স্বীয় দ্বীনের ও নিজের পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর যে এরূপ করেনি তার জন্য শরীয়তে নিরেট কোনো পথ উন্মুক্ত নেই।

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নারীকে স্পর্শ দ্বারা যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যৌন মিলন ছাড়াই নিম্নতম যৌন প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়। আর লিঙ্গ স্পর্শ করা একটি নিন্দনীয় কাজ। এ কারণে ইস্তিঞ্জায় ডান হাতে লিঙ্গ ধরা নিষেধ করা হয়েছে। অতএব যখন লিঙ্গ ধরা হলো তখন তা শয়তানী কাজ নিঃসন্দেহে। অর্থাৎ

إِذَا كَانَ مَسَّ الذَّكَرِ فِيْ صُوْرَةِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ كَانَ لَا مُحَالَةَ مِنْ افْعَالِ الشَّيَاطِيْنِ۔

"যখন হাত দ্বারা লিঙ্গ ধরল তখন এটা অবশ্যই শয়তানের কাজ। আর প্রবহমান রক্ত রক্ত তথা প্রবাহিত হওয়া এবং অধিক পরিমাণে বমি করা উভয়টাই দেহকে মলিনকারী ও অপরিচ্ছন্নকারী। আর নামাযে অট্টহাসি দেয়া বিশাল ভুল। কখনো কখনো সে জন্য কাফফারা দেয়া লাগতে পারে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, শরীয়তদাতা এজন্য অযু করার বিধান দিয়েছেন এবং এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, শরীয়ত এ ব্যাপারে কোনো বিধান দিল না ওয়াজিব রূপে অথবা তা মোস্তাহাব রূপেও হুকুম দিতে পারে।

তৃতীয়টি হলো : হাদীসের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা অযু ভঙ্গের কারণ কিন্তু এগুলো অযু ভঙ্গের কারণ না হওয়ার ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফকীহদের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। যেমন আগুনে পাকানো বস্তু ভক্ষণ করলে অযু করতে হবে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবু তালহা এবং অপরাপর সাহাবা

হতে আগুনে পাক করা জিনিস ভক্ষণের কারণে অযু না করা প্রমাণিত রয়েছে। জাবের (রা) বলেছেন যে, এ বিধান মানসূখ হয়ে গেছে।

আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার কারণে অযু করার কারণ হচ্ছে প্রথমত পাকানো খাদ্য পরিপূর্ণ কল্যাণদাতা। ফিরিশতারা এরূপ করে না। আর তা ফিরিশতাদের সাথে সামঞ্জস্য না হওয়ার কারণ হবে। দ্বিতীয়ত, আগুনে পাকানো বস্তু জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ কারণে লৌহ গরম করে দাগ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লৌহ গরম করে দাগ দেয়া যেতে পারে। সুতরাং মানুষের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে তার অন্তরকে এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

বাকি থাকল উটের গোশত সম্পর্কিত বিষয়। এ বিষয়টি আরো জটিল। সাহাবী ও তাবেয়ী ফকীহদের কেউ উটের গোশত খেলে অযু করতে হবে একথা বলেন নি। আর এ হাদীসটি মানসূখ– রহিত এ কথারও কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। সুতরাং হাদীস তাখরিজকারী মোহাদ্দিছ ও মোজতাহেদদের কেউ এর পক্ষে মতামত প্রকাশ করেননি। শুধুমাত্র আহমদ ও ইসহাক এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আমার নিকট লোকেরা সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং অযু করে নেবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

যিনি উটের গোশত খাওয়াকে অযু ভঙ্গের কারণ বলেছেন এবং বলেছেন যে, উটের গোশত খেলে অযু করতে হবে তার রহস্য হচ্ছে– উটের গোশত খাওয়া তাওরাত কিতাবে হারাম ছিল। বনী ইসরাঈলের সকল নবীরা উটের গোশত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলেন। যখন আল্লাহ তায়ালা তা আমাদের জন্য হালাল করলেন তখন দুদিক থেকে তা খাওয়ার পর অযু করা ওয়াজিব করলেন :

প্রথম হলো : উটের গোশত খাওয়ার পর অযু করা হলো আল্লাহ তায়ালা উটের গোশত আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য হারাম থাকার পর আমাদের জন্য তা হালাল ঘোষণা করেছেন তার শুকরিয়া স্বরূপ।

দ্বিতীয় হলো : উটের গোশত খাওয়ার পর কারো মনে কোনো ধরনের সন্দেহের চিকিৎসা স্বরূপ অযু করতে হবে। কারণ উটের গোশত বনী ইসরাঈলের সকল নবীদের প্রতি হারাম ছিল। হারাম থাকার পর তা বৈধ ও হালাল ঘোষণা করার পর তার জন্য অযু করা উচিত। আর এরূপ করা অন্তরের

প্রশান্তির কারণও। আমার মতে উটের গোশত খেয়ে অযু করা ইসলামের প্রথম দিকে ছিল পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

মোজার উপর মাসেহ্ করা

অযুর ভিত্তি হলো ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা যে সব অঙ্গ সাধারণত খোলা থাকে ও যাতে ময়লা-কাদা দ্রুত প্রসাব লাভ করে। যখন ঐ সব অঙ্গের উপর মোজা পরিধান করা হয় তখন ময়লা মোজায় লেগে যায় এবং গুপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লুকিয়ে যায়। আরবদের মাঝে সেন্ডেল ও জুতা পরিধানের ক্ষেত্রে খুফফাইন (চামড়ার মোজা) পরিধান করার অভ্যাস প্রচলন ছিল। প্রত্যেক অযুর সময় মোজা খুলে পা ধৌত করা কষ্টকর ও বিরক্তিকর। এ কারণে খুফফাইন (চামড়ার মোজা) পরিধান কালে কিছু সময়ের জন্য বিষয়টি সহজ করার জন্য পা ধৌত করা সহজতর করে শরীয়ত পা ধোয়ার হুকুম রহিত করে দিয়েছে এবং মোজার উপর মাসেহ্ করার অনুমতি দিয়েছে।

শরীয়ত যখন কোনো বিধানের ক্ষেত্রে সহজ করার উদ্দেশ্যে ছাড় দেয় তখন এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করে না যাতে নফস বেলেগাম অর্থাৎ বন্ধনহীন হয়ে যায় এবং ঐ বিধানকে ভুলে যায়। এখানে মোজার উপর মাসেহ করার জন্য তিনটি শর্তারোপ করেছে।

প্রথম শর্ত হলো : মাসেহ করার জন্য সময় নির্ধারণ করা। মুকীমের জন্য একদিন একরাত। আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্র। কারণ এ সময় অর্থাৎ একদিন একরাত্র কোনো বিষয় দেখাশুনা করার জন্য একটি উত্তম সময়। যদি কেউ তা কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করে। এমনিভাবে তিন দিন তিন রাতও। সুতরাং মুকীম ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে এ সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে মূলত তাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে।

দ্বিতীয় শর্ত হলো : মোজা পবিত্রাবস্থায় পরিধান করতে হবে। এটা এজন্য যে, যেন বান্দার স্মরণ থাকে যে, তার পদযুগল পবিত্রতার উপরই রয়েছে। গুপ্তাঙ্গের উপর কেয়াছ করে যেন গুপ্তাঙ্গসমূহে ময়লা কাদা স্বল্প পরিমাণে পৌঁছে থাকে। এ ধরনের কেয়াছ ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যার সম্পর্ক আত্মাকে সতর্ক করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় শর্ত হলো : মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে হবে। ধৌত করার পরিবর্তে। যাতে তা পদযুগল ধোয়ার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং ধোয়ার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে।

হযরত আলী (রা) বলেছেন :

لَوْكَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ -

"যদি দ্বীন আকল ও কেয়াছের ভিত্তিতে হতো তা হলে মোজার নিচে মাসেহ করা যুক্তিযুক্ত ছিল উপরে মাসেহ করা হতে।

আমি বলি যে, মোজার উপর মাসেহ করা যেহেতু ধোয়ার নমুনা অবশিষ্ট রাখা উদ্দেশ্য। এছাড়া তাতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর মোজার নিচের অংশ জমিনে চলাকালে তা অপরিচ্ছন্ন ও কাদা যুক্ত হয়ে যাবে। অতএব মোজার উপরের অংশে মাসেহ করাই যুক্তিযুক্ত। হযরত আলী (রা) শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সাধারণ জনগণ হতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। যেমনটি তাঁর কথা ও ভাষণ হতে প্রমাণিত হয়। তিনি এক্ষেত্রে মানুষ যেন তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে স্বীয় দ্বীনের ক্ষতি সাধন না করে সে উদ্দেশ্যে এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

গোসলের পদ্ধতি

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত মায়মুনা (রা) হতে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং যে বিষয়ে সমগ্র উম্মত ঐকমত্য রয়েছে তা হলো পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে গোসলকারী স্বীয় উভয় হাতকে ধুয়ে নেবে। অতঃপর দেহ ও লিঙ্গের যে স্থানে নাপাকী থাকবে তা ধুয়ে নেবে। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে। তারপর চুলের গোড়ায় অঙ্গুলি দ্বারা ঘষে পানি পৌছাবে। তারপর সমগ্র দেহের উপর পানি ঢালবে। গোসলের এ পুরো পদ্ধতিতেই সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিষয়ে দ্বিমত বা মতভেদ রয়েছে আর তা হচ্ছে– গোসলের সময় অযু করার ক্ষেত্রে পা কখন ধোবে। অযুর সাথে না কি গোসল সমাপন করার পর? কারো কারো মতে যদি এমন জায়গায় গোসল করে যে স্থানে পানি জমে থাকে তাহলে পা পরে ধুবে। আর যদি পানি সাথে সাথে সরে যায় তাহলে অযুর সময়ই পা ধুয়ে নেবে।

গোসল করার পূর্বে হাত ধোয়ার কারণ : ঐ সব কারণ যা অযুর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে দীর্ঘ সময় হাত না ধোয়ার কারণে হাতে ময়লা কাদা লেগে যেতে পারে। আর জানাবাতের পর তো হাত অপবিত্র হওয়া স্বাভাবিকই, তাই তা ধোয়া অত্যাবশ্যকীয়। তখন হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করালে পানি নাপাক ও অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর তা সভ্যতা, ভদ্রতা ও সুরুচির বিপরীত।

গোসল শুরুর পূর্বে লজ্জাস্থান ধৌত করার কারণ : যদি গোসল করার পূর্বে লজ্জাস্থান ধৌত করা না হয় এবং দেহে পানি প্রবাহিত করে দেয়া হয় তাহলে নাপাকী সারা শরীরে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তা পরিষ্কার করা কষ্টকর ও অধিক পরিমাণে পানির প্রয়োজন পড়বে। এজন্য গোসলের পূর্বেই লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতে হবে।

এছাড়াও জানাবতের গোসল তো নাজাছাতে হুকমিয়াকে দূর করার উদ্দেশ্যে করা হয়। যদি নাপাক দেহে জানাবতের গোসল করা হয় তাহলে গোসলের উদ্দেশ্যে দুই নাজাছাত দূর করা হবে। তখন হদছের গোসলের জন্য তা নির্দিষ্ট হবে না। এজন্য নাজাছাতে হাকিকীকে পৃথকভাবে ধুয়ে নেয়া কর্তব্য, যাতে গোসল নাজাছাতে হুকমিয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

গোসলের শুরুতে অযু করা : গোসল হচ্ছে বড় পবিত্রতা। তার দাবি হচ্ছে তা ছোট পবিত্রতার (অযুর) উপর আরো কিছু অধিক প্রভাবশীল হোক যাতে নফস পবিত্রতা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে অবগত থাকে।

অপরদিকে গোসলের বেলায় দেহের ভাঁজ করা অঙ্গগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর অযু হচ্ছে দেহের সে ভাঁজ করা অঙ্গগুলোর প্রতি খেয়াল দেয়া বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ যদি অযু করা ব্যতীত দেহের উপরি অংশ বা মাথা হতে দেহের উপর পানি প্রবাহিত করে দেয়া হয় তাহলে দেহের ভাঁজকৃত বা কোকড়ানো অংশগুলোতে পানি নাও পৌছতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এদিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়, ঐ অংশগুলো শুকনো থেকে যেতে পারে। এজন্য উত্তম হলো গোসলের পূর্বে অযু করে নেয়া যাতে দেহের সমস্ত অংশ ধুয়ে যায়।

পদযুগল পরে ধোয়ার রহস্য : যাতে করে খামাখা-অনর্থক বিনা প্রয়োজনে বারবার পা ধুতে না হয় এজন্য। হে আল্লাহ! যদি কেউ অযুর হেফাজতের উদ্দেশ্যে তা করে তাহলে তা দোষের নয়।

সমগ্র বদনকে তিনবার ধৌত করে সমগ্র দেহকে ভালোভাবে ধৌত করা, দেহের ভাঁজকৃত অংশগুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া ও ভালোভাবে সেগুলোতে পানি পৌছানো এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করে গোসল করার প্রতি গুরুত্ব দেয়াকে মোস্তাহাব ঘোষণা করে শরীয়ত প্রণেতা গোসলকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ مُسْتَتِيرٌ.

"আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও পর্দানশীল।" এ হাদীসের ব্যাখ্যা তার এ বাণী :

يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ.

"আল্লাহ লজ্জাশীলতা ও পর্দা করাকে পছন্দ করেন।" লোক চক্ষু হতে পর্দা করা ওয়াজিব। লোকদের এমনভাবে হওয়া উচিত যেন যদি কখনো হঠাৎ করে কেউ উপস্থিত হয়ে যায় তাহলেও যেন তার সতর দেখতে না পায়। এরূপ করা মোস্তাহাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

خُذِىْ فُرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَطَهِّرِىْ بِهَا.

মিশকে ভেজানো কাপড়ের টুকরা নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। অর্থাৎ তা দ্বারা রক্তের চিহ্ন দূর করে নাও।

আমি বলি যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক অর্থে হায়েজা-ঋতুবতী নারীকে মেশকে ভেজানো কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করে রক্তের দাগ মুছে নিয়ে পবিত্র হতে হুকুম করেছেন।

তন্মধ্যে (১) এর দ্বারা অধিক পরিমাণে পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য। কারণ খুশবু পবিত্রতার কাজ করে থাকে অর্থাৎ অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করে। কষ্টকর হওয়ার কারণে সকল গোসলের সময় সুগন্ধি ব্যবহারের বিধান দেয়া হয়নি।

(২) মেশক মিশ্রিত নেকড়া ব্যবহার করার দ্বারা হায়েজের- ঋতুস্রাবের কারণে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তা দূর করা উদ্দেশ্য।

(৩) হায়েজ তথা ঋতু শেষ হওয়া ও পবিত্রতা আরম্ভ হওয়ার শুরুর সময়টি হচ্ছে সন্তান কামনা করার সময়। এ সময়ে স্বামী-স্ত্রী একের প্রতি অপরের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এবং রেহেমেও সন্তান ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন সুগন্ধি তাকে আরো অধিক শক্তি সঞ্চয়ে সহায়তা করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছা হতে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি (এক ছায় প্রায় এক কেজি আর এক মুদ হলো ৭৮৭ গ্রাম) গোসলের ক্ষেত্রে এবং এক মুদ পানি অযুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। মধ্যমদের দেহের জন্য এ পরিমাণ পানির ব্যবহার যথেষ্ট।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَوَانْقُوا الْبَشْرَةَ ـ

"প্রত্যেক পশমের নিচে অপবিত্রতা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকটি পশমকে ধৌত কর ও চামড়াকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর।

এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

مَنْ تَرَكَ مَوْضَعَ شَعْرَةٍ مِن الْجَنَابَةِ لَمْ يَغْسِلُهَا، فَعَلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا ـ

"যে ব্যক্তি একটি পশম পরিমাণ অপবিত্রতা গোসলের সময় ত্যাগ করল– যা ধৌত করেনি তাহলে সে অপবিত্রতার জন্য তাকে এমন এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।"

আমি বলি যে, এর রহস্য হলো যেমনটি আমরা অযু সংক্রান্ত ব্যাপারে ও অযু পরিপূর্ণভাবে হওয়ার বিষয়ে বলেছি, অর্থাৎ যখন দেহের সমগ্র অংশ একটি পশমসহ ভালোভাবে ধৌত করা হবে তখনি পরিপূর্ণভাবে গোসল হবে। ব্যক্তির জানাবাত অবস্থায় তথা অপবিত্র অবস্থায় থাকা এবং অপবিত্রতা বিদূরীত না করা ও এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য করে দেয়। যদি অপবিত্র থেকে যায় তাহলে ঐ অংশের মধ্যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হলো। এ কারণে দেহের ঐ অংশ শাস্তিযোগ্য হবে। এ কারণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হবে যে অংশের মধ্যে পবিত্রতার কমতি হয়েছে।

গোসল ওয়াজিবকারী বস্তুসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ ـ

"যখন কোনো ব্যক্তি নারী উদগম হবে তখন তার বীর্য স্খলন না হলেও তাতে গোসল ওয়াজিব হবে।"

আমি বলি যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের বিভিন্নতা রয়েছে। اكسال তথা সহবাস শুরু করার পর যদি লিঙ্গ থেমে যায় অথবা এমন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ ঘটে যার কারণে স্বামী তার স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যায়, এমতাবস্থায় বীর্য

স্খলন না ঘটে তাহলে এটিকে পরিপূর্ণ মিলনের হুকুমে ধরা হবে কিনা? আর পরিপূর্ণ মিলন বলতে ঐ মিলনকে বুঝানো হয়, যে মিলনে প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং যে মিলনে বীর্য স্খলন ঘটে। যে বর্ণনাটি সত্য ও যে বিষয়ে সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে তা হচ্ছে- যে ব্যক্তিই স্ত্রী উদগম হবে তাতেই তাদের উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে, চাই তাতে বীর্য স্খলন হোক বা না হোক।

উক্ত হাদীস এবং অপর হাদীস ঃ إِنَّمَا الْمَاءُ بِالْمَاءِ "পানি হতে পবিত্রতা পানি দ্বারাই হয়ে থাকে" এর মধ্যে সাম্যতা বিধানের ক্ষেত্রে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে হযরত ইবনে আবাস (রা) বলেছেন যে, ..إِنَّمَا الْمَاءُ بِالْمَاءِ

এ হাদীস স্বপ্ন দোষের এহতেলামেয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এতে যা রয়েছে তাই অর্থাৎ এ হাদীসের শানে অরুদ পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের খেলাপ। যেহেতু বিষয়ের বিভিন্নতা রয়েছে সেহেতু বৈপরীত্য শেষ হয়ে গেছে। হযরত উবাই ইবনে কাব বলেছেন যে, বীর্য স্খলনের দ্বারা গোসল ওয়াজিব হওয়া ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার বিষয়টি সহজ করার জন্য ছিল, পরে তা মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে।

হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের এবং উবাই বিন কাআব ও আবু আইউব (রা)-এর সকলের থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যেই তার স্ত্রী উদগম হবে এবং তার বীর্য স্খলন হবে না তাকে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করে নিতে হবে। এবং সে তার লিঙ্গ ধুয়ে নেবে। এ বর্ণনাটি মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত রয়েছে।

আমার দৃষ্টিতে এ হাদীসকে مُبَاشَرَت فَاحِشَةً তথা এমন যৌন মিলন ধরা হবে যাতে কোনো আড়াল ব্যতীত লিঙ্গকে লিঙ্গের সাথে লাগানো হবে এবং পুং লিঙ্গকে স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে না। শুধুমাত্র তখনি গোসল ওয়াজিব হবে যখন বীর্য স্খলন হবে। তা না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। এ জাতীয় মিলনকেও কখনো কখনো যৌন মিলন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে তার বস্ত্র ভিজা দেখতে পায়, আর্দ্রতা অনুভব করে এবং স্বপ্নের কথা স্মরণ নেই। স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে পড়ে না তার বিধান কি? তিনি বললেন- "তাকে গোসল করতে হবে।" তাঁকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হলো, যে স্বপ্নে দেখেছে যে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু সে আর্দ্রতা অনুভব করে

না বা আর্দ্রতা দেখতে পায় না তার বিধান কি? তিনি বললেন, "তাকে গোসল করতে হবে না।"

আমি বলছি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোসল ওয়াজিব হওয়াকে আর্দ্রতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। স্বপ্ন দেখার, স্বপ্নদোষ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেন নি। কারণ স্বপ্ন দেখা কখনো কখনো শুধুমাত্র অন্তরের খেয়ালই হয়ে থাকে। তার কোনো তাছির পরিলক্ষিত হয় না। আবার কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে শাহাওয়াত তথা কামভাব পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ বীর্য স্খলন হয়ে যায়। তখন আবশ্যই আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকবে। তখন আর্দ্রতার উপরই হুকুম দেয়া হবে।

আর আর্দ্রতা এমন এক অবস্থা যা অনুভব করা যায়। কারণ বান্দা তো কখনো কখনো স্বপ্নের কথা ভুলে যায়। এজন্য গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম আর্দ্রতার সাথে সম্পৃক্ত, স্বপ্ন দেখার সাথে নয়। পবিত্রতা ও হায়েজ- ঋতুকালের ও পবিত্রতার দীর্ঘায়িত হওয়া বা স্বল্পমেয়াদী হওয়া নারীর মেজাজ তথা স্বভাব, খাদ্য ও এ জাতীয় অপরাপর বস্তুর বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এতদুভয়ের জন্য এমন একটা নির্ধারিত সময় নির্ধারিত করা যা সকল নারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে তা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে নারীদের অভ্যাসের বিষয়টিকে ধর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করাই বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। স্বয়ং রমণী যে রক্তকে হায়েজের তথা ঋতুস্রাবের রক্ত মনে করবেন তাই হায়েজ। আর যে রক্তকে ইস্তিহাজার রক্ত মনে করবে তাই ইস্তিহাজার রক্ত। সাহাবা ও তাবেয়ীনদের এ ব্যাপারে মতবিরোধের কারণও এ যে, তাঁরা রমণীদের অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়েছেন, গড়ে কোনো বিষয় নির্ধারিত করেননি।

হামনা (রা) ইস্তিহাজা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মাসয়ালা জানতে চাইলে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রুই এবং লেগাম বাঁধার হুকুম দিলেন। এবং তাকে দুটি বিষয়ে বললেন।

আমি বলি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, ইস্তিহাজার রক্ত কোনো সুস্থ নারীর দেহের রক্ত নয় বরং তা অসুস্থ নারীর রক্ত। ইস্তিহাজার কারণে দীর্ঘ লম্বা সময় পর্যন্ত নামায ত্যাগ করার কারণে নামাযের প্রতি অনীহা প্রদর্শিত হয়। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিহাজার সময় পৃথক ও নির্বাচিত করে নেয়ার হুকুম দিয়েছেন, যাতে সে হায়েজের তথা মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে নামায বাদ দিতে এবং ইস্তিহাজার দিনগুলোতে নামায আদায় করতে পারে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হযরত হামনাকে দুটি বিষয় বলে দিলেন– (১) তিনি বললেন যে, ইস্তিহাজা কোনো রগের রক্ত। অর্থাৎ এটি একটি পেঁচানো অসুস্থতা। আর এ রক্ত নাকছির তথা নাক হতে রক্ত ক্ষরণের ন্যায় রক্ত। হায়েজের বা ঋতুস্রাবের রক্ত নয়। যদি নারী সুস্থ অবস্থায় প্রতি মাসের ঋতুস্রাবের জন্য একটা নির্ধারিত সময় থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রেও ঐ নিয়মই মেনে চলবে। নিজের ইদ্দত অনুযায়ী নিজেকে ঋতুবতী মনে করবে। যখন সে সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন নিজেকে পবিত্র মনে করবে এবং নিয়মানুযায়ী নামায আদায় করতে আরম্ভ করে দেবে। এভাবে সে নিজের হায়েজকে ইস্তিহাজা হতে পৃথক করে নেবে। তখন তাকে হায়েজ ও ইস্তিহাজার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে নিতে হবে। তখন রক্তের রং দেখে তা ঠিক করতে পারবে। যেমন কালো রঙের রক্তকে ঋতুস্রাবের রক্ত ধরে নেবে। এ ছাড়া তার পূর্বেকার নিয়মিত নিয়মকে ইস্তিহাজা ধরে নেবে।

(২) ইস্তিহাজা যেহেতু বিকৃত ঋতুস্রাব এজন্য ইস্তিহাজা বিশিষ্ট নারীকে দৈনিক পাঁচবার গোসল করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে হবে। যদি তা কষ্টকর মনে করে তাহলে তিনবার গোসল করতে হবে। যেহেতু এটা হায়েজ নয় বরং বিকৃত হায়েজ; সেহেতু নামায মাফ হবে না। সে এমতাবস্থায় নামাযও পড়বে এবং রোজাও রাখবে।

রুই ব্যবহার ও লেগাম বাঁধার মধ্যে হিকমত : (১) রক্ত অবস্থানরত রক্তের সাথে মিশে যাবে এবং সে স্থান হতে অন্যত্র প্রসারিত হতে পারবে না। অর্থাৎ রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। (২) যাতে রক্ত নারী দেহ এবং পরিধেয় কাপড়ে লাগতে না পারে। জমহুর ফকীহগণ প্রথম অবস্থার উপর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অপবিত্র ও অযুহীন ব্যক্তির জন্য কি করা বৈধ আর কি করা অবৈধ

আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে নামায, কাবা ও পবিত্র কুরআন। এগুলোর প্রতি সবচেয়ে বড় সম্মান প্রদর্শন হলো পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত মানুষ তার নিকটবর্তী হবে না। অর্থাৎ প্রথমে এমন কোনো আমল করবে যাতে অন্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলির সম্মান ও বিশালতা সৃষ্টি হয়। এ জন্য উক্ত তিনটি আল্লাহর নিদর্শনের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য পবিত্রতা, পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন অতীব জরুরি।

পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য অযু করা শর্ত করা হয়নি। কারণ সর্ব সময়ে কুরআন পাঠের জন্য পবিত্রতার শর্তারোপ করলে পবিত্র কুরআন হেফজ করা ও তা শিক্ষা করার ব্যাঘাত ঘটবে। সুতরাং সর্বদা কুরআন পাঠের দরজা উন্মুক্ত রাখা। সেজন্য উৎসাহ, তারগীব দেয়া এবং যে ব্যক্তি কুরআন হেফজ করতে চায় তার জন্য সহজ করা অতীব প্রয়োজন। হদছে আকবর তথা বড় ধরনের অপবিত্রতার ক্ষেত্রে পবিত্রতার প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং অযু ব্যতীত নিজে কুরআন পাঠ করা জায়েজ নেই। আর অপবিত্র ও হায়েজ তথা ঋতুবতী নারীর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। তা এজন্য যে, মসজিদ তৈরিই করা হয়েছে নামায ও যিকিরের উদ্দেশ্যে। আর মসজিদ আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত এবং পবিত্র কাবা শরীফের নমুনা। নবীর সাহচর্য লাভের জন্য পবিত্রতা অর্জনকে শর্ত করা হয়নি। তা এজন্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক বস্তুর সম্মান তার অবস্থান প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। নবী তো একজন মানুষই ছিলেন। অন্যান্য মানুষের যেমন হদছ, জানাবত হয় তাঁরও তাই হয়তো হয়। সুতরাং তাঁর সাহচর্যের জন্য পবিত্রতা অর্জন শর্ত করা বিপরীত বস্তু বা বিষয় হয়ে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ .

"ঐ ঘরে ফিরিশতা প্রবশে করে না, যে ঘরে ছবি থাকে, কুকুর থাকে ও যে ঘরে অপবিত্র ব্যক্তি থাকে।" আমি বলি যে, এর অর্থ হলো– ফিরিশতারা এ বিষয়গুলোকে অপছন্দ করেন ও এগুলো এড়িয়ে চলেন। ফেরেশতারা যা পছন্দ করে এগুলো তার বিপরীত। ফিরিশতারা পবিত্রতা পছন্দ করে এবং মূর্তি পূজা করে অপছন্দ।

রাত্রে যার অপবিত্রাবস্থা হয় তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ

"অযু কর, তোমার লিঙ্গ ধুয়ে নাও, অতঃপর নিদ্রা যাও।"

আমি বলি যে, যখন অপবিত্রতা– জানাবাত ফিরিশতাদের অবস্থার বিপরীত তাহলে মুমিনদের কর্তব্য হলো তারা যত্নহীন হবে না নিজেদের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ শয়নে ও ভক্ষণে জানাবাতের তথা অপবিত্রতার সাথে যখন কিছু

ধরনের পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম হবে তখন ছোট পবিত্রতাও ত্যাগ করবে না। কারণ উভয় পবিত্রতার বিষয়টি একই। যদিও শরীয়তদাতা দুটাকে দু ধরনের অপবিত্রতার জন্য ভাগ করে দিয়েছেন।

তাইয়াম্মুমের বর্ণনা

মহান আল্লাহর বিধানে তার বান্দারা যে কাজ করতে অক্ষম, তা সহজতর করার একটি সুন্নাত তথা নিয়ম চালু রয়েছে। সে সব সহজ করার পদ্ধতিগুলোর মাঝে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দাবি হচ্ছে যে সব কাজ কষ্টসাধ্য সে সব তার বান্দার ঘাড় হতে বাদ দিয়ে দেয়া এবং তার বিকল্প ব্যবস্থা করা যাতে লোকদের অন্তরে প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। আর তা পরিপূর্ণভাবে রহিত করার কারণে কোনো ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয়। যা তিনি তাদের উপর অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছিলেন। পবিত্রতা বর্জনে তারা অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। সুতরাং তাই ঘুমের মাধ্যমে অসুস্থতা ও সফররত অবস্থায় অযু ও গোসলের বিধানকে রহিত করে দিয়েছেন।

যখন বিষয়টি এমন হলো তখন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে হুকুম হলো তাইয়াম্মুমকে অযু ও গোসলের স্থানে স্থলাভিষিক্ত করার। এতে করে অস্তিত্ব লাভ করল এক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান এ মর্মে যে, তাইয়াম্মুমও এক ধরনরে পবিত্রতাই। আর এ বিধান ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোর অন্যতম বিধানে পরিণত হলো যেসব বিধানে উম্মতে, মিল্লাতে মুহাম্মদী অন্যান্য মিল্লাত হতে শ্রেষ্ঠতম। আর এক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবীর বাণী হলো :

جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

"আমরা যখন পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি পাব না তখন জমিনের মাটি আমাদের জন্য পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।"

আমি বলি যে, মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করার বিধান দেয়ার কারণ হলো :

(১) মাটি সহজ প্রাপ্য। সাগর ব্যতীত সকল স্থানেই তা পাওয়া যায়। সুতরাং এর দ্বারা সমস্যার সমাধান করা অধিকতর সহজ। (২) অনেক ক্ষেত্রেই মাটি পবিত্রতার মাধ্যম; যেমন চামড়ার মোজা ও তরবারিতে নাপাক লেগে গেলে তা না ধুয়ে মাটি দ্বারা রগড়িয়ে নিলে নাপাক পবিত্র হয়ে যায়। (৩) মাটিতে হাতে মেরে তা মুখমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে নিজের বিনয় প্রকাশ পায়।

এটাও মুখমণ্ডলকে মাটির সাথে মেলানোর ন্যায়ই। আর তা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দরখাস্তের মতোই। অর্থাৎ পানি না পাওয়া আমাদের দুর্বলতার প্রকাশ। এজন্য তাইয়াম্মুমের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

শরীয়ত অযুর জন্য তাইয়াম্মুম ও গোসলের জন্য তাইয়াম্মুমের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য করেনি। উভয়ের তাইয়াম্মুম একই ধরনের। আল্লাহ তায়ালা প্রচলিত তাইয়াম্মুমের মধ্যে এ বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন যে, সে উভয় হদছের– অপবিত্রতাকে পবিত্র করতে সক্ষম। সুতরাং তাইয়াম্মুম তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত। এ ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক তাইয়াম্মুমের প্রয়োজন নেই। আর এ বিধান সে সব ক্ষেত্রে মেনে নেয়া উচিত যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানের রহস্য সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝে আসে না। লোকদের অন্তর এতেই প্রশান্তি লাভ করে।

গোসলের তাইয়াম্মুমের জন্য মাটিতে লুটোপুটি খাওয়া এক ধরনের পেরেশানি। তাতে দোষ সম্পূর্ণভাবে বিদূরীত হয় না। এক দুর্বলতার এলাজ হলে দ্বিতীয় দুর্বলতা এসে পড়ে। এজন্য গোসলের তাইয়াম্মুমও অযুর তাইয়াম্মুমের মতোই।

ভীষণ ঠাণ্ডাও রোগের ন্যায়ই। যদি ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে আর তখন ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাইয়াম্মুম করা জায়েজ। আমর ইবনুল আসের হাদীস তার প্রমাণ। সফর কোনো শর্ত নয় বরং তা পানি পাওয়া না পাওয়ার একটি কারণ। যা সহজে বুঝে আসে।

তাইয়াম্মুমের ক্ষেত্রে পা মাসেহ করার হুকুম এজন্য দেয়া হয়নি। কারণ পা হলো ময়লা কাদা লেগে থাকার জায়গা। ঐ বস্তুরই হুকুম দেয়া হয় যার দ্বারা আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।

তাইয়াম্মুমের পদ্ধতি : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিমত পূর্ণ মাসায়েলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম একটি।

অন্বেষীদের মধ্যকার অধিকাংশ ফকীহগণ মোহাদ্দেসীনদের অনুসৃত পদ্ধতিই গ্রহণ ও অনুসরণ করেছেন যে, তাইয়াম্মুম হলো দুবার জমিনে হাত মারা। একবার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য, দ্বিতীয়বার কুনইসহ উভয় হাত মাসেহ করার জন্য।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম হাদীস হলো হযরত আম্মার (রা) বর্ণিত হাদীস :

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ -

"তোমার তাইয়াম্মুমের জন্য যথেষ্ট হলো, তোমার উভয় হাত দ্বারা জমিনে মারা তারপর তাতে ফু দিয়ে তা দ্বারা প্রথমে তোমার মুখমণ্ডল ও পরে তোমার হাত মুছে নেয়া।"

ইবনে ইমরের বর্ণনায় আছে যে,

اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ -

"তাইয়াম্মুম হলো দুবার জমিনে হাত মারা। একবার মুখমণ্ডলের জন্য আরেকবার উভয় হাত কনুই সহ মাসেহ করার জন্য।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল ও সাহাবাদের আমল উভয় পদ্ধতিতেই বর্ণিত হয়েছে।

উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদান : উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দিকে হাদীসের শব্দই পথ নির্দেশ করে إِنَّمَا يَكْفِيكَ "তোমার জন্য যথেষ্ট" এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাইয়াম্মুমের নিম্নতম সীমা হলো এতটুকু। আর দ্বিতীয়টি হলো তাইম্মুমের সুন্নাত পদ্ধতি। সাহাবা ও তাবেয়ীদের তাইয়াম্মুমের বিষয়ে মতপার্থক্যের বিষয় হলো কেউ সর্বনিম্ন সীমায় আমল করে আর কেউ সুন্নাত পদ্ধতির উপর আমল করে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলের ব্যাখ্যা এরূপ হতে পারে যে, তিনি আম্মারকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাইয়াম্মুমের মধ্যে জমিনে হাত মারার কারণে যা হাতে লেগেছে তাই যথেষ্ট। এখানে জমিনে শুয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর তিনি এক্ষেত্রে তাইয়াম্মুমকারী কতটুকু অংশ মাসেহ করবে তা বলে দেয়াও উদ্দেশ্য নয়। আর না কতবার জমিনে হাত মারাবে তা বলাই উদ্দেশ্য। অর إِنَّمَا শব্দ দ্বারা যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে তা দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাইয়াম্মুমের মধ্যে অযুর ও গোসলের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই।

এ জাতীয় মাসয়ালার ক্ষেত্রে যতটুকুতে জিম্মাদারী পূর্ণ হয় অতটুকু গ্রহণ করাই মানুষের কর্তব্য।

হযরত উমর ও ইবনে মাসউদ-এর মতে জানাবতের ক্ষেত্রে তাইয়াম্মুম জায়েজ নেই। তারা উভয় আয়াতকে লমছ অর্থাৎ ছোয়া তথা স্পর্শ করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন। তারা বলেন যে, নারীকে স্পর্শ করা অযু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু ইমরান ও আম্মারের হাদীস এর বিপরীত বুঝায়।

আমি কোনো বিশুদ্ধ হাদীসে এরূপ দেখতে পাইনি যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের জন্য তাইয়াম্মুম করতে হবে। অথবা ভেগে যাওয়া ক্রীতদাসের জন্য বা এ জাতীয়দের জন্য তাইয়াম্মুম জায়েজ নেই। এ সবই ইস্তিমাতী মাসায়ালা।

জখম ওয়ালা ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلٰى جُرْحِهٖ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهٖ۔

"তার জন্য যথেষ্ট ছিল তাইয়াম্মুম করা এবং স্বীয় জখমের উপর কোনো কাপড় বেঁধে নিয়ে তার উপর মাসেহ করা এবং অবশিষ্ট অঙ্গ ধুয়ে নেওয়া।"

আমি বলি যে, যেমনিভাবে তাইয়াম্মুম সমগ্র দেহের গোসলের স্থলাভিষিক্ত তেমনিভাবে দেহের একটি অংশের গোসলেরও স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ তাইয়াম্মুম যেমনিভাবে সমগ্র দেহের অপবিত্রতা দূর করে তেমনিভাবে দেহের এক অংশের অপবিত্রতাও দূর করে থাকে।

তাইয়াম্মুমের মাঝে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ দেহ ও আংশিক দেহ উভয়ের পবিত্রকরণের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। জখমের উপর অথবা পট্টির উপর মাসেহ করার হুকুম পূর্বে উল্লেখিত মোজার উপর মাসেহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো এখানে মাসেহ এজন্য যেন এ স্থানটি ধোয়ার কথা স্মরণে থাকে। আর এ মাসেহ গোসলের নমুনা।

রাসূলুল্লাহ ((সা)-এর বাণী :

اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وُضُوْءُ الْمُؤْمِنِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ

"পবিত্র মাটিই মুসলমানের পবিত্রতার মাধ্যম। যদি দশ বছর দীর্ঘ সময় পর্যন্তও পানি না পাওয়া যায়।"

আমি বলি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সীমালঙ্ঘন করার পথ রুদ্ধ করা। এসব ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারীরা সীমালঙ্ঘন করে থাকে। শরীয়ত যেসব ক্ষেত্রে রোখছত দিয়েছে সে সব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজ করে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার আদব

পায়খানা প্রস্রাবের আদব

এটি কতগুলো বিষয়ের সাথে জড়িত :

(১) কেবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আর তা হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا -

"যখন তোমরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে যাবে তখন কেবলার দিকে মুখও করো না। আর কেবলার দিকে পিঠও দিও না।"

এতে অপর একটি হিকমত নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে ইবাদতের সময় অন্তরকে আল্লাহর দিকে একাগ্র রাখা জরুরি। আর অন্তরকে আল্লার দিকে একাগ্র রাখা একটি গোপনীয় বিষয়। এজন্য অত্যাবশ্যকীয় হচ্ছে এমন একটি বস্তুকে নিশানা হিসেবে ঠিক করে নেয়া যা অন্তরের একাগ্রতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। পূর্বেকার শরীয়তগুলোতে ঐ সব ইবাদতখানায় পৌছাকে আন্তরিক একাগ্রতার মাকাম করা হয়েছিল। যা আল্লাহর বন্দেগীর জন্য তৈরি করা হতো আর যা আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে গণ্য হতো। আর আমাদের শরীয়তে কেবলার দিকে মুখ করা এবং তাকবীর বলাকে তাওয়াজ্জুহে কলবীর- তথা অন্তরের একাগ্রতার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কেবলামুখী হওয়া যখন আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অন্তরের একাগ্র হওয়া এবং আল্লাহর যিকিরে অন্তর মগ্ন হওয়ার স্থলাভিষিক্ত। আর তা এমন পর্যায়ের যে, কেবলার দিকে মুখ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ স্মরণ হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে এ কথা ইস্তিমাত করলেন যে, কেবলামুখী হওয়াকে সম্মানের সাথে খাছ করা জরুরি। আর সে খাছ করার ছুরত হলো প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার সময় কেবলার দিকে মুখ করা বা পেছন দেয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না। অর্থাৎ যে অবস্থা নামাযের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত তা করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার দিকে মুখ করে ও পিঠ দিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা বর্ণিত আছে। এক্ষেত্রে জঙ্গলে কেবলামুখী হওয়া ও পিঠ দেয়া নিষিদ্ধ এবং দালানের ভেতরে তা মোবাহ্ বলা হয়েছে। এবং নিষিদ্ধকে মাকরূহ হিসেবে ধরা হয়েছে। আর এটা অধিক পরিষ্কার।

তন্মধ্যে রয়েছে : পবিত্রতা প্রমাণ করা। তিনটি পাথর খণ্ডের কমে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনবার পরিষ্কার করতে হবে। কারণ সাধারণত তিনবারের কমে পবিত্রতা অর্জিত হয় না। তিন খণ্ড পাথর দ্বারা, ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করার পর পানি ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

তন্মধ্যে রয়েছে : সেই বস্তু হতে বেঁচে থাকা যা মানুষকে কষ্ট দেয়। যেমন যে সব স্থানে মানুষ ছায়া পায়– গাছের নিচে, মানুষের চলার পথে, মানুষ যে স্থানে বসে কথাবার্তা বলে এবং চলমান নয় স্থায়ী পানিতে ইস্তিনজা করা। হাঁড় দ্বারা ইস্তিনজা করা হতেও বিরত থাকতে হবে। কারণ তা জ্বিনের খাদ্য। এমনি সে সব বস্তু হতে বেঁচে থাকতে হবে যা দ্বারা উপকার লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হচ্ছে- اتقوا الاعنين। "তোমরা দুটি ফুৎকার দাতা বস্তু হতে বেঁচে থাক।" তাদের ফুৎকার হতে বেঁচে থাকার অর্থ হলো তাদের থেকে কষ্ট পাওয়া হতে বেঁচে থাক। অথবা এমন বস্তু হতে বেঁচে থাকা যা স্বয়ং নিজেকে কষ্ট দেয়. যেমন গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করা। কারণ গর্ত কখনো সাপের আশ্রয়স্থল হতে পারে, প্রস্রাবের কারণে সাপ বের হয়ে কামড় দিতে পারে, দংশন করতে পারে।

তন্মধ্যে রয়েছে : উত্তম অভ্যাস গ্রহণ করা। অতএব ডান হাত দ্বারা মুছবে না। ডান হাত দ্বারা পেশাবের অঙ্গ ধরবে না, আর সে ইস্তিনজা করবে না গোবর দ্বারা। বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করবে।

তন্মধ্যে রয়েছে : পর্দার প্রতি গুরুত্বারোপ করা। এতদূর চলে যাবে যাতে কোনো শব্দ শুনা না যায়। কোনো ধরনের গন্ধ অনুভূত না হয় আর না তার সতর পরিদৃষ্ট হয়, দেখা যায়। ভূমির কাছাকাছি হওয়ার পূর্বে কাপড় উঠাবে না। যে খেজুর বৃক্ষের আড়াল হওয়ার ন্যায় পর্দা করবে যা তার নিম্নাংশকে আড়াল করে নেবে। এমন অবস্থা পাওয়া না গেলে মাটির টিবিকে পেছনে করে বসবে। কারণ মানুষের ইস্তিনজায় বসার স্থান নিয়ে শয়তান খেলা করে থাকে। কেননা শয়তানকে এসব নিন্দনীয় ও খারাপ কাজ করার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

তন্মধ্যে রয়েছে : দেহ ও পোশাকে– পরিধেয় কাপড়ে যেন নাপাকি লেগে না যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো :

اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ

তোমাদের মধ্যে কেউ পেশাব করার ইচ্ছা করলে তার উচিত হলো সে জন্য কোনো নরম স্থান নির্বাচন করে নেয়।

তন্মধ্যে রয়েছে : ওয়াসওয়াসা– সন্দেহ দূর করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَلَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.

"তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে। কারণ এর থেকেই অধিকাংশ ওয়াসওয়াসার ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : لاتبل قائما

"দাঁড়িয়ে পেশাব করো না।" আমার মতে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব দাঁড়িয়ে করতে বারণ করেছেন কারণ তিনি তা অপছন্দ করেছেন। কারণ দাঁড়িয়ে পেশাব করলে দেহ এবং পরিধেয় কাপড়ে পেশাবের ফোঁটা-ছিটা পড়তে পারে। দাঁড়িয়ে পেশাব করা ভদ্রতা ও সম্মানের হানিকর ও উত্তম অভ্যাসের পরিপন্থী। এতে সতর উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

اِنَّ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَاِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

"প্রস্রাব পায়খানার জায়গা নোংরা স্থান। তোমাদের কেউ প্রস্রাব ও পায়খানায় গমন করতে গেলে বলবে :

اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

আমি অপবিত্র নারী ও পুরুষ জ্বিন হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। আবার প্রস্রাবখানা ও পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় বলবে غفرانك হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা কামনা করি।

আমি বলি যে, পেশাবখানা ও পায়খানায় যাওয়ার সময় এ দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব। اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র নারী ও পুরুষ জ্বিন হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" কারণ

বাইতুল খালাতে শয়তান একত্রিত হয়ে থাকে। তা এজন্য যে, তারা নাপাকী পছন্দ করে। আর বাইতুলখালা হতে বের হওয়ার সময় বলবে غُفْرَانَكَ "আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।" কারণ এ সময়টি হলো আল্লাহর স্মরণ, যিকির ত্যাগ করে শয়তানের সাথে একত্রিত হওয়ার মুহূর্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ الحدث -

"তাদের একজন প্রস্রাব হতে পবিত্রতার্জন করত না। (আল হাদীস)

এ সম্পর্কে আমি বলছি যে, প্রস্রাব হতে পবিত্রতার্জন করা ওয়াজেব। একান্তভাবে কর্তব্য। প্রস্রাব হতে পবিত্রতা استـبـراء অর্জন বলতে বুঝায় প্রস্রাব করার পর দাঁড়িয়ে থাকবে তা হাঁটবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণে মনে হবে যে, প্রস্রাবনালীতে আর কোনো প্রস্রাব অবশিষ্ট নেই।

এর মাঝে একথা বিদ্যমান রয়েছে যে, অপবিত্র থাকা এবং সে কাজ করা যা পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে– এগুলো কবর আযাবের কারণ হয়।

অবশিষ্ট রইল খেজুরের ডালা ভেঙ্গে উভয় কবরে স্থাপন করার বিষয়। এতে যে রহস্য নিহিত রয়েছে তাহলো শাফায়াত করা। যখন তাদের কুফরীর কারণে পরিপূর্ণ শাফায়াত অসম্ভব ছিল তখন তাদের কবরের আযাব লাঘবের জন্য শাফায়াত করা হলো খেজুর ডালা ভেঙ্গে তাদের কবরে স্থাপনের মাধ্যমে।

ফিতরাত ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَاَعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْاَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْاِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِىْ الْاِسْتِنْجَاءَ، قَالَ الرَّاوِىْ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ -

দশটি বস্তু ফিতরতী প্রকৃতিগত– (১) মোছ কেটে ফেলা, (২) দাড়িকে ছেড়ে দেয়া, (৩) মেছওয়াক করা (৪) নাকে পানি দেয়া (৫) নখ কাটা (৬) বাহ্যিক মালিন্য দূরে ফেলা (৭) বগলের পশম কেটে ফেলা (৮) নিম্নাঙ্গের পশম

কেটে ফেলা। (৯) ইস্তিনজা করা। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, আমি দশ নম্বরটি ভুলে গেছি; হতে পারে সেটি গরগরা কুলি করা।

আমি বলছি যে, এ সুন্নাতগুলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকেই চালু রয়েছে এবং হানাফী সঠিক পথের অনুসারী সকল উম্মতের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এবং তাদের অন্তরে ও তাদের খালেছ আকিদার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এর উপর তাদের জীবন মরণ নির্ভরশীল যুগযুগ ধরে। এ কারণে এ সুন্নাতগুলোকে 'ফিতরাত' প্রকৃতি বলা হয়। আর এগুলো শায়ায়ের তথা মিল্লাতে ইবরাহিমীর অভ্যাস, রীতিনীতি ও চাল-চলন। প্রত্যেক মিল্লাতের জন্যই এমন সব চিহ্ন ও রীতিনীতি জরুরি যা দ্বারা তাকে চেনা যায়। যার জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা যায়। যাতে সে মিল্লাতের আনুগত্য ও নাফরমানি একটা অনুভবমূলক বস্তু হয়ে যায়। শায়ায়ের তথা অভ্যাস, চিহ্ন ও রীতিনীতি ঐ সব বস্তুকেই করা হয় যা অধিক পরিমাণে মিল্লাতের মধ্যে পাওয়ায়, যা বার বার করা হয়। এবং যা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে। এর মধ্য অনেক অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। যাকে লোকদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে নেয়।

এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান কথা হলো : মানবদেহে এমন কিছু পশম, চুল, কেশ, লোম উৎপন্ন হয় যা হদছ তথা নাজাছাতে হুকমীর কাজ করে। এগুলোর মধ্যে আছে মোচ, বগলের পশম ও দেহের নিম্নাঙ্গের পশম। এমনিভাবে মাথার চুল এবং দাড়ি ইত্যাদির বিক্ষিপ্ত হওয়াও তবিয়তের জন্য খারাপ। এজন্য এগুলোকে কাটা এবং এগুলোকে সুন্দর ও পরিপাটি করার নির্দেশ রয়েছে। দেহে বিভিন্ন চর্মরোগের ও খোশ পাঁচড়ার আক্রান্ত হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় ডাক্তারগণ বলেছেন যে, এ কারণে মন চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং কর্ম ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এ রোগগুলো এমন যে, যার চিহ্ন দেহে দেখা যায় এবং হদছের, নাজাছাতের কাজ করে। এগুলোকে দূর করা পবিত্রতার অঙ্গ।

দাড়ি ছোট এবং বড়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। দাড়ি পুরুষের সৌন্দর্য। দাড়ি পুরুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা দাতা। এজন্য দাড়ি বৃদ্ধি করা, লম্বা করা জরুরি। দাড়ি মুণ্ডানো অগ্নি উপাসকদের রীতি ছিল। এতে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধিত হয়। দাড়ি মুণ্ডানোর দ্বারা সর্দার, বড়লোক এবং সাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সবাই একই শ্রেণীর বলে পরিগণিত হয়।

যে ব্যক্তির মোচ বড় হয় তার মোচের সাথে খাদ্য ও পানীয় লেগে যায়। তাতে ময়লা কাদা জমা হয়। এটা অর্থাৎ মোচ লম্বা করা অগ্নি উপাসকদের

মজুসীদের রীতি। সুতরাং মোচ কেটে ফেলা জরুরি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হচ্ছে :

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، قَصُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحٰى ـ

"তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর। মোচ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।"

কুলি করা, নাক পরিষ্কার করা এবং মেছওয়াক করার মধ্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও মালিন্য ও দুর্গন্ধ দূর হয়।

খতনা করার সময় যে চামড়া কেটে ফেলা হয় তা একটি বাড়তি চামড়া ও অপ্রয়োজনীয় চামড়া। তাতে ময়লা কাদা জমাট বাঁধে। তা থাকা অবস্থায় উত্তম রূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হওয়া যায় না। এর কারণে পেশাবের কিছু অংশ ভেতরে থেকে যায়। খাতনা না করলে পুরুষ এবং নারীর যৌন মিলনের আনন্দও কমে যায়। মানব দেহকে অসুন্দর দেখায় এজন্য খতনা করে তা কেটে ফেলা জরুরি হয়ে পড়ে।

তাওরাত শরীফে আছে :

اِنَّ الْخِتَانَ مِيسَمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَذُرِّيَّتِهٖ ـ

খতনা করা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর সন্তানদের, বংশধরদের জন্য আল্লাহর খাছ– বিশেষ নিদর্শন। অর্থাৎ যেভাবে রাজারা তাদের বিশেষ প্রাণীর উপর চিহ্ন– নিশান লাগান যাতে সেগুলো অপরগুলো হতে পৃথক ও বিশেষিত হয়। আবার ঐ সব ক্রীতদাসদের চিহ্নিত করেন যারা সর্বদা তাদের নিকটে অবস্থান করে। যাদের বিক্রয় করার বা আযাদ– মুক্ত করার ইচ্ছা থাকে না। এমনিভাবে খতনা করা ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের চিহ্ন– নিশানা রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যান্য শায়ায়েরের মধ্যে, রীতিনীতি ও চিহ্নের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। ধোঁকা দেয়া যেতে পারে। আর খতনা এমন এক চিহ্ন যার মধ্যে অতি কষ্টে পরিবর্তন করা সম্ভব। এতে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ নেই।

পানি ব্যবহার করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ وَيُرْوٰى الْخِتَانُ ـ

وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ ـ

"চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাত, যথা– লজ্জা কোনো কোনো বর্ণনায় লজ্জার স্থলে খাতনা করানোর কথা বর্ণিত হয়েছে। খুশবু লাগানো, মেছওয়াক করা ও বিবাহ করা।"

আমি বলি যে, আমার মনে হয় এসব বিষয়গুলোও তাহারাত তথা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত।

হায়া-লজ্জাশীলতা : হায়া হলো লজ্জাহীনতা, বাজে ও অশ্লীল আবরণ এবং খারাপ কাজ ত্যাগ করা। এ কাজগুলো নফসকে– ব্যক্তি সত্তাকে কলুষিত ও পংকিল করে। সুগন্ধি লাগানো একটি আনন্দদায়ক কাজ। এতে নফছের মধ্যে আনন্দ ও অন্তরে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। এটাই তাহারাতের তথা পবিত্রতার মূল হাকীকত। আর তা পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলে।

বিবাহ নারীদের প্রতি আগ্রহ থেকে আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে পবিত্র করে তোলে। এবং নারীদের সাথে মিলনের দিকে আগ্রহ সৃষ্টিকারী যেসব কথা দেমাগে ঘুরপাক খায় তা হতে দেমাগকে পবিত্র রাখে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -

"যদি আমার উম্মতের জন্য বিষয়টি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় (অযু করার সময়) মেছওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করতাম।"

আমি বলছি যে, এর উদ্দেশ্য হলো যদি মেছওয়াক করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার ভয় না হতো তাহলে নামাযের অযুর ন্যায় মেছওয়াক করাকেও শর্ত করে দেয়া হতো। এ বিষয়ে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত আছে। এর থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজতেহাদের অধিকার রয়েছে। আর এসব আহকামে শরীয়া– শরীয়তের বিধানাবলি উদ্দেশ্যের মাকাসেদের সাথে সম্পৃক্ত। দীনের ক্ষেত্রে সহজতর করা, সংকীর্ণতা দূর করা শরীয়তের মূলনীতির মধ্যে পরিগণিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেছওয়াক করার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনাকারীর উক্তি :

يَقُوْلُ اُعْ اُعْ كَاَنَّهُ يَتَهَوَّعُ -

মেছওয়াক করার সময় তিনি যেন কাশি দিচ্ছিলেন, যেন বমি করছিলেন। আমি বলছি যে, মেছওয়াক করার সময় যেন হলকের শেষাংশ পর্যন্ত মেছওয়াক পৌছায়। যাতে গলা এবং সিনার কফ ও শ্লেষ্মা বেরিয়ে যায়। মুখের গভীরে মেছওয়াকের মাধ্যমে মুখের ভেতরে ও জিহ্বায় যে ফাঙ্গাস জাতীয় রোগ হয় তা বিদূরীত হয় এবং তাতে গলার স্বর পরিষ্কার হয় এবং মুখের মধ্যে সুগন্ধ হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

حَقٌّ عَلٰى كُلِّ الْمُسْلِمِ اَنْ يَغْسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، يَغْسِلُ فِيْهِ جَسَدَهٗ وَرَأْسَهٗ -

"প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে প্রত্যেক সাত দিনের মাঝে একদিন গোসল করবে। ঐ গোসলে সে নিজের মাথা ও সমগ্র দেহ ভালোভাবে ধুয়ে নেবে।"

আমি বলি যে, প্রতি সাত দিনে একদিন, প্রতি সপ্তাহে একবার গোসল করা একটি দায়েমী সুন্নাত। দেহকে কাদামুক্ত করার ও নফসকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এ সুন্নাত জারি করা হয়েছে। জুমার দিনের সাথে এ গোসল করাকে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, গোসল এবং জুমার নামায একে অপরকে পরিপূর্ণতা দান করে। এতে করে জুমার নামাযের প্রতি তাজিম তথা সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি কারণে গোসল করতেন :

مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ-

(১) জানাবতের কারণে (২) জুমার দিন (৩) সিংগা লাগানোর পর ও (৪) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর।

আমি বলছি যে, সিঙ্গা লাগানোর পর গোসল করার কারণ হচ্ছে- (১) সিংগার কারণে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং প্রতিটি ফোঁটা পৃথক পৃথকভাবে ধৌত করা কষ্টকর হয়। (২) সিংগার দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশ হতে রক্ত শোষণ করে নিয়ে আসা হয়। কাজ সমাপ্ত হলে সে স্থানের রক্ত বন্ধ হয় কিন্তু রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয় না তাই গোসল করার দ্বারা সমগ্র শরীর হতে রক্তের চাপ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মাধ্যমে- (১) গোসলদাতার সমগ্র দেহে ফোঁটা-ছিটে ফোঁটা পড়ে যায়। যা নাপাক করে দেয় গোসলদাতার দেহকে।

দেহের কোন অংশে তা পড়েছে তা বের করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হয়। (২) আমি একদা এক মৃত্যুমুখ যাত্রীর নিকট বসেছিলাম। দেখতে পেলাম যে, রূহ কবজকারী ফিরিশতারা উপস্থিত লোকদের মধ্যে ভীষণ ভয় ভীতির সৃষ্টি করে। আমি অনুভব করলাম যে, তাদের এ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে তাদের অন্তরে স্বস্তির ভাব আসা প্রয়োজন। তাই মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাতার গোসল করে নেয়া কর্তব্য। যাতে তার সকল ভয় ভীতি দূর হয়ে স্বস্তির অবস্থা ফেরত আসে।

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে পানি ও বরই পাতার পানি দ্বারা গোসল করতে হবে। এরূপ নির্দেশ দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর ব্যক্তিকে বলেছেন- الق عنك شعر الكفر.

"তুমি কুফুরীর সময়ের চুল মুণ্ডিয়ে ফেল।"

আমি বলি যে, এর মধ্যে নিহিত রহস্য হচ্ছে, নতুন ইসলাম গ্রহণকারীর সামনে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হবে যে, সে কুফুরী হতে বেরিয়ে এসেছে এবং ইসলামে প্রবেশ করেছে। বাকি আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পানির বিধান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

"তোমাদের কেউ কখনো স্থির পানিতে- যে পানি প্রবহমান নয়-এমন পানিতে পেশাব করে পুনরায় সে পানিতে গোসল করবে না।"

আমি বলি যে, এতে স্থির পানিতে পেশাব করা এবং তাতে গোসল করতে বারণ করা হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে, দু ব্যক্তি এমনভাবে পায়খানায় গমন করবে না যে, তাদের উভয়ের সতর উন্মুক্ত এবং তারা উভয়ে পায়খানা করা অবস্থায় কথাবার্তা বলছে। এতে আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হন। এ বর্ণনা হতে শুধুমাত্র পানিতে প্রস্রাব করা হতে বারণ করা হয়েছে। অপর বর্ণনায় শুধুমাত্র গোসল করা হতে বারণ করা হয়েছে।

এরূপ বলার পেছনে রহস্য : উক্ত বিষয়টির দুটি অবস্থা হতে মুক্ত নয়। (১) এতে তখন পানির অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। অথবা পরিবর্তনের দিকে

ধাবিত হবে। লোকেরা এরূপ করতে দেখতে পাবে এবং প্রত্যেকে এরূপ করতে থাকবে। এখানে উদ্দেশ্য পানিকে নাপাক হওয়া হতে রক্ষা করা। (২) এরূপ করা লানতের কারণ হবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এরূপ করা হতে রক্ষা করুন। তবে পানি যদি অধিক পরিমাণের হয় এবং প্রবহমান হয় তাহলে তাতে গোসল করা জায়েজ এবং পেশাব করার বিষয়টি সর্বাবস্থায় এড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য।

'মায়ে মোস্তামেলা' তথা ব্যবহৃত পানি। কেউ তা পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে না। তা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দ্বিতীয় বার পবিত্রতার্জনের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেননি। তা পূর্বাবস্থায়ই রেখে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে কোনো নির্দেশও প্রদান করেন নি। নিঃসন্দেহে এ পানি পবিত্র।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا .

পানি দু'মটকা পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।"

আমি বলি যে, এর অর্থ হলো : তা মৌলিকভাবে অপবিত্র হয় না। তা সম্পর্কে শরীয়তই বিধান দিয়ে থাকে। প্রচলিত রীতিনীতি ও জনশ্রুত বিধান ব্যতীতই। তবে যদি পানির গুণগুলোর কোনো গুণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, নাপাকীর কারণে অথবা নাপাকীর পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহলে তার বিধান পূর্বে উল্লেখিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দু'মটকা পানিকে অল্প পানি ও অধিক পানির মধ্যে পার্থক্যকারী নির্বাচনের কারণ এমন একটি জরুরি বিষয় যার কোনো প্রতিকার নেই। এটা কোনো জোর জবরদস্তির বিষয়ও নয় বা কোনো আন্দাজ অনুমানের বিষয়ও নয়। এটা এমন একটা বিষয় যা ধরে নেয়া ব্যতীত কোনো উপায় নেই। এ ছাড়া শরীয়তের অন্যান্য বিধানগুলোর ক্ষেত্রেও এমনিভাবে বিশেষ কারণ রয়েছে যা মেনে নেয়া ব্যতীত উপায় নেই।

তার ব্যাখ্যা হলো : পানির জন্য দুটি স্থান। (১) উৎস, উৎপত্তিস্থল, প্রস্রবণ (২) পাত্র। উৎপত্তিস্থল হলো কূপ ও ঝর্ণা এবং প্রবহমান নালাসমূহ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আর পাত্র হলো চামড়ার মশক, মটকা, পানির পাত্র যাতে হাত মুখ ধোয়া হয়, টব, চামড়ার তৈরি পানির পাত্র ইত্যাদি। (১) কূপ নাপাক হলে

অর্থাৎ কূপের পানি নাপাক হলে লোকদের ক্ষতি হয় এবং তার পানি বের করে ফেলাতে অনেক কষ্ট হয়। (২) পাত্রের অবস্থা এমন যে তা প্রতিনিয়ত পূর্ণ করা যায় তার পানি নাপাক হলে তা পরিবর্তন করাতে কোনো কষ্ট হয় না। (২) কূপের ও ঝর্ণার কোনো ঢাকনা থাকে না। তাকে ঘোড়া, গাধা ও চতুষ্পদ জন্তুর গোবর এবং হিংস্র প্রাণির মুখ দেয়া হতে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথচ পাত্রকে ঢেকে রাখায় এবং হেফাযত করাতে কোনো পেরেশানী নেই। তবে সর্বদা ঘরে আগমনকারী লোক ও জন্তুর বিষয়টি পৃথক। (৩) কূপে ও ঝর্ণার অনেক পানি থাকে। অনেক নাপাকি পড়লেও তা পরিলক্ষিত হয় না। পাত্রের পানি স্বল্প হয়। এজন্য তাতে নাপাকি পড়লেই তা পরিলক্ষিত হয়। পাত্রের বিষয়টি কূপ ও ঝর্ণার বিপরীত। সুতরাং ঝর্ণার ও কূপের পানির বিধান এবং পাত্রের পানির বিধান পৃথক পৃথক হওয়াই অত্যাবশ্যকীয়। আর কূপ ও ঝর্ণাধারার ক্ষেত্রে সেসব সুযোগ দিতে হবে যা পাত্রের ক্ষেত্রে দেয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং পাত্র ও কূপ এবং ঝর্ণাধারার ক্ষেত্রে স্বল্প ও অধিক পানির পরিমাণ নির্ধারণে দু'মটকা পানিকে পার্থক্যকারী নির্ণয় করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ কূপ ও ঝর্ণার পানি সাধারণত দু' মটকার অধিক ব্যতীত কম হয় না। দু' মটকার কম যে কূপে বা ঝর্ণায় পানি হয় তাকে হাউজ বা গর্ত বলা হয় না। বরং তাকে ছোট গুহা বলা হয়।

যদি কোথাও কোনো সমতল ভূমিতে দু'মটকা পানি হয় তার পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সাত হাত গুণ পাঁচ হাত হয়ে থাকে।

এটা হচ্ছে হাউজের সর্বনিম্ন সীমানা। পানির পাত্রের মধ্যে বড় পাত্র হলো মটকা। এর চেয়ে বড় পাত্রের ব্যবহার আবরদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর সকল মটকা এক মানের হয় না, কোনো মটকা বড়, কোনো মটকা ছোট দেড় মটকার পরিমাণ, কোনোটি মটকার তিনের একাংশ, আবার কোনোটি অর্ধেক ও কোনোটি চারভাগের একভাগ হয়ে থাকে। কোনো বড় মটকা ছোট দু'মটকার সমান হয় না। সুতরাং দু'মটকা পানির পরিমাণ এমন একটা পরিমাণ যে পরিমাণ পর্যন্ত পাত্রের পরিমাপ পৌঁছায় না। আর যার থেকে কম পানি কোনো কূপে বা ঝর্ণায় থাকে না। এ কারণে দু'মটকা পানিকে অল্প পানি ও অধিক পানির পরিমাণ ধরা হয়েছে।

যারা পানির পরিমাণকে দু'মটকায় ধরেন না তাদেরও সে জন্য একটা পরিমাণ অবশ্যই মেনে নিতে হবে। যেমন মালেকীদের অবস্থা। যারা জঙ্গলে

অবস্থিত কূপের ক্ষেত্রে উটের বিষ্ঠা পতিত হলেও তাকে পাক বলে থাকেন। সুতরাং এদিক সেদিক হাত না মেরে দু'মটকার হাদীস মেনে নেয়াই উত্তম। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শরীয়তের বিধানগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। শরীয়ত যেসব সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা জরুরি ভিত্তিতে দিয়েছে যা মেনে নেয়া ব্যতীত কোনো গত্যান্তর নেই। আর বুদ্ধিমত্তার দিক থেকেও তা মেনে নেয়া ব্যতীত অপর কোনো পথ নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

اَلْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ ـ

"পানি পবিত্রতাকারী, তাকে কিছু অপবিত্র করতে পারে না।"

এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

اَلْمَاءُ لَا يَنْجُبُ ـ

"পানি নাপাক হয় না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ ـ

"নিশ্চয়ই মুমিন নাপাক হয় না।"

এমনিভাবে অন্যান্য বর্ণনায় যা এসেছে যে,

اَلْبَدَنُ لَا يَنْجَسُ وَالْاَرْضُ لَاتَنْجَسُ ـ

"বদন নাপাক হয় না এবং জমিন নাপাক হয় না।"

আমি বলি যে, উক্ত সকল হাদীসে একটা বিশেষ নাজাছাতকে নফী করা উদ্দেশ্য যা সময় ও অবস্থার দ্বারা বুঝা যায়। অতএব তাঁর বাণী الماء لا ينجس "পানি নাপাক হয় না" তার অর্থ হলো– কূপ ও ঝর্ণায় নাপাক পড়লে তা নাপাক হয় না যদি তা তুলে ফেলে দেয়া হয় এবং নাজাছাতের দ্বারা পানির গুণ পরিবর্তন না হয়। আর নাপাকি অত্যধিক না হয়। বদন ধৌত করা হয় তাতে তা পাক পবিত্র হয়ে যায়। জমিনে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, সূর্যের আলোক পতিত হয় এবং পা দিয়ে তা পাড়ানো হয় এতে তা পবিত্র হয়ে যায়।

বুদাআ কূপ সম্পর্কে ভেবে দেখুন তো। এটা কি মেনে নেয়া যায় যে, সে কূপে এসব নপাকি পড়ে থাকত। এবং লোকেরা তা হতে পানি ব্যবহার করত।

এটা এরূপ কখনো নয়। বরং অবস্থা ছিল এমন যে, এসব নাপাকি অনিচ্ছায় সে কূপে পতিত হতো। কেউ তা তাতে নিক্ষেপ করত না। যেমন আমরা আমাদের বর্তমান সময়ে কূপের ব্যাপারে লক্ষ্য করি। তারপর সে সব নাপাকী বের করে দেয়া হতো এবং সে কূপের পানি ব্যবহার করা হতো। মানুষের অভ্যাস হলো এ জাতীয় নাপাকি হতে বেঁচে থাকা। তা হলে কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কূপের পানি চাইতেন? অনিচ্ছায় সে কূপে নাপাকি পতিত হতো আর তা বের করে ফেলে দেয়া হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর লোকেরা সে কূপের পানির শরয়ী হুকুম জানতে চাইল যে, ঐ পবিত্রতাই কি যথেষ্ট যা মানুষ বুঝে থাকে– নাকি শরীয়তের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে নতুন কোনো বিধান রয়েছে? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ـ

"পানি পবিত্রতাকারী, তাকে কিছু অপবিত্র করে না।" অর্থাৎ লোকদের নিকট যে পবিত্রতা রয়েছে তাই যথেষ্ট-এর অধিক আর কিছু প্রয়োজন নেই।

এটা কোনো তাবিল নয়, গায়ের জোরে কোনো ব্যাখ্যা নয়– আর না এটা হাদীসের বাহ্যিক দিককে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া। বরং এটা আরবদের পরিমাপপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ ـ الاية

"আপনি বলে দিন, আমার নিকট যা অহি করা হয়েছে তাতে কারো জন্য কোনো কিছু হারাম দেখতে পাচ্ছি না"। এর উদ্দেশ্যে হলো সে সব বস্তুর মধ্যে যাতে তোমরা দ্বিমত পোষণ কর। যখন কোনো ডাক্তারকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন যে, এ বস্তুর ব্যবহার ঠিক নয়। এর দ্বারা জানা যায় যে, স্বাস্থ্য সঠিক রাখার দিক থেকে এটার ব্যবহার সঠিক নয়। আবার যখন কোনো ফিকাহ শাস্ত্রবিদ তথা ফকীহর নিকট কোনো বিষয় জানতে চাওয়া হয়, তখন জবাবে যদি তিনি বলেন– তা জায়েজ নয়। তা হতে বুঝা যায় যে, শরীয়তের বিধানমতে তা জায়েজ নয়। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ তোমাদের জন্য তোমাদের মা'দের হারাম করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহর বাণী - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ তোমাদের জন্য মৃত প্রাণী হারাম করা হয়েছে।

অর্থাৎ তা ভক্ষণ করা তথা খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ওলী ব্যতীত কোনো নেকাহ-বিবাহ বৈধ নয়। এখানে ঐ বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয় বুঝানো হয়েছে। উজুদে খারেজীর নফি করা হয়নি। এ জাতীয় অনেক বিষয় রয়েছে। এগুলো তাবিলের ভিত্তিতে নয়।

'মায়ে মোকাইয়েদ' এমন পানি যা পানি বললে পানি হিসেবে মনে উদিত হয় না। যেমন গোলাপের পানি, এ 'মায়ে মোকাইয়েদ' দ্বারা অযু ও গোসল করা এমন একটি বিষয় যা মিল্লাতের শিক্ষা সহজভাবেই তা সমাধান করে দিতে সক্ষম। তার দ্বারা নাজাছাতে হাকিকী দূর করা যায়। শুধু তাই নয় বরং তাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

কাওম তথা হানাফী মজহাবের ইমামগণ কূপে কোনো প্রাণীর মারা যাওয়ার মাসয়ালা এবং দশগজ দশ গজ দৈর্ঘ্যপ্রস্থ হাউজের মাসয়ালা ও মায়ে জারী তথা প্রবাহিত পানির এ তিন মাসয়ালায় প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে। অথচ এ তিনটি বিষয়ে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান নেই। অথচ সাহাবী ও তাবেয়ীদের পক্ষ হতে যে সব আছার বর্ণিত রয়েছে যেমন হাবশী সম্পর্কে ইবনে জুবাইয়ের আছার। ইঁদুর সম্পর্কে হযরত আলীর (রা) আছার এবং বিড়াল জাতীয় প্রাণীর ব্যাপারে নখয়ী ও শাবীর আছার। এসব আছারের বিশুদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের কোনো ধরনের সাক্ষ্য নেই। আর এগুলো এমন বর্ণনাও নয় যার প্রতি প্রথম যুগের লোকদের ঐকমত্য রয়েছে। যদি এসব আছারের সত্যতা তথা এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করাও হয়, তাহলেও তা হবে মনের প্রশান্তি ও পানির পবিত্রতার জন্য, তা শরীয়তের পক্ষ হতে ওয়াজের হিসেবে নয়। এ সন্দেহ মালেকী মজহাবের লোকদের গ্রন্থাবলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের এ সন্দেহ অপনোদন না করে তা প্রমাণ করা খুবই দুষ্কর ও কষ্টসাধ্য।

মোটকথা, এ মাসয়ালায় এমন কোনো গ্রহণযোগ্য বিষয় নেই শরীয়াতের দৃষ্টিতে যার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর দু'মটকা পানি সংক্রান্ত হাদীস এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি দৃঢ় বিষয়। আর এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তায়ালা এ মাসয়ালায় এমন কিছু শরীয়ত সম্মত করবেন যার গুরুত্ব অত্যধিক হবে সকলের ঐকমত্যের উপর। যা অধিক প্রয়োগ হবে এবং যা সকলে মেনে নেবে। এতদসত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সরাসরি কোনো হাদীস বলবেন না আর তা সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্যে প্রচারিত ও

প্রসারিত হবে না। আর কোনো এক ব্যক্তির বর্ণনাও এ বিষয়ে থাকবে না এটা কি করে সম্ভব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

নাজাছাত পবিত্র করা

নাজাছাত ঃ নাজাছাত হলো ঐ সব অপবিত্র ও অপরিষ্কার বস্তু যা রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঘৃণা করে। মানুষ যা পরিহার করে চলে। যদি তা দেহে বা কাপড়ে লেগে যায় তা ধৌত করে নেয়। যেমন– পায়খানা, পেশাব ও রক্ত।

নাজাছাত পবিত্র করা ঃ তা গ্রহণ করা হয়েছে রুচি সম্পন্ন লোকদের থেকে এবং তাদের মাঝে যা প্রচলিত রয়েছে তা হতেই তা গৃহীত হয়েছে। লেদ তথা ঘোড়া, গাধা ইত্যাদির মল নাপাক ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে। যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া হয় তাদের পেশাব। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তাদের পেশাব নাপাক। এতে সুস্থ রুচি সম্পন্নদের ঘৃণা হয়। শুধুমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এসবের পাক হওয়া এবং তার নাপাকী হালকা ধরনের হওয়ার ফয়সালা শুধুমাত্র সংকীর্ণতা দূর করার জন্য বলা হয়ে থাকে। শরীয়তদাতা নাজাছাতের সাথে শরাবকে তথা মদকে মিলিয়েছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন – رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ "অপবিত্রতা, মালিন্য শয়তানী কাজ।" তা এজন্য যে, শরীয়তদাতা তাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং শক্তভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন হেকমতে খোদাওয়ান্দী তথা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হলো যে, এটাকে– শরাবকে, মদকে পায়খানা ও পেশাবের পর্যায়ের করে দেবেন। যাতে শরাবের তথা মদের মন্দতা ও পাপ মানুষের সামনে অপবিত্রতার উপমা হয়ে থাকে এবং তা অধিক নাপাক হওয়ার কারণে মানবাত্মা তা হতে দূরে অবস্থান করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ -

"তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পান করলে তাকে সাতবার ধুয়ে নেবে। অপর এক বর্ণনার রয়েছে, "তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তাকে সাতবার ধুয়ে নেবে এবং তার প্রথমবার মাটি দিয়ে রগড়িয়ে ধুয়ে নেবে।"

আমি বলি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের ঝুটাকে নাপাকীর তথা অপবিত্রতার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে প্রচণ্ড ধরনের নাপাকী রূপে পরিগণিত করেছেন। কারণ কুকুর একটি অভিশপ্ত জন্তু। ফিরিশতারা তা হতে দূরে থাকে। কোনো প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পালন করা ও তার সাথে মেলামেশা করা প্রতিদিন এক কিরাত করে সওয়াব কমিয়ে দেয়।

এসবের রহস্য : কুকুরের ফিতরাত– প্রকৃতি হলো শয়তানের ফিতরাতের ন্যায়। তার প্রকৃতি হলো– খেলাধুলা, রাগ, নাপাকীতে নিমজ্জিত থাকা, লোকদের কষ্ট দেয়া এবং সে শয়তান থেকে এলহাম গ্রহণ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এ প্রাণীটি এতটা নিকৃষ্ট হওয়ার পরও লোকেরা তা পালনে আনন্দ অনুভব করে অর্থাৎ লোকেরা কুকুর হতে দূরে থাকতে অলসতা প্রদর্শন করে থাকে। অপরদিকে ক্ষেতি-জিয়াতের হেফাজতের জন্য চৌকিদারীর জন্য তথা পাহারার জন্য এবং শিকার করার জন্য কুকুর পালনের প্রয়োজন থাকার কারণে কুকুর পালন হতে নিষেধ করাও ছিল কঠিন। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কৌশল অবলম্বন করলেন যে, কুকুর কারো পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুতে হবে এবং একবার মাটি দিয়ে রগড়িয়ে ধুতে হবে। এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিলেন। এবং এমন শর্তারোপ করলেন, যাতে কষ্ট রয়েছে। যাতে এসব কারণ মিলে কুকুর পালন হতে বিরত রাখা যায়।

কোনো কোনো আহলে ইলেম (ইমাম মালেক (রা)) মত প্রকাশ করেছেন যে, সাতবার ধৌত করা কোনো শরীয়তের বিধান নয়। বরং তা এক ধরনের তাকিদ করা। তাদের কেউ আবার প্রকাশ্য হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

هَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنَ الْمَاءِ ـ

"তার পেশাবের উপর এক বড় ঢোল পানি প্রবাহিত করে দাও।"

আমি বলি যে, জমিনের উপরে পেশাব; জমিনের উপরে পেশাব করা হলে তাতে অধিক পরিমাণে পানি প্রবাহিত করে দিলে তা পাক পবিত্র হয়ে যায়। এ হুকুম লোকদের সে মতামত হতে গৃহত হয়েছে যে, জমিনে অধিক বৃষ্টি হলে তা পাক পবিত্র হয়ে যায়। আর অধিক পরিমাণে পানি প্রবাহিত করলে দুর্গন্ধও দূর

হয়ে যায়। আর অধিক পরিমাণে পানি প্রবাহিত করার কারণে পেশাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدٰكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ.

যদি কোনো নারীর কাপড়ে মাসিক ঋতুস্রাবের রক্ত লেগে যায় তাহলে সে তাকে মাটিতে মেলে নেবে, তারপর ধৌত করবে পানি দিয়ে। অতঃপর তাতে নামায আদায় করবে।

আমি বলি যে, মূল নাজাছাত ও তার চিহ্ন বিদূরীত হলেই তা পাক-পবিত্র হয়ে যায়। এজন্য কোনো নির্ধারিত নিয়ম নেই। যে সব পদ্ধতির কথা বর্ণিত হয়েছে তার সবটাই নাজাছাত দূরীকরণের জন্য ও তার চিহ্ন দূরীকরণের জন্য। তা শর্ত নয় বরং সতর্কতা মাত্র।

মণি বা শুক্র নাপাক। উপরে আমরা নাজাছাত সম্পর্কে যে আলোচনা উপস্থাপন করেছি তার ভিত্তিতে। শুষ্ক মণি ঘর্ষণ করে তুলে ফেললে কাপড় পাক-পবিত্র হয়ে যায়। যদি তা দেখা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

মেয়ের পেশাব লাগলে কাপড় ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। ছেলের পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটিয়ে নিলে হবে। অথবা হালকাভাবে ধুয়ে নিলে চলবে।

আমি বলি যে, এটা এমন একটা বিষয় যা জাহেলী যুগে সর্ব সম্মতভাবে সিদ্ধান্তকৃত ছিল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পূর্বাবস্থাই ঠিক রেখেছেন। ছেলে এবং মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করার বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

তন্মধ্যে : (১) ছেলে কাপড়ে পেশাব করলে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং তা দূর করা কষ্টসাধ্য হয় এজন্য শরীয়ত এক্ষেত্রে সহজ করেছেন। পক্ষান্তরে মেয়ের পেশাব কাপড়ে এক জায়গায় লাগে তাই তা পরিষ্কার করা সহজতর।

তন্মধ্যে : (২) মেয়ের পেশাব ছেলের পেশাব অপেক্ষা অধিক গাঢ় ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে।

তন্মধ্যে : (৩) ছেলেকে লোকেরা সব সময় কোলে তুলে রাখে তার প্রতি অধিক আগ্রহ থাকে, মেয়েদের কোলে রাখা হতে বিরত থাকে ও অল্প পরিমাণে আগ্রহী হয়। এজন্য প্রথমটিতে একটু সহজ ও দ্বিতীয়টিতে তা করা হয়নি।

উক্ত হাদীস মদীনাবাসী ও ইবরাহীম নখয়ী গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ এ ব্যাপারে একটু ঢিল দিয়েছেন। মানুষের মাঝে যা প্রসিদ্ধ রয়েছে তাতে কোনো ধরনের ধোঁকায় পড়বেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ .

"কাঁচা চামড়াকে যখন দাবাগত করা হয়- রং দেয়া হয় তখন তা পাক পবিত্র হয়ে যায়।"

আমি বলি যে, দাবাগত করা- রং করা চামড়ার ব্যবহার লোকদের নিকট আম রেওয়াজ রয়েছে। এর রহস্য হচ্ছে : দাবাগত করলে- রং করলে তাতে চামড়ার পচা ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِذَا أَوْطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ .

"তোমাদের কেউ যখন তার জুতার ময়লাকে রগড়িয়ে নেয় তখন মাটি তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেয়।"

আমি বলি যে, জুতা এবং খোফ- মোজা উভয়টাই দৃশ্যমান নাজাছাত হতে পাক হয় তা রগড়িয়ে নিলে মাটিতে। কারণ এগুলো শক্ত বস্তু যাতে নাপাকি প্রসারিত হয় না। অতএব নাপাকি গলিত হোক কি শুষ্ক- মাটিতে রগড়িয়ে নিলেই তা পাক পবিত্র হয়ে যাবে।

বিড়াল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِالطَّوَّافَاتِ .

"নিঃসন্দেহে বিড়াল তোমাদের নিকট যাতায়াতকারী প্রাণী।"

আমি বলি যে, একদলের মতামত অনুযায়ী বিড়াল যদিও নাপাকীতে মুখ দিয়ে থাকে এবং ইঁদুর শিকার করে, এক্ষেত্রে তার ঝুটা-এঁটো পাক পবিত্র হওয়ার বিধান দেয়া কর্তব্য- অত্যাবশ্যকীয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শর্ত উঠিয়ে নেয়া শরীয়তের একটি অন্যতম বিধান। অন্য দলের মতে (যারা বিড়ালের ঝুটাকে

মাকরূহ বলে) প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া হওয়া প্রয়োজন। এর প্রতি আকৃষ্ট করণের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালকে ঝাড়ুদার ও ঝাড়ুদারনীর সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

নামায সম্পর্কীয় আলোচনা

জেনে নিন : নামায সমগ্র ইবাদতের মধ্যে বিশাল মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং দলিল প্রমাণের দিক থেকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ইবাদত। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইবাদাত। দেহের জন্য সবচেয়ে উপকারি ইবাদত। এ জন্য শরীয়তদাতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফজিলত, তার সময়, শর্তাবলি ও আরকান ও তার আদব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং তার রোখছত এবং নফল নামায আদায়ের ক্ষেত্রে এমন গুরুত্বারোপ করেছেন যা অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে করেন নি। এবং নামাযকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ শেয়ার তথা অভ্যাস ও চিহ্ন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নামায ইহুদি, নাছারা মজুস ও মিল্লাতে ইসমাঈলের সকল অনুসারীদের জন্য একটি স্বীকৃত ও সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত যথার্থ ইবাদত ছিল। এ কারণ শরীয়তদাতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন যা লোকদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল অথবা অধিকাংশ লোক তাতে একমত ছিল।

তাদের মধ্যে পার্থক্য ও পরিবর্তন যা ছিল তাহলো যেমন ইহুদিরা জুতা এবং মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় জায়েজ মনে করত না। এসব ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত জরুরি ছিল যে, তাদের এ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হবে, যাতে মুসলমানদের গৃহীত পদ্ধতি তাদের পদ্ধতি হতে সর্বোত্তম হবে। এমনিভাবে মজুছিরা তাদের দ্বীনের মাঝে পরিবর্তন সাধন করেছিল এবং তারা সূর্যের পূজা উপাসনা করতে আরম্ভ করেছিল। এ জন্য মিল্লাতে ইসলামীকে তাদের মিল্লাতের উপর ও সর্বদিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। সুতরাং তাদের ইবাদতের সময় মুসলমানদের নামায আদায় করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

যেহেতু নামাযের আহকাম অনেক এবং যেসব মূলনীতির উপর নামাযের ভীত প্রতিষ্ঠিত সেগুলোও অধিক সংখ্যক; এজন্য এখানে কিতাবুস সালাতের– নামাযের অধ্যায়ের প্রথমে সেসব মূলনীতি আলোচনা করা হয়নি। যেমন কিতাবুত তাহারাত– পবিত্রতার অধ্যায়ে তার মূলনীতিসমূহ আলোচিত হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে প্রত্যেক অধ্যায়ের তার মূলনীতিগুলো সে অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ

"তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তাদের নামাযের নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন নামায ত্যাগ করলে তাদের প্রহার কর। এবং শয়ন কক্ষে তাদেরকে পৃথক করে দাও।"

আমি বলি, সন্তানের বালেগ হওয়ার দু'প্রকারের হয়ে থাকে।

(ক) দৈহিকভাবে সুস্থতা ও রোগ-শোক হতে মুক্ত থাকা বালেগ হওয়া। সন্তানের মাঝে দৈহিক সুস্থতা হলো তার জ্ঞানের– আকলের উন্মেষ ঘটা। আর তার জ্ঞান শূন্য থাকা স্বাস্থ্যগত অসুস্থতা। সাত বছর বয়স জ্ঞানের উন্মেষ ঘটার বয়স। এ বয়সে সন্তানদের মধ্যে প্রকাশ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর দশ বছর জ্ঞানের পূর্ণতার বয়স। সন্তান যদি সঠিক মেজাজের হয় তাহলে দশ বছর বয়সে জ্ঞানী হয়। নিজের উপকার ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ বুঝতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও এ জাতীয় কাজে পারঙ্গম হয়।

(খ) জেহাদ ও হুদুদ গ্রহণের দিক থেকে বালেগ তথা পূর্ণ বয়স্ক হওয়া। এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের দিক থেকে বালেগ হওয়া। যে বয়সে সে পূর্ণ পুরুষে পরিণত হয় এবং পুরুষদের ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু হয়ে যায়। এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সকল ক্ষেত্র তার অংশগ্রহণ গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন ভোট দেওয়া ও দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। তাকে সরল সঠিক পথে ছেরাতাল মোস্তকীমে চলার জন্য বাধ্য করা যায়। বয়সের পরিপূর্ণতার এ পর্যায়ে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ও দৈহিক সৌষ্ঠব পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। আর এ অবস্থা সাধারণত পনেরো বছর বয়সকালে হয়ে থাকে। আর যদি সন্তানের বয়স জানা না যায় তাহলে স্বপ্নদোষ ও নিম্নাঙ্গের পশম উঠার দ্বারা তা নির্ণয় করা যায়। কারণ এগুলো বালেগ হওয়ার চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত।

নামাযেরও দুটি দিক রয়েছে : (ক) নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম– জরিয়া এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া হতে বাঁচার– রক্ষা পাওয়ার ইবাদত। এ কারণে যৌবনের উন্মেষ কালেই অর্থাৎ বালেগ হওয়ার সূচনা লগ্নেই নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে।

(খ) নামায ইসলামের শেয়ার তথা অভ্যাস, রীতিনীতি ও চালচলনের এমন এক শেয়ার- চিহ্ন তথা রীতিনীতি যাতে সংকীর্ণতা ও অসতর্কতা বা কমতি হলে লোকদের পাকড়াও করা যায়। সে কামনা করুক বা না করুক সে বিষয়ে তাকে বাধ্য করা যায়। এদিক থেকে নামাযের বিষয়টি অন্যান্য ইবাদাতের মতোই।

দশ বছর বয়স যখন উভয় পর্যায়ের বয়সের মধ্যবর্তী অবস্থা এবং এ অবস্থা উভয় বয়সের মিলনস্থল ও মধ্য অবস্থা; এ জন্য তার জন্য উভয় বয়সের মধ্যে অংশ রাখা হয়েছে।

বিছানা পৃথক করা : বিছানা পৃথক করণের কারণ হলো এ বয়স হচ্ছে যৌবন কাল আগমনের পূর্বাভাসের বয়স। অচিরেই মোজামেয়াতের ইচ্ছা প্রকাশ পাবে। এ কারণে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সমস্যার পথ বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

নামাযের ফজিলত

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ـ

"নিশ্চয়ই নেক-পুণ্য কাজ পাপ দূরীভূত করে দেয়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে পাপ করার পর জামাতে নামায আদায় করেছে-

فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ ـ

"অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ بِشَيْئٍ؟ قَالُوْا : لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ ـ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ـ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ

"বল, যদি তোমাদের কারো দরজায় নদী প্রবহমান থাকে, যাতে সে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা অবশিষ্ট

থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন– তার দেহে ময়লার কিছুই থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। আল্লাহ তা'আলা নামাযের মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ ـ

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমা অপর জুমা পর্যন্ত এবং এক রমজান অপর রমজান পর্যন্ত সংঘটিত সকল গুনাহকে নির্মূল করে দেয়। যদি কবিরা গুনাহ হতে বিরত থাকা হয়।"

উপরোক্ত হাদীস ও পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কে আমি বলি যে, নামায পবিত্রতা অর্জন এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। নামায আত্মাকে পবিত্রকারী ও ফিরিশতাদের জগতে পৌছে দেয়। নফস তথা আত্মার বৈশিষ্ট্য হলো যখন সে কোনো একটি গুণে পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত হয় তার সে গুণ তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে নেয় তখন সে তার বিপরীত গুণ হতে দূরে অবস্থান করে পরিপূর্ণরূপে। তার বিপরীত গুণ হতে এমনভাবে দূরত্ব অবলম্বন করে যেন সেটি স্মরণে রাখার ন্যায় কোনো বিষয়ই ছিল না। (যেমন : যখন নফস-তথা অন্তর ন্যায়পরায়ণতা ও দানশীলতার গুণে গুণান্বিত ও অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তার মধ্যে যুলুম ও কৃপণতার নিশানা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না। এমনিভাবে তার বিপরীত।) যখন কোনো ব্যক্তি সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় করবে, উত্তমরূপে অযু করবে, সময়মত নামায আদায় করবে, রুকু সিজদা সঠিকভাবে করবে, খুশুর প্রতি গুরুত্ব দেবে, নামাযের সকল তাসবীহসমূহ পরিপূর্ণরূপে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে। নামাযি যখন নামাযের রূহ ও হাকীকত লাভ করার প্রচেষ্টা চালাবে, তখন সে রহমতের সাগরে ডুব দেবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ নির্মূল করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ـ

"আল্লাহর অনুগত বান্দা ও কাফেরের মধ্যে তফাত হলো নামায ত্যাগ করা।"

আমি বলি যে, নামায ইসলামের বিশাল শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নিদর্শন অভ্যাস ও চিহ্ন এবং মুসলমানের এমন বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন যে, যদি তা না থাকে তাহলে মূলত ইসলামই রইল না। নামায ও ইসলামের উভয়ের মাঝে মজবুত সম্পর্কের কারণে। নামাযই সঠিকভাবে প্রমাণ করে আল্লাহর সামনে আল্লাহর জন্য মাথা ঝুকানোকে। যার নামাযের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই মূলত তার ইসলামের সাথে সম্পর্ক নামকাওয়াস্তে। তার ইসলাম ধর্তব্যই নয়।

নামাযের সময়

নামাযের উপকারিতা যখন আল্লাহর দর্শন লাভ ও তাঁর একান্ত নৈকট্য পাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ আসনে উপনীত হওয়া এবং পরিপূর্ণভাবে ফিরিশতাদের সারিতে গুণে-গুণান্বিত হওয়া। তা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো জীবন নামাযের জন্য নিবেদিত না হবে, ব্যক্তি সর্বদা নামাযের সাথে সম্পৃক্ত হবে, এত অধিক পরিমাণে নামায আদায় করবে যাতে তার সমস্ত গুনাহের বোঝা তার থেকে দূরীভূত হবে ও সে গুনাহের বোঝা হতে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষকে এমন তো কোনো বিধান দেয়া যায় না যার কারণে মানুষের দুনিয়াবী অপর সব জরুরি কাজ থেমে যাবে, স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং বস্তুগত সকল প্রয়োজন হতে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। এজন্য হেকমতে খোদাওয়ান্দী তথা মহান আল্লাহর হিকমতের দাবি হলো লোকদেরকে খণ্ডকালীন সময়ে নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং তাকে সংরক্ষণ তথা হেফাযত করার হুকুম করা হবে। যাতে নামাযের সময়ের পূর্বে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা, নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ও তাছাড়া অন্য যে সময়টুকু বেঁচে যাবে তাও নামাযের নূরের কারণে নামাযের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এক নামায হতে অন্য নামাযের মাঝে সময়ের যে অংশটুকু গাফলতের মাঝে পড়বে যেহেতু সে সময়েও তার ধ্যান ও খেয়াল আল্লাহর স্মরণের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে এবং তার অন্তর আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত থাকবে সেহেতু তাও নামাযের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। এতে করে মুসলমানের অবস্থা ঐ ঘোড়ার ন্যায় হয়ে যাবে যেটি একটি খুঁটির সাথে বাঁধা। ঘোড়াটি দু-একবার লাফালাফি করে দু-এক কদম এদিক-সেদিন ঘোরে, তারপর পুনরায় নিজের খুঁটির নিকট ফিরে আসে। এমনিভাবে মুমিনের অন্তর নামাযের সাথে বাঁধা থাকে। কিছু সময় ব্যস্ততার পর পুনরায় এসে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। তার অন্তরে ভুলের ও গাফলতের অন্ধকার প্রবেশ করতে পারে না। যখন সার্বক্ষণিক নামাযে নিয়োজিত থাকা সম্ভব নয় তখন এরূপভাবে সার্বক্ষণিকভাবে নামাযে নিয়োজিত থাকা সম্ভব।

উপরোক্ত মাছলেহাতের কারণে যখন নামায খণ্ডকালীন সময়ে আদায় করার প্রয়োজন দেখা দিল তখন নামাযের সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। তখন দেখা গেল চারটি সময়– যে সময়গুলোতে আল্লাহর রহমত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয় সেগুলোই এজন্য উপযুক্ত সময়। যে সময়গুলোতে আল্লাহর ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয়, সে সময়গুলোতে বান্দার আমল আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হয়, বান্দার দোয়াগুলো কবুল করা হয়, ঐ সময়গুলো সকল নবীর নিকট একটি যথার্থ সময় মহান আল্লাহর নিকট হতে জ্ঞান লাভের জন্য। এসময়গুলো দু'দিক থেকে দিবা ও রাতের একত্রিত হওয়ার সময় এবং উভয়ের অর্ধেক হওয়ার সময়। (অর্থাৎ ফজরের সময়, সূর্যাস্তের সময়, আছরের সময় ও অর্ধরাতের সময়।) কিন্তু অর্ধরাতে মানুষকে নামাযের জন্য কষ্ট দেয়া একটি পেরেশানির কারণ। যা সকলেই ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম। এ কারণে নামাযের জন্য তিনটি সময় নির্বাচিত করা হয় মূলত। সকাল বেলা, সন্ধ্যাবেলা এবং রাত্রে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে :

اِقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

"নামায় কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাত অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত এবং সকাল বেলার নামাযও আদায় কর। নিশ্চয়ই সকাল বেলার নামায (ফিরিশতাদের) উপস্থিতির সময়।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা غَسَقِ اللَّيْلِ "রাত অন্ধকার হওয়া" পর্যন্ত বলার কারণ হচ্ছে সন্ধ্যাবেলার নামাযের সময় রাত অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ। এবং ঐ নামাযগুলো পরপর আসে। এ কারণে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জোহর ও আছর একত্রে আদায় করা এবং মাগরীব ও এশা একত্রে আদায় করা জায়েয়। এ আয়াত এ নামাযগুলো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একত্রে আদায় করার প্রমাণ।

দু'নামাযের মাঝে সময়ের দূরত্ব অধিক বা অত্যধিক হওয়া ঠিক নয়। এতে নামাযের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার অর্থ অনর্থক হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী নামাযের দ্বারা বান্দার অন্তরে আল্লাহর যে স্মরণ সৃষ্টি হয়েছিল বান্দা তা ভুলে যাবে। আবার দু'নামাযের মাঝে সময়ের ব্যবধান অত্যধিক কম-স্বল্প হওয়াও উচিত নয়। এতে করে বান্দা তার জীবিকা অন্বেষণের সুযোগ পাবে না। নামাযের সময়গুলোও এমন

গ্রহণযোগ্য সময়ে হতে হবে যা প্রকাশ্য এবং গ্রহণযোগ্য। যা সব ধরনের লোকের বুঝের মধ্যে হবে– প্রত্যেকে যা বুঝতে পারবে এমন হবে। ঐ গ্রহণযোগ্য সময়গুলোও আরব অনারব সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য সময় হতে হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো সেগুলোও অনির্ধারিত ও দীর্ঘ হতে পারবে না। সুতরাং দু'নামাযের মধ্যে সময়ের গ্রহণযোগ্য দূরত্ব হবে দিনের চারের একাংশ অর্থাৎ তিন ঘন্টা। কারণ রাত্র ও দিনকে বার বার ঘণ্টায় ভাগ করার বিষয়ে সকল দেশের মানুষের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। কৃষক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং অপরাপর পেশার লোক সাধারণতঃ সকাল হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময়ে তাদের কর্মে ব্যস্ততায় কাটায়। কারণ এ সময়টা হলো তাদের জীবিকা অন্বেষণের সময়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا -

"আমি দিনকে করেছি জীবিকা অন্বেষণের জন্য।"

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ -

"যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার।" আবার, অনেক কাজ এমন রয়েছে যেগুলো সমাধা করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে। ঐ সময়ে নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং নামায আদায় করা সকলের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে সকাল বেলার সময় দীর্ঘ করা হয়েছে এবং তখন কোনো নামায ফরজ করা হয়নি। এ সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

এ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার নামাযকে দুটি সময়ে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল– যাদের উভয়ের মাঝে দিনের চার ভাগের একভাগ সময়ের ব্যবধান হবে। আর তাহলো জোহর ও আছর এবং রাতের অংশের নামাযকেও দুটি সময়ে ভাগ করার প্রয়োজন হলো তা হলো মাগরীব ও এশা যাদের মাঝেও সে সমপরিমাণ সময়ের ব্যবধান থাকবে।

যখন এমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় যা হতে উত্তীর্ণ হওয়ার কোনো উপায় থাকে না সে অবস্থায় ব্যতীত জোহর ও আছর এবং মাগরীব ও এশার মধ্যে একত্রিত করা উচিত নয় তা না হলে নামাযের সময় নির্ধারণের মধ্যে যে রহস্যসমূহ নিহিত ছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এটিও অপর মূলনীতি।

মধ্যপন্থী দেশ ও সমমনা যেসব সাধারণ লোকদেরকে শরীয়তের বিধান প্রণয়নকালে সামনে রাখা হয়েছে তারা খুব সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় এবং রাত্র পর্যন্ত কায়-কারবারে ব্যস্ত থাকে এবং যে সময়গুলোতে নামায আদায় করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সে সময়গুলোতে নামায আদায় করে তা হলো :

যখন দিল ও দেমাগ তথা মন মানসিকতা জীবিকা অন্বেষণের চিন্তা মুক্ত থাকে– জীবন-জীবিকা অন্বেষণের ব্যস্ততা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। যখন মন মানসিকতা জীবন জীবিকার চিন্তা মুক্ত থাকে তখন নামায আদায় করলে আল্লাহর স্মরণ অন্তরে জায়গা করে নেয় এবং অন্তরের উপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতেই নামায ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

"আর সকাল বেলায় তেলাওয়াত। আর সকাল বেলার তেলাওয়াতে ফিরিশতারা উপস্থিত হয়ে থাকে।"

শয়তানের পূর্বে যাতে সারা দিনে যেসব গুনাহ সংঘটিত হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তার কাফফারা হয়ে যায়। এবং অন্তরের দুশ্চিন্তা বিদূরীত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ

وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ـ

"যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করল– তা প্রথম অর্ধরাত্র নফল আদায়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজর উভয় নামায জামাতের সাথে আদায় করল– তা পুরো রাত নফল আদায়ের সমতুল্য।

কায়-কারবারে ব্যস্ত থাকার সময়– যেমন মধ্যদিনের সময় এ সময়ে নামায আদায় করা দুনিয়ার মাঝে ডুবে যাওয়াকে দূর করে দেয় এবং দুনিয়ার বিষের প্রতিষেধক হয়। সাধারণ লোকদেরকে এ বিষয়ে বাধ্য করা যাবে না– বাধ্য করা বৈধ হবে না। কারণ তারা তখন দু' অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। সে হয়ত এটা ত্যাগ করবে, না হয় ওটা ত্যাগ করবে। এটাও দু'নামাযের মধ্যে একত্রিতকরণের একটা মূলনীতি। কারণ এরূপ করলে সে হয়ত নামায ত্যাগ করবে বা সে

দুনিয়াদারী ত্যাগ করবে। নামায ত্যাগ করলে দ্বীনের ক্ষতি হবে আর দুনিয়া ত্যাগে কাজ ত্যাগ করলে তার দুনিয়ার ক্ষতি হবে।

নামাযের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তা যেন পূর্বেকার নবীদের নামাযের সময়ে হয়। কারণ তা আত্মাকে ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং লোকদেরকে ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী করে তোলে এবং নেককার লোকদের স্মরণ রাখার কারণ হয়। এ সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর বাণী হলো :

وَهٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ـ

"এটি হচ্ছে আপনার পূর্বেকার নবীদের জন্য নির্ধারিত সময়।"

এশার নামায সম্পর্কে মোয়াজ (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে যে, ولم يصلها احد قبلكم "তোমাদের পূর্বে কোনো উম্মত এ নামায আদায় করেনি।" কারণ এ হাদীসে সাহাবীদের এক বিরাট সংখ্যক বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন :

ان الناس صلوا و رقدوا "নিঃসন্দেহে অনেক লোক নামায আদায় করেছে এবং শুয়ে গেছে।" তাদের কেউ কেউ বলেছেন–

لَا يُصَلِّيهَا اَحَدٌ اِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ ـ

"মদীনায় ব্যতীত অন্য কোথাও এ নামায আদায় করা হয়নি।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর থেকে একথা পরিষ্কার যে, হযরত মোয়াজের এ বর্ণনাটি من قبل الرواية بالمعنى। এটি অর্থ ভিত্তিক বর্ণনা। দু' নামাযের মধ্যে একত্রিকরণের এটাও অপর একটা প্রমাণ।

মোটকথা : নামাযের সময় নির্ধারণের মধ্যে অনেক হিকমত লুকিয়ে রয়েছে। নামাযের সময় নির্ধারণের মধ্যে অনেক গুরুত্ব থাকার কারণে স্বয়ং হযরত জিবরাইল (আ) উপস্থিত থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নামাযের সময় শিক্ষা দিয়েছেন। এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করেছেন।

আমার উপরে যা উল্লেখ করেছি তা হতে দু'ওয়াক্ত নামায প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একত্রিত সময় যৌক্তিকতা প্রমাণিত হলো। এবং অন্যান্যরা যা উল্লেখ করেছেন– যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীদের উপর তাহাজ্জুদ

ও চাশতের নামায ওয়াজিব ছিল এবং উম্মতের জন্য মোস্তাহাব। এবং সময়মত নামায আদায়ের প্রতি এতটা তাকিদ কেন দেয়া হয়েছে? এসব বিষয় সবিস্তারে জানা গেল। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

নামাযের সময়ের প্রতি এতটা গুরুত্ব থাকার পরও প্রত্যেকে নামায একই সময়ে পড়তে বাধ্য করা হয়নি। কেউ আগে পড়বে না, আবার কেউ পিছে পড়বে না। এটা এজন্য যে নামাযের সময় দীর্ঘ ও প্রশস্ত।

শরীয়তের বিধান আম তথা সর্বসাধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি হলো নামাযের জন্য এমন একটা পরিচ্ছন্ন ও গ্রহণযোগ্য সময় নির্বাচন করা হবে যা সমগ্র আরববাসী সমভাবে অবগত থাকবে যে নামাযের সময়ের আগমন ঘটেছে এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। সময় হলেই সে নামায আদায়ের চিন্তা করবে এবং সময় শেষ হওয়ার পূর্বে জিম্মাদারী হতে মুক্ত হবে। সুতরাং নামাযের প্রথম সময় ও শেষ সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে নামাযের জন্য চারটি সময় তথা ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়েছে :

১. পছন্দনীয় সময় : এটা এমন একটা সময় যখন সাচ্ছন্দে নামায আদায় করা যায়। এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দুখানা হাদীস রয়েছে। (১) হাদীসে জিবরাঈল, হযরত জিবরাঈল (আ) আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে দু'দিন নামায আদায় করেছেন। আর (২) হযরত বুরাইদার (রাঃ) হাদীস। তাতে রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর দু'দিন প্রথম সময়ে ও দু'দিন শেষ সময়ে নামায আদায় করে তার জবাব দিয়েছেন। এ দুটির মধ্যে যেটি অধিক স্বচ্ছ বর্ণনা সেটিকে গ্রহণ করা হবে যেটিতে অস্বচ্ছতা রয়েছে তা হতে। দুটি হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে যেটি স্বচ্ছ তা গ্রহণ করা হবে যেটিতে স্বচ্ছতা নেই তা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি উভয়টি স্বচ্ছ হয় তাহলে বুরাইদার (রাঃ) হাদীস গ্রহণ করা হবে। কারণ তাতে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তা মদীনা শরীফের ঘটনা আর জিবরাঈলের ইমামতির ঘটনা মক্কার ঘটনা। এক্ষেত্রে শেষটিকে গ্রহণ করা হবে। এ মতবিরোধের ব্যাখ্যা হলো : মাগরীবের নামাযের শেষ সময় হলো শফক (পশ্চিম আকাশের লালিমা) বিদূরীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। হযরত জিবরাইল (আ) দ্বিতীয় দিন মাগরীবের নামায খুব অল্প সময় বিলম্ব করে থাকবেন হয়ত

মাগরীবের নামাযের সময় স্বল্প হওয়ার কারণে। এ কারণে বর্ণনাকারী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে উভয় দিন জিবরাইল (আ) একই সময়ে মাগরিবের নামায আদায় করেছেন। অথবা নিজের ইজতেহাদী ভুলের কারণে অথবা খুব সামান্য বিলম্ব করার কারণে। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।

অনেক বর্ণনা হতে এটা জানা যায় এবং ফোকাহাগণও এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আছরের নামাযের সময় হল সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত। ছায়া আছলীর দ্বিগুণ হওয়ার বর্ণনা হতে পারে পছন্দনীয় সময়ের শেষ সময়ের বর্ণনা বা আছরের নামায আদায়ের মোস্তাহাব সময়ের বর্ণনা। অথবা আমরা বলতে পারি যে, শরীয়ত প্রথমে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ করেছেন যে, আছরকে জোহর হতে পৃথক করার উদ্দেশ্য হলো দু'নামাযের মধ্যে ন্যূনতম পক্ষে দিনের চার ভাগের এক ভাগের (তিন ঘণ্টার) ব্যবধান হওয়া চাই তাই ছায়ায়ে আছলীর দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত তার সময় নির্ধারিত করে দিয়েছে।

অতঃপর লোকদের প্রয়োজনীয়তা ও সুস্থ্যতার বিষয়টি সামনে এল; তাই আছরের নামাযের শেষ সীমা দীর্ঘায়িত করে দেয়া হলো।

এ সীমা নির্ধারিত করার মধ্যে চিন্তার বিষয় নিহিত রয়েছে। মূল ছায়া ঠিক রাখা এবং অবস্থান গ্রহণ করার উপর। সাধারণ জনগণকে এমন বিষয়ের হুকুম দেয়া উচিত নয় যা তাদের পক্ষে বুঝা সহজ নয়। অতএব আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে এ বিষয়ের উদ্রেক করেছিলেন যাতে সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত আছরের নামাযের সময় বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

২. মোস্তাহাব সময় ঃ মোস্তাহাব সময় হলো সে সময় যখন নামায আদায় করা মোস্তাহাব। আর সেসময় হলো প্রত্যেক নামাযের প্রথম ওয়াক্ত।

ক. এশার নামায ব্যতীত ঃ এশার নামাযের ক্ষেত্রে মূলত বিলম্বে নামায আদায় করাই হলো মোস্তাহাব। তার কারণ হলো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সেটা প্রকৃতিগত কারণে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হচ্ছে :

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرَا الْعِشَاءَ -

"আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে আমি তাদেরকে এশার নামায বিলম্বে আদায় করতে বলতাম।"

মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিষ্কার করার জন্য এশার নামায বিলম্বে আদায় করা খুবই উপকারি। মানুষকে এশায় বিলম্ব করা মাধ্যমে যেসব বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া হতে বাঁচানো হয় যেগুলো তাদেরকে আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে রাখে এবং এশার পর গল্প গুজবে সময় ব্যয়ে ব্যস্ত করে রাখে। কিন্তু এশার নামায বিলম্ব করা কখনো কখনো জামাতে লোক স্বল্পতার ও লোকদের জামাত হতে দূরে থাকার কারণও হতে পারে। এক্ষেত্রে এসে বিষয়টি উলটা হয়ে যায়। এ কারণে যখন লোক অধিক পরিমাণে একত্রিত হতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি নামায আদায় করে নিতেন আবার যখন লোকদের উপস্থিতি কম হতো তখন বিলম্ব করতেন।

খ. এখানে ব্যতিক্রম হলো গ্রীষ্মকালীন জোহরের নামায ঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হলো ঃ

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

যখন গরম বেড়ে যায় তখন জোহরের নামাযকে ঠাণ্ডা করে আদায় করো, কারণ গরমের কঠোরতা জাহান্নামের প্রভাব ফেলে থাকে।

আমি বলি যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত ও জাহান্নামের উৎস হচ্ছে তাই যা এ দুনিয়ায় প্রচলিত; চাই সেটি অবস্থার অনুকূল হোক কি প্রতিকূল হোক। আর এটাই বুঝানো হয়েছে যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ -

"তোমরা ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় আদায় কর। অর্থাৎ মসজিদে নববীতে যেভাবে আমল চলে আসছে সেরূপখভাবে কর তার বিপরীত করো না। তা সওয়াবের দিক হতে অনেক বড় (অর্থাৎ ফজরের নামায চারদিক আলোকিত অবস্থায় আদায় করলে অধিক সওয়াব হবে কারণ তাতে জামাত বড় হবে, জামাত যত বড় হবে সওয়াব তত অধিক হবে।)

আমি বলি এ সম্বোধন সে সব লোকদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যারা ফজরের নামায বিলম্বে চারদিকে আলোকিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে জামাতে লোকজন কম হওয়ার ভয় করে তাদের জন্য অথবা ঐ মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

যেখানে দুর্বল লোকেরা ও ছোট ছোট শিশুরা জামাতে একত্রিত হয় আর সেখানে তদের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিলম্ব করে চারদিক আলোকিত হলে ফজরের নামায আদায় করলে– যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَيُّكُمْ صَلّٰى بِالنَّاسِ فَالْيُخَفِّفْ وَفَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ ـ

"তোমাদের কেউ যদি নামায লোকদের পড়ায় তাহলে সহজ ও হালকাভাবে নামায আদায় করবে।"

পূর্ণ হাদীসটি এরূপ ঃ

اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمُ وَالضَّعِيْفُ وَالْكَبِيْرُ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ ـ

তোমাদের কেউ মানুষের ইমামতি করলে নামায হালকা করবে, কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক রয়েছে, সংক্ষিপ্ত করবে। যখন নিজে একা একা পড়বে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে। অথবা তার অর্থ হচ্ছে এমন যে, নামায এমনভাবে দীর্ঘ করবে যাতে তার শেষাংশ চারদিক আলোকিত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। তা হযরত আবু বারজার হাদীস অনুযায়ী–

كَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يُعْرَفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ـ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালের নামায হতে তখন ফিরতেন যখন মানুষ তার সাথীকে দেখলে চিতনে পারত এবং তিনি ফজরের নামাযে, ষাট থেকে একশত আয়াত পাঠ করতেন। সুতরাং اسفار আলোকিত হওয়া ও غلس অন্ধকারে নামায আদায় করার মধ্যে কোনো বিরোধ থাকল না।

هُوَ مَارُوِىَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ـ

গ. জরুরি সময় ঃ জরুরি সময় বলতে বুঝায় কোনো ওজর ব্যতীত সে সময় পর্যন্ত নামায বিলম্ব করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো–

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَرْقُبُ الشَّمْسُ حَتّٰى إِذَا اَصْفَرَتْ الحديث وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ قَامَ فَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا وَهُوَ حَدِيْثُ إِبْنُ عَبَّاسٍ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -

যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাকাত পেল সে ফজরের নামায পেল। যে ব্যক্তি আছরের সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেল সে পুরো আছরের নামায পেল। এটা হলো মোনাফেকের নামায যে সূর্যের রং হলুদ হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্ব করে থাকে। এটি জোহর আছর একত্রিত করার ব্যাপারে এবং মাগরীব ও এশার একত্রিত করার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের হাদীস। ওজর হলো : যেমন সফর, অসুস্থতা ও বৃষ্টি। এশার সময় জরুরি সময় হলো– إِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ ফজর অর্থাৎ সোহবে সাদেক উদিত হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহই অধিক অবগত।

ঘ. কাযার সময় ঃ যখন ভুলে গেলে স্মরণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস–

مَن نَسِىَ صَلَاةً أَوْنَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَاذَكَرَهَا -

"যে ব্যক্তি নামায ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে, যখন তা স্মরণ হবে তখনি তা আদায় করে নেবে।"

আমি বলি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও মোদ্দা কথা হলো যাতে নামায বাদ দেয়ার ব্যাপারে নফছ অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। এবং কাজা নামায আদায় করার দ্বারা যে ঐ বস্তু পেয়ে যাবে যা তার হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ালামাগণ জেনে বুঝে নামায ত্যাগ করা অর্থাৎ نفويت কেও فوت অর্থাৎ বাদ পড়ে যাওয়া-এর মধ্যে ধরেছেন। এ দৃষ্টিতে যে তা কাফফারা আদায় করার ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য।

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জরকে তাকিদ দিয়েছেন যে, যদি তোমাদের এমন নেতা নিযুক্ত হয় যখন তারা নামায কাজা করে পড়বে বা বিলম্বে পড়বে তখন–

صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ -

তুমি ওয়াক্ত মতো নামায আদায় করে নেবে পার যদি তাদের সাথেও তা পাও তাহলেও তা পড়ে নেবে আর তা হবে তোমার জন্য নফল।

আমি বলি– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিষয় দুটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখতেন, এক হলো নামায আল্লাহ ও বান্দার মাঝে উসিলা; দুই হলো নামায দ্বীনের এমন একটা রীতিনীতি ও চিহ্ন যা বাদ দিলে তাকে শাস্তির যোগ্য মনে করা হয়। দ্বীনের তাতে ক্ষতি হয়।

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

لَاتَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَالَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ -

"আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারকারাজি উদিত হওয়া পর্যন্ত মাগরীব বিলম্বিত করবে।"

আমি বলি এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শরীয়তের সীমারেখার ব্যাপারে উম্মত ভ্রুক্ষেপ না করলে, অলসতা প্রদর্শন করলে– সে উম্মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এবং তা উম্মতের ধ্বংসের কারণ।

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -

"তোমরা নামাযকে হেফাযত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযকে গুরুত্ব সহকারে হেফাযত কর।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আছরের নামায। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

যে ব্যক্তি দু' শীতল সময়ের নামায আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ـ

"যে আছরের নামায বাদ দিল তার আমল বাতিল হয়ে গেল।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ الْعَصْرُ فَكَاَنَّمَا وَتَرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ ـ

"যার আছরের নামায বাদ পড়ল তার পরিবার ও সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ

"মুনাফিকদের জন্য ফরজ ও এশা হতে ভারী কোনো নামায নেই। এ দু নামাযে কি সওয়াব রয়েছে তা যদি তারা জানত তাহলে তারা টানা-হিছড়া করেও তাতে উপস্থিত হতো। হামাগুড়ি দিয়ে হলেও।

আমি বলি, তরগীব ও তরহীব– উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে এ তিন নামাযের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কারণ এগুলো হচ্ছে অলসতা ও গুরুত্ব না দেয়ার স্থান ও সময়। ফজর ও এশা ঘুমানোর সময়ের মধ্যে পড়ে। সে সময় গরম লেপ ত্যাগ করে, মজাদার ঘুম ছেড়ে মুত্তাকী মুমিন ব্যতীত অপর কেউ নামাযে হাজির হতে পারে না। আর আছরের সময় হলো তাদের বাজারের মোক্ষম সময়, ক্রয়-বিক্রয়ের গুরুত্বপূর্ণ সময়। কৃষিকাজের লোকেরা এসময় চরম ব্যস্ত অবস্থায় সময় অতিবাহিত করে। (৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

لاَيَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبَ وَفِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ عَلٰى اِسْمِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ـ

"তোমাদের মাগরীবের নামাযের নামেত কোনো বেদুঈন তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। অপর এক হাদীসে রয়েছে– তোমাদের এশার নামাযের নামের কারণে কোনো বেদুঈন তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না।

আমি বলি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যে সমস্ত নাম এসেছে তাতে পরিবর্তন করা ও অন্য নাম দেয়া। যার ফলে নতুন নামের কারণে পুরাতন নাম বাদ পড়ে যায় এরূপ করা মাকরূহ। কারণ এতে করে মানুষের জন্য তাদের দ্বীন বুঝা কঠিন হয়ে যাবে, এতে করে তাদের দ্বীন মোশতাবেহ– সন্দেহ পরায়ণ ও তাদের কুরআন ও হাদীস অস্পষ্ট ও অজ্ঞেয় হয়ে যাবে।

আযান

সাহাবায়ে কেরাম যখন জানতে পারলেন যে, জামাতে নামায আদায় করা কাঙ্ক্ষিত ও তাকিদকৃত। কোনো ধরনের আহ্বান ও ঘোষণা ব্যতীত একই সময়ে একই স্থানে সকলের একত্রিত হওয়াও অসম্ভব। তখন তাঁরা পরস্পর এ বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন– উঁচু স্থানে আগুন জ্বালানো হোক যা দেখে লোকেরা এক স্থানে একত্রিত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অগ্নি পূজকদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে গ্রহণ করলেন না। কেউ বললেন– সিঙ্গা ফুকানোর জন্য। ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন না। কেউ পরামর্শ দিলেন ঘন্টা বাজানোর জন্য। খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন না। তখন কোনো সমাধান ব্যতীতই সকলে ঘরে ফিরে গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন জায়েদকে স্বপ্ন যোগে আযান ও একামত দেখানো হলো। তিনি তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রকাশ করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, অতিসত্য স্বপ্ন।

এ ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের বিধান কল্যাণের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়। শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে নবীর ইজতিহাদেরও কিছু ভূমিকা রয়েছে। দ্বীনের হুকুমগুলো সহজতর করা শরীয়তের একটি স্থায়ী নীতির অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তের স্থায়ী রীতিনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন হতে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত লোকদের বিপরীত নীতি গ্রহণ করা কাম্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও অপর কোনো ব্যক্তিও স্বপ্ন যোগে আল্লাহর উদ্দেশ্য জানতে, অবগত হতে পারে। কিন্তু লোকেরা তার মোকাল্লেফ তথা অনুসারী হতে

পারবে না। যতক্ষণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তা স্বীকৃত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তা সন্দেহ মুক্ত হবে না।

আযান প্রচলনের মাঝে আল্লাহ তা'আলার হিকমত হলো আযান শুধুমাত্র আহ্বান এবং ঘোষণাই থাকবে না; বরং তা দ্বীনের একটি স্থায়ী চিহ্ন ও রীতিনীতি হয়ে থাকবে। তা এভাবে যে, যখন প্রত্যেকের সম্মুখে আযান দেয়া হবে তখন তাতে দ্বীনের শান ও মান বৃদ্ধি পাবে। আর লোকদের তা মেনে নেয়া তাদের পক্ষ হতে আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্যের প্রমাণ হবে। এজন্য আযান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আরম্ভ করা হয়। অতঃপর ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা তাওহীদ ও রেসালাতের ঘোষণা দেয়া হয়। তারপর ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদত নামাযের দিকে লোকদের আহ্বান করা হয়। তার সাথে সাথে নামাযের ফায়েদাও বর্ণনা করা হয়। যাতে আযানের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে সকলের সামনে প্রতিভাত হয়ে যায়।

আযানের পদ্ধতি

আযানের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো হযরত বেলাল (রাঃ) অনুসৃত পদ্ধতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আযান ছিল শব্দগুলো দুবার দুবার আর একামতে একবার একবার। তবে বেলাল (রাঃ) قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ - قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ দুবার বলতেন। তারপর রয়েছে আবু মাহজুরার অনুসৃত পদ্ধতি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযান উনিশ শব্দে এবং একামত সতেরো শব্দে শিক্ষা দিয়েছেন। আমার মতে এটা পবিত্র কুরআনের ন্যায়। এটাই যথার্থ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

فَإِنْ كَانَ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتُ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ - اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ -

"ফজরের নামাযের আযানে 'ঘুম হতে নামায ভালো, ঘুম হতে নামায ভালো' বলবে।"

আমি বলি, সকালবেলা যেহেতু ঘুম ও অলসতার সময় তখন কড়াভাবে নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন অত্যধিক। এজন্য এ শব্দগুলো বৃদ্ধি করাকে পছন্দ করা হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ "যে আযান দিয়েছে সেই একামত বলবে।

আমি বলি, এর রহস্য হলো, যখন কোনো ব্যক্তি আযান দিল তখন তার অপর ভাইয়ের জন্য তার এ বৈধ কাজে প্রতিবন্ধক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ "কেউ যেন তার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না করে।"

আযানের ফজিলত

আযান ইসলামের বিশেষ শেয়ার (চিহ্ন)-এর মধ্যে অন্যতম। আযানের মাধ্যমে কোনো ভূখণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র রূপে পরিগণিত হয়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ কালে আযানের শব্দ শুনতে পেলে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতেন। তা না হলে হামলা করতেন। আযান নবুয়তের কাজ (شعبه) গুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ (شعبه) তথা কাজ। কারণ আযান ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকনের প্রতি আহ্বান জানায় এবং তা বুনিয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের দিকে লোকদের ডাকে। আল্লাহর অধিক পছন্দনীয় এবং শয়তানের নিকট অধিক পছন্দনীয় কাজ হলো সেটি, যেটির কল্যাণ অপরের নিকট পৌছায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহর আওয়াজ বুলন্দ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ -

"শয়তানের উপর একজন ফকীহ (দ্বীনের গভীর জ্ঞানী) হাজারো আবেদের চেয়েও ভারী।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ -

"যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন শয়তান হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে বক্র হয়ে পালাতে থাকে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْمُؤَذِّنُ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا -

"হাশরের দিন মোয়াজ্জেন সবচেয়ে লম্বা গলা বিশিষ্ট হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلَهُ مَدَّى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ ـ

"মোয়াজ্জেন যতটুকু উচ্চস্বরে আওয়াজ করবে তার মাগফেরাত তথা ক্ষমাও তত উচ্চমানের হবে এবং তার জন্য মানুষ ও জিন সকলেই সাক্ষী দেবে।

আমি বলি, রূপক বিষয়ের মোয়ামেলা আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভরশীল আর রূহের বিষয়ের সম্পর্ক অবয়বের তথা চেহারার সাথে। সুতরাং মোয়াজ্জেনের গলা লম্বা হওয়া তার আওয়াজ বড় হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, আখেরাতে তার গলা লম্বা ও দীর্ঘ হবে। আর তার হকের প্রতি দাওয়াত দেয়ার কারণে তার ক্ষমাও হবে বিশাল। তার প্রতি আল্লাহর রহমতও হবে সীমাহীন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি সওয়াবের (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে সাত বছর আযান দেবে, তাকে দোযখ হতে মুক্ত বলে লিপিবদ্ধ করা হবে।" কারণ সাত বছর পর্যন্ত আযান দেয়া তার বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আযান দেয়া ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে আল্লাহর জন্য সব কিছু কুরবানী করতে পেরেছে। আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত হতে পেরেছে এবং তার অন্তরে আল্লাহর রহমত পাহাড়ের ন্যায় জায়গা করে নিয়েছে।

পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানরত বকরীর রাখাল সম্পর্কে আল্লাহর বাণী–

اُنْظُرُوْا اِلَى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّىْ

قَدْغَفَرْتُ لَهُ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ـ

"পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানরত আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ কর, সে আযান দেয়, নামায কায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

আল্লাহর বাণী–يَخَافُ مِنِّىْ "সে আমাকে ভয় করে।" অর্থাৎ যেমনি নিয়ত ও অন্তরের দাবি তেমনি হয়ে থাকে আমল। আর আমল হচ্ছে প্রকাশ্য অবস্থা আর তার রূহ হচ্ছে অন্তরেরে নিয়ত ও কলবের দাবি। যখন সে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সেজন্য তার এখলাছও ছিল, তাই তার মাগফেরাতের কারণ হয়েছে।

যেহেতু আযান দ্বীনের শেয়ার (চিহ্ন)। সেহেতু তাকে মানুষ কতটুকু আল্লাহর হেদায়েত কবুল করল কি করল না তার প্রমাণ স্বরূপ করা হয়েছে। আযানের মৌখিক জবাবও তাকে মেনে নেয়ার দ্বারা তার প্রমাণ উপস্থাপিত হবে যা আল্লাহর পক্ষ হতে কাম্য। অতএব যিকির ও শাহাদাতাইনের জবাব দেবে হুবহু সে শব্দ দুটি উচ্চারণের মাধ্যমে এবং নামাযের জন্য আহ্বানের জবাব দেবে ঐ বস্তু দিয়ে যাতে তাওহীদের শক্তি ও ক্ষমতা বিদ্যমান। ইবাদতের দিকে অগ্রগামী হওয়ার সময় অপারগতা দূর করার জন্য।

যে ব্যক্তি এ কাজগুলো উপরোক্ত পদ্ধতিতে আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ এ জবাব দান আল্লাহর আনুগত্যের এবং নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়ার প্রমাণ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়েছে তার দ্বীনকে কবুল করার এবং তাকে মহব্বত করার পরিপূর্ণতার জন্য। অর্থাৎ যেভাবে দোয়া করবে সেভাবে উক্ত দুটি বিষয় পূর্ণতা পেতে থাকবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ

"আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া বৃথা যায় না।"

আমি বলি, অর্থাৎ এ সময়ে দোয়া করায় আল্লাহর রহমতের পরিপূর্ণতা এবং দোয়াকারীর আন্তরিকতা ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ থাকে, এজন্য এ সময়ের দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

اِنَّ بِلَالًا يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىْ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ـ

"রাতের বেলায় আযান দেবে তখন তোমরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়।"

আমি বলি ইমামের (আমীরুল মুমিনীনের) জন্য মোস্তাহাব হলো যদি তিনি প্রয়োজন অনুভব করেন তাহলে দুজন মোয়াজ্জিন নিযুক্ত করতে পারেনর। যাদের আযান লোকেরা বুঝতে পারবে এবং লোকদের বলে দেবেন যে, অমুক মোয়াজ্জিন রাতে আযান দেবে তখন তোমরা রোজার সেহেরী খেতে ও পান

করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অমুক মোয়াজ্জিন আযান দেবে। যাতে তাদের প্রথম ব্যক্তির আযান হবে নামায আদায়কারীদের জন্য ও সেহেরী গ্রহণকারীদের জন্য যাতে তারা ঘরে ফিরে সেহেরী গ্রহণ করতে পারে। আর যারা ঘুমন্ত থাকে তারা জেগে উঠবে এবং নামাযে প্রবৃত্ত হবে এবং সেহেরী খাওয়ার যা বাকি থাকবে তা পাবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ -

"যখন নামায আরম্ভ হয়ে যাবে তখন দৌড়ায়ে নামাযে এসো না, বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে নামাযে উপস্থিত হও।"

আমি বলি এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইবাদতের ক্ষেত্রে গভীর মনোযোগের দিকে।

মসজিদ

মসজিদ তৈরি করা, মসজিদে অবস্থান করা ও মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত হচ্ছে-

(১) মসজিদ ইসলামের শেয়ার (বিশেষ চিহ্ন) গুলোর অন্যতম চিহ্ন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْسَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدًا -

"যখন তোমরা কোনো মসজিদ দেখতে পাবে বা কোনো মোয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে তখন কাকেও হত্যা করবে না।"

মসজিদ নামাযের স্থান, ইবাদতকারীদের অবস্থানের স্থান, রহমত অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা এবং একদিক থেকে তা কাবার সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো-

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ -

যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ফরজ নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তার সওয়াব এহরাম বাঁধা হাজিদের ন্যায়, যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের জন্য বের

হলো অন্য কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে বের হলো তার সওয়াব উমরাকারীর সওয়াবের ন্যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قِيلَ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ الْمَسَاجِدُ۔

"যখন তোমরা বেহেশতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তার ফল ভক্ষণ করো, বলা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বেহেশতের বাগান কি? তিনি বললেন : মসজিদসমূহ।

নামাযের সময়গুলোতে মসজিদে গমন করা, কাজকর্ম ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করে, দ্বীনের প্রতি এখলাছ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। সে ব্যক্তি শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঘর ছেড়ে মসজিদে নামাযের উদ্দেশ্যেই গমন করে থাকে। এ কারণে নামাযে অনেক সওয়াব লাভ হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ۔

কোনো ব্যক্তি ভালোভাবে অযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে– উদ্দেশ্য শুধু নামায আদায় করা হলে– তাহলে তার প্রতি কদমে তার একটি মর্তবা বৃদ্ধি করে দেয়া হয় এবং তার একটি পাপ মার্জনা করে দেয়া হয়, অতঃপর নামায আদায় করলে যতক্ষণ সে সমজিদে অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতা তার জন্য এ বলে দোয়া করতে থাকে, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত বর্ষিত করুন, তার প্রতি মেহেরবানী করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযরত অবস্থায় থাকে।

মসজিদ তৈরির মাধ্যমে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা হয়, সত্যের আহ্বান প্রচারিত হয় ও আল্লাহর বাণী প্রচারে সহযোগিতা করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِد اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نَزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ ـ

যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে গমনের ব্যবস্থা করেন, যখনি সে সকাল এবং সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়া আসা করে।

আমি বলি, এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যেক যাওয়া ও আসার মধ্যে জান্নাতের মালিকানার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও তার অন্তরে আনুগত্যের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ বানাবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।"

আমি বলি– এর রহস্য হলো, আমল অনুযায়ী প্রতিদান হয়ে থাকে।

মসজিদে হদছ হয়ে যাওয়া ব্যক্তি (যার অযু নষ্ট হয়ে যায়) নামাযের জন্য অপেক্ষাকারীতে পরিগণিত হবে না। কারণ সে ব্যক্তি তখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী থাকে না।

কয়েকটি কারণে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা এবং মক্কায় হেরেমে– হেরেম শরীফে নামায আদায় করার সওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তন্মধ্যে রয়েছে সেখানে এমন সব ফিরিশতা নিয়োজিত থাকেন যারা সেখানে ইবাদকারীদের ঘিরে থাকে এবং যারা সে স্থানে নামায আদায়ের জন্য উপস্থিত হয় তাদের জন্য দোয়া করে।

তন্মধ্যে রয়েছে ঐ স্থানগুলোকে ইবাদতের জন্য আবাদ করার দ্বারা আল্লাহর শায়ায়ের তথা প্রতীক ও চিহ্নকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তার দ্বারা আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা হয়।

তন্মধ্যে রয়েছে ঐ সব স্থানে নামাযের জন্য পৌঁছানো দ্বারা মিল্লাতের আকাবেরদের স্মরণকে নতুন করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

لَاتَشُدُّ الرِّحَالَ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا ـ

"তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত সুদীর্ঘ সফর করা যাবে না– মসজিদে হারাম অর্থাৎ পবিত্র মক্কা নগরীর মসজিদ, মসজিদে আকছা অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস ও আমার এ মসজিদ তথা মসজিদে নববী।"

আমি বলি– জাহেলী যুগে লোকেরা এমন সব স্থানের যেয়ারতের ও বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে গমন করত যেগুলো তাদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত ছিল। এটা সর্বজন বিদিত যে, এর দ্বারা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ বাণী দ্বারা ঝগড়া বিবাদের ও দ্বন্দ্ব-কলহের এ পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। যাতে করে যা দ্বীনের চিহ্ন ও প্রতীক নয় এমন জিনিস দ্বীনের চিহ্ন ও প্রতীক রূপে স্থান দখল না করে। এবং তা আল্লাহ ব্যতীত অপর সত্তার তথা গায়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম না হয়ে থাকে।

আমার নিকট বিশুদ্ধ করা হলো চাই সেটি কোনো আউলিয়ার কবরই হোক, কি কোনো অলীর তাকিয়াই হোক, অথবা তা তুর পাহাড়ই হোক, নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সবই সমান। আল্লাহই ভালো জানেন।

মসজিদের আদব

মসজিদের আদব কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে রয়েছে– মসজিদের তাজিম করা– মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। যখন কেউ মসজিদের প্রবেশ করবে তখন তার মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হবে যে, আমি একটি সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করছি। এ অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য মসজিদে প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী পাঠ করবে–

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলবে- হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দিন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ـ

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার পূর্বে দুরাকাত নামায আদায় করবে।"

তন্মধ্যে রয়েছে মসজিদকে কুটকাট, ধূলি ময়লা, ময়লা আবর্জনা এ জাতীয় যাবতীয় অপছন্দনীয় বস্তু হতে পরিচ্ছন্ন রাখবে। বর্ণনাকারীর বর্ণনা হচ্ছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং মসজিদ পরিচ্ছন্ন ও মসজিদকে খুশবুদার তথা সুগন্ধিযুক্ত রাখতে বলেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُوْرُ أُمَّتِىْ حَتَّى الْقُذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ـ

আমার উম্মতের সকল সওয়াব আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে এমনকি কোনো ব্যক্তি যে খড়কুটা মসজিদ হতে বের করে তার সওয়াবও আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ـ

মসজিদে থুথু ফেলাও গুনাহের কাজ। তার কাফফারা তথা প্রতিবিধান হলো তা ঢেকে দেয়া তথা পরিষ্কার করে ফেলা।

তন্মধ্যে রয়েছে- মসজিদে এমন কোনো কাজ করা হতে বিরত থাকা যা মসজিদে ইবাদতকারীদের বিভ্রান্তিরতে ফেলে দেয়। মসজিদে বাজারের ন্যায় শোরগোল না করা কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا "তার তীরের ফলা তথা অগ্রভাগ ধরে ফেলা। (যাতে কারো গায়ে লেগে না যায়।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِد فَلْيَقُلْ : لَارَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا ـ

কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে তার হারানো বস্তু ঘোষণা মসজিদে দিতে শুনতে পায় তাহলে তার কর্তব্য হবে একথা বলা যে, আল্লাহ তোমাকে সে হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দেন। কারণ মসজিদ এ জন্য তৈরি করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْيَبَاعُ فِى الْمَسْجِد فَقُوْلُوْا: لَااَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ ـ

কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে বেচা কোনো করতে দেখ তাহলে বল– আল্লাহ তোমার ব্যবসায় বরকত না দিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা পাঠ করতে, মসজিদে কেউকে সাজা দিতে ও মসজিদে হক কায়েম না করতে অর্থাৎ কোনো হত্যাকারীকে তার হত্যার সাজা স্বরূপ হত্যা না করতে বলেছেন।

আমি বলি– মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এতে মসজিদে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং এ শোরগোল নামাযিদের ও এতেকাফকারীদের বিভ্রান্তিতে ফেলবে। আর মসজিদ এজন্য তৈরিও করা হয়নি। মসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যদি কেউ মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করে তাহলে মোস্তাহাব হলো তার উদ্দেশ্যের বিপরীত দোয়া করবে। যাতে সে নাখোশ হয়ে একাজ হতে বিরত থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, মসজিদ এ জন্য তৈরি করা হয়নি। মসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহর যিকির ও নামাযের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো– এতে করে মসজিদ মার্কেটে পরিণত হয়ে যাবে। মানুষ যখন মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও কার-কারবার শুরু করে দেবে তখন মসজিদের সম্মান নিঃশেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে তার দ্বারাও নামাযীদের ও এতেকাফকারীদের পেরেশানী হবে।

মসজিদে কবিতা প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো– এতে মসজিদে শোরগোলের সৃষ্টি হবে এবং যে কবিতা প্রতিযোগিতা করবে সে নিজেও আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত হবে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত থাকতে আহ্বান করবে।

মসজিদে কেছাছ কায়েম করা ও শাস্তি দিতে নিষেধ করার কারণ হলো– মসজিদ রক্ত, পেশাব ও এ জাতীয় বস্তু দ্বারা অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়বে অথবা অপরাধী চিৎকার করবে, ক্রন্দন করবে ও হট্টগোলের সৃষ্টি করবে। এতে মসজিদে অবস্থানরত লোকদের সমস্যার সৃষ্টি করবে।

মসজিদে যদি এমন কবিতা পাঠ করা হয় যাতে হামদ ও নায়াত রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা রয়েছে এবং কাফেরদের غيظ তথা রাগান্বিত হওয়ার কারণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এরূপ কবিতা পাঠ করা বৈধ। কারণ এটি একটি শরীয়ত সম্মত কাজ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ "হে আল্লাহ্! হাসানকে জিবরাইল দ্বারা সাহায্য করুন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

اِنِّىْ لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ الْحَائِضَ وَلَا جُنُبٍ ـ

"আমি মসজিদকে কোনো ঋতুবতী ও কোনো অপবিত্রের জন্য হালাল করব না।

আমি বলি-এর কারণ হলো মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। মসজিদের বড় তাজিম হলো পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে না। অযু ব্যতীত প্রবেশ এজন্য নিষেধ নয় যে, এরূপ হুকুম দেয়ার মধ্যে সংকীর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। অপবিত্র ও হায়েজার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সংকীর্ণতা নেই এজন্য যে, অপবিত্র ব্যক্তি ও হায়েজা তথা ঋতুবতী নারী নামায হতে বহু দূরে অবস্থান করে থাকে। মসজিদ তো শুধুমাত্র নামায আদায়ের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ ـ

"যে এ দুর্গন্ধযুক্ত বৃক্ষের থেকে ভক্ষণ করবে সে যেন কখনো আমাদের মসজিদের নিকট না আসে। নিশ্চয়ই যে বস্তু মানুষকে কষ্ট দেয় সে বস্তু ফেরেশতাদেরও কষ্ট দেয়।"

আমি বলি তা হচ্ছে পিঁয়াজ ও রসুন। প্রত্যেক দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসই এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। تتاذى অর্থ অপছন্দ করে ও তা হতে দূরে অবস্থান করে। কারণ তারা উত্তম চরিত্র ও পবিত্র বস্তু পছন্দ করে এবং খারাপ চরিত্র দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু অপছন্দ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলবে, 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন। আর যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন বলবে– হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার রহমত ও করুণা কামনা করছি।'

আমি বলি– মসজিদে প্রবেশকালে রহমত কামনা করা ও বের হওয়ার সময় কৃপা কামনা করার কারণ হলো পবিত্র কুরআনে রহমত শব্দ রূহানী ও পরকালীন নেয়ামত যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভ, নবুয়াত লাভ।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

"তোমার প্রভু প্রতিপালকের রহমত দুনিয়ার জমাকৃত সম্পদ হতে উত্তম।" আর ফজল তথা কৃপা বলতে দুনিয়ার নেয়ামত বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ

"তোমাদের এতে কোনো গুনাহ নেই যে, তোমরা জীবিকা তালাশ করবে যা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ হতে।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

"অতঃপর যখন তোমরা জুমার নামায সমাপ্ত করবে তখন জমিনে চলে যাও এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক তালাশ কর। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহর নৈকট্যই কামনা করে। আর বের হওয়ার সময় হলো রিজিক তালাশের সময়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ -

"তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায আদায় করে নেবে।"

আমি বলি- মসজিদে প্রবেশ করেই নামায আদায় করা বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে যে, যখন সে স্থানে প্রবেশ করবে যে স্থানটি ইবাদতের জন্যই নামাযের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেখানে প্রবেশ করেই নামায না পড়া বঞ্চিত হওয়া ও দুঃখের বিষয়। আর এ দু'রাকাত নামায আদায়ের মাধ্যমে ফরজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আর এতে মসজিদের তাজিম তথা মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ -

"কবর স্থান ও স্নানাগার ব্যতীত সমগ্র জমিন সিজদার স্থান।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত জায়গায় নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন- গোবর ফেলার স্থান, কবর স্থান, জবাইয়ের জায়গা, রাস্তার মধ্যখানে, গোসলখানায়, উটের বসার জায়গায় এবং বায়তুল্লাহর ছাদের উপর এবং বাবেলের জমিনে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, কারণ তা অভিশপ্ত।

আমি বলি- গোবর ফেলার স্থান ও জবাইয়ের স্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করার কারণ হলো- এ দুটো স্থান নাপাক। নামাযের স্থান পাক পবিত্র হওয়া নামাযের জন্য শর্ত।

কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো– শিরকের ন্যূনতম পথ বন্ধ করা। কারণ যেমনিভাবে মূর্তিকে সামনে রেখে পূজা করা হয় যদি তেমনিভাবে ওলামাদের ও বুজুর্গদের কবরকে সামনে রেখে নামায পড়া হয় তাহলে তা শিরকে জলি (خالص شرك) আর যদি বকরতের জন্য কবরের নিকটে নামায পড়া হয় তাহলে তা শিরকে খফি অর্থাৎ তাতেও শিরকের গন্ধ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস থেকে তা বুঝা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ -

"আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও নাছারাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ করে নিয়েছে।" এর প্রমাণ তিন সময়ে নামায আদায় করতে নিষেধ করা। এ নিষেধ কাফেরদের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে করা হয়েছে। সূর্য উদয় কালে, সূর্য মাথার উপর সোজাভাবে অবস্থানকালে ও সূর্যাস্তের সময়। কারণ এসময়ে কাফেরেরা সূর্যকে সিজদা করে থাকে।

স্নানাগারে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো– এ স্থান হচ্ছে সতর খোলার স্থান। অনেক লোক একসাথে স্নান করতে এলে ভীড় হয়ে যায় ফলে নামাযে হুজুরী কলব হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে।

উট বসার স্থানে নামায পড়তে নিষেধ হওয়ার কারণ হচ্ছে– উট হচ্ছে বিশাল দেহী প্রাণী। তার আক্রমণও কঠিন। সে শক্তি প্রয়োগও করে অতিরিক্ত। এ কারণে উট নামাযীর উপর হামলা করে বসতে পারে; এতে নামাযীর নামাযে হুজুরী কলব হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ছাগলের বিষয়টি এর বিপরীত।

রাস্তার মধ্যে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো– লোকদের রাস্তা অতিক্রমের প্রতি লক্ষের কারণে নামাযে মন বসবে না। রাস্তায় নামায আদায়ের কারণে লোকদের চলার পথ সংকুচিত হবে এতে তাদের কষ্টের কারণ হবে। রাস্তা হিংস্র জন্তুর চলাচলের স্থান; তার দ্বারা নামাযির ক্ষতি সাধিত হতে পারে। হাদীস শরীফে বিশুদ্ধ বর্ণনায় রাস্তায় নামায পড়ার বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।

বায়তুল্লার ছাদে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো– বিনা প্রয়োজনে বায়তুল্লাহর ছাদে আরোহণ মাকরূহ। এতে বায়তুল্লাহর সম্মান বিনষ্ট হয়। নামায

পড়ার সময় সন্দেহ থাকবে যে কেবলা হলো কি হলো না? কারণ সেখানে দৃষ্টির সীমা রক্ষার কিছু নেই।

অভিশপ্ত জমিনে যেখানে পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছে বা যে স্থানে দাবিয়ে দেয়া হয়েছে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ- কোনো স্থানে নামায পড়ার কারণে সে স্থানের সম্মান বৃদ্ধি পায়। অভিশপ্ত জমিন এ সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং সে স্থানের অবমাননাই করা উচিত। সে স্থানে নামায পড়তে বারণ করার মাধ্যমে সে স্থানের অবমানা করাই উদ্দেশ্য। ইচ্ছা করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি কাঁধে নেয়া উচিত নয়। অভিশপ্ত স্থানে নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে এসব স্থান হতে দূরে অবস্থান করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَلَا تَدْخُلُوهُ إِلَّا بَاكِيْنَ -

তাবুক যাওয়ার পথে ছামুদ জাতির বস্তি দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"এখানে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ কর।"

নামাযীর পোশাক

জেনে রাখুন- পোশাক অন্যান্য প্রাণী হতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। পোশাক পরিধান করা মানুষের সর্বোত্তম অবস্থান নির্ণয় করে। পোশাকের মধ্যে মানুষের পবিত্রতার অংশ বিদ্যমান। এতে নামাযের প্রতি সম্মান রয়েছে। মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাতের হকও এর মাধ্যমে আদায় হয়ে থাকে। উলঙ্গ অবস্থায় কারো সামনে উপস্থিত হওয়া বেয়াদবীর কারণ হয়। নামায ছাড়াও অন্য সময় পোশাক পরিধান করা শরয়ী ওয়াজেব। এটি একটি মূল ওয়াজিব কাজ। নামাযের পরিপূর্ণতার জন্য লেবাছ তথা পোশাক পরিধান করাকে শর্ত করে দেয়া হয়েছে। শরীয়ত পোশাকের দুটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ওয়াজিব সীমা, যা করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এ পোশাক পরিধান করা নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। অপর সীমাটি হচ্ছে মোস্তাহান।

প্রথমটি সীমা অর্থাৎ ওয়াজিব পোশাকের সীমা হচ্ছে- উভয় লজ্জাস্থান ঢাকা। এ উভয়কে ঢাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে। এদের সাথে উভয় রানকে মিলিয়ে নেয়া হয়েছে। নবীদের ক্ষেত্রে তাদের সমগ্র দেহ ঢাকা।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস হচ্ছে–

لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ اِلَّابِخِمَارٍ -

"বালেগা নারীর নামায ওড়না ব্যতীত কবুল করা হবে না।" তা এজন্য যে, রান কামভাব উত্তেজক স্থান। এমনিভাবে নারীর সমগ্র দেহ। সুতরাং নারীর হুকুম উভয় লজ্জাস্থানের হুকুম।

দ্বিতীয় প্রকারের পোশাকের সীমা হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস–

لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْئٌ وَقَالَ اِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفُوا بَيْنَ طَرَفَيْهِ -

তোমাদের কেউ এক কাপড়ে ততক্ষণ নামায পড়বে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তার কাঁধ পর্যন্ত কিছু না থাকবে। এবং তিনি আরো বলেছেন, যদি কাপড় বড় হয় তাহলে তার এদিক সেদিক করে করে নেবে। অর্থাৎ গাতী বেঁধে নেবে।

এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য হলো– মানুষের পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আরব অনারবের মধ্যমপন্থী সকল লোকই আচকান, কামীছ, দুল্লা ইত্যাদি পরিধানের ব্যাপারে একমত যে, তাদের পরিপূর্ণ পোশাক হবে যা তাদের পেট, পিঠ ও কাঁধে ঢেকে দেবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক কাপড়ে নামায আদায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন– اولكلكم ثوبان। তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'খানা করে কাপড় রয়েছে? অতঃপর হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন– اذا وسع الله فوسعوا। "আল্লাহ যখন তোমাদের জন্য সুযোগ দিয়েছেন তখন তোমরা তা ব্যবহার কর।" এক ব্যক্তি একাধিক কাপড় পরিধান করবে।

আমি বলি-এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পোশাকের প্রথম সীমা অর্থাৎ ওয়াজিব সীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আর হযরত উমর (রাঃ)-এর বাণী পোশাকের দ্বিতীয় সীমা

রেখা অর্থাৎ মোস্তাহাব সীমার বর্ণনা। আবার এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পোশাকের দ্বিতীয় সীমা অর্থাৎ মোস্তাহাব সীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা বলেননি যা হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন। অর্থাৎ একাধিক কাপড় পরিধানের বিষয়। যদি তিনি তা বলতেন তাহলে তা শরীয়তের বিধান হয়ে যেত। তাহলে যার নিকট দু'কাপড় নেই সে অন্তরে কষ্ট পেত। আর এক কাপড়ে তার নামায পরিপূর্ণ হতো না। কারণ সে তার ধারণা অনুযায়ী পরিপূর্ণ পোশাকে নামায আদায় করছে না। হযরত ওমর (রাঃ) অবগত ছিলেন যে, শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার সময় শেষ ও সমাপ্ত হয়ে গেছে। এবং তিনি এও অবগত ছিলেন যে, নামাযের মধ্যে পরিপূর্ণ পোশাক পরিধান করা মোস্তাহাব। এজন্য তিনি নামাযের মোস্তাহাব পোশাকের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

যে ব্যক্তি চুল মাথার পেছনে ঝুটি বেঁধে নামায আদায় করে তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ وَهُوَ مَكْتُوْبٌ -

"তার অবস্থা হলো যেন সে মশক ঝুলিয়ে নামায পড়ছে।

আমি বলি– এ হাদীসে এভাবে নামায আদায় করাকে মাকরূহ তথা অপছন্দ করার কারণ হচ্ছে– এভাবে ঝুটি বেঁধে নামায পড়ায় সাজসজ্জার কমতি এবং নামাযের আদব অনুযায়ী পরিপূর্ণ পোশাক হয় না এ কারণে তা মাকরূহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চাদরে ফুল আর্ট করা ছিল সে চাদর সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّهَا أَلْهَتْنِىْ إِنَّنَا عَنْ صَلَاتِىْ -

"এ চাদর আমাকে আমার নামায হতে অমনোযোগী করেছে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) ঘরের পর্দা সম্পর্কে বলেছেন–

أَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ كَعَرَضٍ لِىْ فِىْ صَلَاتِىْ -

"তোমার এ পর্দা আমার থেকে দূরে সরিয়ে নাও। এর ছবি আমার নামাযে বার বার আমার সামনে আসছে।"

রেশমের কাবা সম্পর্কে বলেছেন–

لَايَنْبَغِى هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ -

"পরহেজগারদের জন্য, আল্লাহভীরু মোত্তাকীদের জন্য এটা পরিধান করা উচিত নয়।"

আমি বলি– নামাযীর জন্য উচিত হলো এমন সাজসজ্জা পরিহার করা যা তাকে নামাযের প্রতি অমনোযোগ করে দেয়। তার সৌন্দর্যের কারণে। অথবা তার মনে আনন্দ অনুভূত হওয়ার কারণে। যাতে নামায পরিপূর্ণতা লাভ করে, যে উদ্দেশ্যে সে নামায আদায় করছে।

ইহুদিরা সেণ্ডেল পায়ে ও মোজা পায়ে নামায পড়ত না। তাদের দৃষ্টি এরূপ করা তাজিমের খেলাপ। কারণ লোকেরা যখন বড়দের সামনে গমন করে তখন সেণ্ডেল জুতা ইত্যাদি খুলেই গমন করে থাকে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً -

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন:- হে মূসা! তোমার জুতা খুলে নাও কারণ তুমি এক পবিত্র স্থানে অবস্থান করছ।"

কিন্তু এখানে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে– আর তা হলো জুতা এবং মোজা ব্যক্তির পরিপূর্ণ পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। খালি পায়ে কাকেও ভালো দেখায় না। নবীর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করেছেন এবং ইহুদিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। এবং বলেছেন–

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لَايُصَلُّوْنَ فِىْ نَعَالِهِمْ وَخِفَافِهِمْ -

"ইহুদিদের বিপরীত কর, তারা জুতা এবং মোজা পরিধান করে নামায পড়ে না।" বিশুদ্ধ কথা হলো জুতা পরে নামায পড়া এবং খালি পায়ে নামায পড়া উভয় সমান।

নামাযের সময় শরীরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। শরীরে কাপড় জড়িয়ে নেয়া বলতে বুঝানো হয়েছে দেহে কাপড় লটকিয়ে উভয় হাত তার ভেতরে নিয়ে নেয়া– এরূপ মত কারো করো।

এভাবে কাপড় পরিধান করাকে اشتمال صماء বলা হয়। আর এরূপভাবে কাপড় পরিধান করা অত্যন্ত অপছন্দনীয় পদ্ধতি। কারণ তা মানুষের চরিত্র ও অভ্যাসের খেলাফ। মানুষের চরিত্র ও অভ্যাস হলো কাপড় পরিধানের সময় উভয় হাত কাপড়ের বাহিরে রাখা।

এভাবে কাপড় পরিধান করার দ্বারা ছতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। হাত যদি কাপড়ের ভেতরে থাকে তাহলে কাপড় সামলানো কষ্টকর হবে এবং মানুষ তথা ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে যেতে পারে। কোনো কিছু ধরার জন্য হাত বের করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাতেও ছতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কারো কারো মতে سدل 'ছদল' বলতে বুঝানো হয়েছে মাথার উপর যা উভয় কাঁধের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, তা দেহের সাথে না মিলানো। বা কাপড়ের উভয় দিক না মেলানো। এরূপ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এতে সাজসজ্জার ও পরিপূর্ণ পোশাক পরিধানে কমতি হয়। কারণ এরূপ কাপড় পরিধান করা একটি অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় পদ্ধতি।

পরিপূর্ণ আকৃতি দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রচলিত পদ্ধতি ও অভ্যাস ফয়সালো করবে যে, পোশাক কি ধরনের হবে। কোনো ব্যক্তি তার জন্য উপযোগী পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কমতি করবে না। যদিও লোকেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করে থাকে। কিন্তু আপনি তালাশ করলে দেখতে পাবেন যে, প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ আকৃতির পোশাক পরিধান করে থাকে। এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময়কার আরবদের প্রচলিত নীতি পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন এবং তার উপরই তার সকল আদেশের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩৪৯৩৩১১

ISBN : 984-8604-24-9